বাঁশী

শ্রীশ্যামধনী বন্দ্যোপাধ্যায়

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
২০৪নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কালিকাতা।
১৩৩৭

মূল্য ২৲ টাকা

প্রকাশক—

শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

বরেন্দ্র লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রিণ্টার—পি, এন, ঘোষ,

আইডিয়্যাল প্রেস

৮।১।১, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

টাকা আনা পাইএর সংসারে দারিদ্র্যই যাঁদের মূলাপরাধ, অপকর্ম্ম না ক'রেও যারা আত্মীয় এবং সাধারণের সহানুভূতি হ'তে বঞ্চিত, মনোভাব ব্যক্ত করবার শক্তি থাকলেও পরিস্ফুট করবার সুযোগ ও সুবিধা না পেয়ে একমাত্র অব্যক্তেরই শরণাপন্ন হ'য়ে যাঁরা অন্ধকারেই জীবন যাপন করে, আমার এই তুচ্ছ ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাটুকু শুধু তাদেরই হাতে দিয়ে আমি নিজেকে কৃতার্থ বোধ করলাম।

লেখক।

বাঁশী 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক বেরিয়েছিল। এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'লো।

লেখক

খট্ ক'রে একটা শব্দ হ'তেই কল্যাণীর ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের ভিতর মিশমিশে কালো অন্ধকার। মাঘ মাস,—কনকনে শীত। তার উপর সেদিন সন্ধ্যা থেকে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। তখনও এক একবার বিদ্যুৎ চম্‌কে ঘরের ফুকলির ফাঁক দিয়ে আর বাঁশের ঝাপ্‌রী দেওয়া জানালার ভিতর দিয়ে এক ঝলক ক'রে আলো এসে ঘরের ভিতর খানিক দূর পর্য্যন্ত আলো ক'রে দিচ্ছে! মধ্যে মধ্যে এক একটা দম্‌কা হাওয়া এসে ঘরের জীর্ণ কপাটটাকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। সেই রকম ঘা' ঠোক্ একটা শব্দে কল্যাণীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে একবার তার স্বামীর নাকের কাছে হাত দিয়ে বুঝতে পারলে যে স্বামী তা'র অকাতরে ঘুমুচ্ছে। কত রাত তা জানা নাই; চোখে তা'র ঘুম জড়িয়ে রয়েছে;—মনে হ'ল, এই মাত্র সে কাজকর্ম্ম সেরে শুয়েছে। সে

বাঁশী

খোকাকে তা'র বুকের কাছে টেনে নিয়ে কাঁথাখানা বেশ করে জড়িয়ে আবার শুয়ে পড়লো। খোলার ঘরের উপর বৃষ্টির জল পড়ে এক-রকম ছড় ছড় তড় তড় আওয়াজ হচ্ছিল;—নিস্তব্ধ-নিশীথ রাত্রে সে শব্দ তার বুকের মধ্যে কেমন এক-রকম ভয় ও আনন্দ উৎপাদন ক'রছিল। সেই উদাস করা শব্দে কাণ পেতে রেখে কল্যাণী তখনই আবার ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু গরীব দুঃখীর কপালে শান্তিপূর্ণ নিদ্রা কোথায়? আবার খানিক পরেই চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করে একসঙ্গে কারখানার সব ক'টা বাঁশী বেজে উঠলো। খোকা চাঁতকে উঠে তার মাকে জড়িয়ে ধরতেই তার মুখে মাইটা গুঁজে দিয়ে কল্যাণী তাকে থামালে। আর তার শোয়া হল না—শোবার যো কি? বাঁশী বেজে উঠেছে, আর বিছানায় থাকা অসম্ভব। আস্তে আস্তে উঠে তক্তাপোষ থেকে নেমে পড়ে মাথার বালিসের নীচে হতে নেকড়ায় জড়ান দিয়াশালাইটা বার করে কোন রকমে ঢুলতে ঢুলতে প্রদীপটা সে জ্বেলে ফেললে। খোকা তখনও মাই টান্‌ছে। প্রদীপের আবছায়ার মিট্‌মিটে আলোতে মেটে-ঘরের ভিতরকার অন্ধকার যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। বাঁশী তখনও বাজছে;—ভোর হয়ে এসেছে। বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু আকাশে মেঘাচ্ছন্ন। শীতে হাত পা অসাড়—করে দিচ্ছে! স্বামীকে ডেকে দিতেই হবে,—আর ত ঘুমুলে চলবে না! কিন্তু কল্যাণী আজ কিছুতেই যেন তার স্বামীকে জাগাতে পারছিলো না;—নিদ্রিত-স্বামীর মুখের পানে চেয়েই সে কেমন এক রকম হতাশ-করুণ-নেত্রে দাঁড়িয়ে রইল। কেবল মনে হতে লাগলো—সন্ধ্যার সময় তার স্বামী জলে ভিজতে ভিজতে কাজ থেকে ফিরে এসে বলেছিল—'দেহটা ভাল নেই, সর্ব্বশরীর

টাটিয়ে বিষফোঁড়া হয়েছে, তুপুর বেলা থেকে জ্বরও হয়েছে, বাবুকে এত করে বল্লুম যে তু'দিন খালি ছুটি দিন, তা কিছুতেই রাজী হল না. বলে এ মরসুমে যার তাঁত বন্ধ যাবে, সাহেব বলেছে, তাকেই চাকরীতে জবাব দেবে।'

বাঁশী থেমে গেল। কল্যাণী সজাগ হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে দরজা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে। তার পর কি ভেবে আবার সে স্বামীর গায়ে একবার হাত দিয়ে অনুভব করলো—গা তখনও খুব গরম। অন্য দিন এতক্ষণ ডাকতে হয় না, সে আপনি উঠে পড়ে, কিন্তু আজ যেন তার ওঠবার শক্তিই নাই। কল্যাণী ইতস্ততঃ করতে লাগলো, কি যে সে করবে যেন তা ঠিক করতে পারছিল না। ওদিকে আবার সেই রকম বিকট শব্দে বাঁশী বেজে উঠলো—এই শেষ বংশীধ্বনি! আধ ঘণ্টার মধ্যে কারখানায় না পৌছিলে. সেখাকার ফটোক বন্ধ হয়ে যাবে,—একবেলার মজুরী কাটা যাবে কল্যাণীর সংসারের আধবেলার মজুরীর মূল্য অনেক! বাড়ী থেকে চটকল মোটে পাঁচ মিনিটের রাস্তা। পথে তু'একজন লোক তখন চলতে সুরু করেছে, —একটা ছোকরা বিকৃত নাকি-স্বরে একটা অশ্রাব্য ও কদর্য্য গানের এক চরণ গাইতে গাইতে চলেছে, তারই পিছু পিছু আরও কয়েকটা ছোকরা অনর্গল হাততালি দিতে দিতে আর বিড়ি টানতে টানতে চটকলের দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হচ্ছে! কল্যাণী তাদের কারো কারো মুখ চেনে,— গলার আওয়াজও কতক কতক বুঝতে পারে। তারা রোজই ঐ পথ দিয়ে কারখানায় যাতায়াত করে। এক-দিন এমনও হয়েছে যে নিকটের খালে স্নান করে বা কাপড় কেচে আসবার সময় ওদের কারো

না কারো সঙ্গে কল্যাণীর স্পষ্ট চোখাচোখি হয়ে গেছে,—আর সে জড়-সড় হয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ঢুকে বেড়ার আগোলটা বন্ধ করে দিয়েছে।

বাহিরে হতে একটু ভাঙা গলায় কে ডাকলে —"লালু খুড়ো বেরিয়েছ না কি?"

কল্যাণী জবাব দিলে—"কে—সর্দ্দার কাকা?"

জবাব এল—"হ্যাঁ গো বেটি;—লালমোহন বেরিয়ে গেছে?" সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে আলিমদ্দি সর্দ্দার মুখ বাড়ালে। দোর আগে হতেই খোলা ছিল। সর্দ্দারের হাতে একটা জ্বলন্ত মোশাল। তখনও বাহিরে খুব অন্ধকার।

তাকে দেখে—কল্যাণী একটু বিপন্ন হয়ে বল্লে—"এঁর গা খুব তপ্ত। অনেক রাত্রি অবধি গা হাত সব টিপে দিয়েছি। কিছুই খাননি।"

আলিমদ্দি বল্লে—"তবে ওকে ডেক না। খুব কোসে আজ ঘুমুক: কাজে গে আজ দরকার নেই—"

"বাবু যে ছুটি দিতে চায়নি, বলেছে তাঁত বন্ধ গেলে কাজ যাবে?"

"বাবুর মাথা যাবে—সে আমি যা বলবার, কয়বার তা বলবে। এখন। তুমি কপাট বন্ধ করে দাও, বড্ড হিম আসতেছে, বাচ্ছাটার আবার সর্দ্দি লাগবে। আমি এখন চল্লু। দুপুরেব টাইমে আসব খন্।"

আলিমদ্দি চলে গেল। তার কথায় কল্যাণীর একটু সাহস হল। এই লোকটা তাঁত-ঘরেরই একজন সর্দ্দার। জাতিতে মুসলমান বটে কিন্তু প্রাণটা খুব খোলসা। বয়সও হয়েছে। এ না থাকলে হয় তো লালমোহন আর কল্যাণীর সংসার করাই অসম্ভব হয়ে উঠতো। এরা

দু'টি স্ত্রী পুরুষে একান্ত বিপন্ন হয়ে একদিন যখন এই গ্রামে উপস্থিত হয়েছিল, সেই সময় এই আলিমদ্দিই এদের আশ্রয় দিয়েছিল—সাহস দিয়েছিল। সেইদিন আলিমদ্দির স্ত্রী করিমন বিবি আপনার হাতে দুধ দুয়ে এই দু'টি বিদেশী গৃহহারা তরুণ আর তরুণীকে পান করিয়ে তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করেছিল। সে আজ দু'বছর আগেকার কথা। খোকার বয়স এখন এক বছর। যে ঘরখানিতে এরা আজ বাস করছে এও সেই আলিমদ্দির হাতেরই ছাওয়া, জমিটুকুও সে জোগাড় করে দিয়েছিল।

২

একটু একটু করে মেঘ আর কুয়াশা কেটে গিয়ে ক্রমশঃ দিনের আলো ফুটে উঠলো। খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে দোলায় শুইয়ে রেখে কল্যাণী ঘরের বাসিপাট সেরে ফেল্লে। করিমন সেই সময় এক ঘটী দুধ এনে দাওয়ায় বসিয়ে রেখে ঝাঁটা গাছটা নিয়ে উঠান সাফ করতে লেগে গেল। কথায় কথায় সে সকল কথাই কল্যাণীর কাছ থেকে জেনে নিয়ে বল্লে—"আমি ঘর দোর ততক্ষণ আগলাচ্ছি, তুমি চট করে বাসন কখানা মেজে নিয়ে একেবারে খাল থেকে ছ্যান করে এসগে। চুলোটা আমি ধরিয়ে রাখবো, তুমি শিগগীর দুধ জ্বাল দে ওঁয়াকে আর খোকাকে খাইয়ে দাও! বাস রে বাস। সারারাত কিছু মুখে দেয়নি, কতই না জানি আমার বাছার পেটটা জলতে নেগেছে।" কল্যাণী নাইতে চলে গেল।

খোকার কান্নায় লালমোহন জেগে উঠে এদিক ওদিক চেয়ে খানিকটা স্তব্ধ হয়ে পড়ে থেকে দু তিন বার আপনার চোখ রগড়ালে। তখন বাহিরে বেশ রোদ উঠেছে—ঝাপরীর ফাঁক দিয়ে এক একটা স্বর্ণ রেখার মত রেখা এসে ঘরের মেঝেয় ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই এ-রকম বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুনো সত্যি না স্বপ্ন তা সে প্রথমটা ঠিক করতে পারছিল না। তাহলে সে কি আজ কাজে যায় নি? কেউ কি তাকে

ডেকে দেয়নি? কল্যাণীই বা কোথায় গেল? এমন ত কখনও হয়নি। সে উঠতে গেল, কিন্তু পারলে না,—মনে হল—হাত পা গুলো যেন অসাড় হয়ে গেছে। সমস্ত দেহ যেন তার বিশ-মন ভারি! নড়তেই পারছিল না! খোকা চিলের মত চেঁচাতে আরম্ভ করলে। অনেক চেষ্টা করেও সে তাকে দোলা থেকে তুলে নিতে পারলে না। দু'বার সে নিজের স্ত্রীর নাম ধরে ডাকবার চেষ্টা করলে, কিন্তু গলা থেকে আওয়াজ বেরুল না,—গলার ভিতর দারুণ ব্যথা অনুভব করলে, অনেক কসরৎ করেও সে জিভ নাড়তে পারলে না। তখন নিতান্ত নিরুপায় হয়ে একান্ত অসহায়ের মতোই সে বিছানায় পড়ে রইল। করিমন ও দিকের ছোট রান্নাঘরটার দাওয়ায় লোহার উনানে কেরাসিন তেল আর ঘুঁটে জেলে দিয়ে দেখলে, কয়লা একখানিও নাই। তাই দৌড়ে নিজের ঘর থেকে কয়লা আনতে গিয়েছিল। তাদের বাড়ী বাগানটার ওপারেই কয়লা এনে উনানে ঢেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে সে খোকাকে নেবার জন্যে ঘরে ঢুকে দেখলে লালমোহন মিট্‌মিট ক'রে চেয়ে শুয়ে রয়েছে। তাই দেখে করিমনের বেজায় রাগ হয়ে গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—"ধন্যি যাহোক্, ছেলেটা যে এমন করে চেঁচাচ্ছে—গলা নেগে যাচ্ছে, তা একে কি তুলে নিতে নেই?"

—বলেই সে থতমত খেয়ে গেল। লালমোহনের দিকে চেয়ে আর সে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলে না! দেখলে তা'র চোখে কেমন এক রকম বিহ্বল দৃষ্টি, আর সমস্ত মুখখানা হাঁড়ীর মতো ফুলে উঠেছে, চোখ দু'টো যেন লাল করমচা। তখন করিমন খোকাকে বুকে তুলে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভাল কোরে লালমোহনের পানে

চেয়ে দেখে বল্লে—"ও মা, এ কি হ'য়েছে গো! গায়ে গুটি বেরিয়েছে যে!" লালমোহন অতি কষ্টে একখানা হাত তুলে নিজের কপালে ঠেকালে, ইসারা করে জানিয়ে দিলে যে তা'র কথা বলবার শক্তি নেই। কল্যাণীও সেই সময় কাপড় কেচে, বাসন মেজে হন্তদন্ত হ'য়ে এসে ঘরে ঢুকছিল,—দরজায় পা দিয়েই সে সব বুঝতে পারলে। ভোরের আঁধারে যা চোখে পড়েনি, দিনের আলোয় তা' স্পষ্টই দেখতে পেলে। তা'র মুখখানা ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল,—হাত পাগুলো তারও যেন সঙ্গে সঙ্গে অবশ হয়ে গেল। বাসনগুলো মাটিতে নামিয়ে রেখে সে বসে পড়লো, কেবল মুখ দিয়ে তার একটা অস্পষ্ট কথা বরুলো—"কি হবে মা!"

করিমন ঝেঁকে উঠে বল্লে—"কি আবার হবে? নাও ওঠ, আমি কেবল ছোঁবই না, বাহিরে থেকে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। রসো না,—এখনই ওঝা ডেকে আনছি। তুমি তোমার ঐ যে কি বলে সে দেবতার নাম করে পয়সা তুলে রাখ ত দেখি।"

কল্যাণী কেঁদে ফেল্লে। লালমোহন সবই বুঝতে পারছিল—তারও চোখ জলে টপ্‌টপে হ'য়ে উঠলো।

করিমন কল্যাণীকে ধমক দিয়ে বল্লে—"বেটীর পানসে চোখে জল লেগেই আছে। অমন করলে আমি কিছু পারব না ব'লে রাখছি। এখনই ঘরে চলে' যা'ব। আর এদিক মাড়া'ব না। ব্যারাম কি লোকের হয় না?"

কল্যাণীর লজ্জা হ'ল—অনুশোচনা হ'ল। চোখের জল মুছে উঠলো। একখানা শুকনো কাপড় আলনা থেকে পেড়ে নিয়ে বাহিরে ছাড়তে

চলে' গেল। তাই দেখে লালমোহনের চোখে আবার একটু তৃপ্তির আভাস ফুটে উঠলো। স্ত্রীর বিপন্ন ভাব দেখে সে আপনাকে আরও যেন বিপন্ন মনে ক'রছিল।

সেই সময় তা'দের পড়শী লক্ষ্মণ মাইতি একখানা ভাঁজকরা কাগজ হাতে কোরে উঠানে এসে দাঁড়ালো দেখে, করিমন আর কল্যাণী এক সঙ্গেই জিজ্ঞাসা ক'রলে, কি তা'র দরকার।

লক্ষ্মণ বল্লে—"মাধব সামন্ত সেই যে তা'র বিধবা-ভাজের জমীখানা পোনের টাকায় বাঁধা রেখেছিল, এখন টাকা পেয়েও সে তা ছাড়তে চায় না, বলে, আরও দশ টাকা দিচ্ছি আমায় একেবারে বিক্রী করে দাও। তা' অতখানি জমী কি ছ'গণ্ডা এক টাকায় বেচতে মন লাগে"

করিমন বল্লে—"তা তুই বেচবি কেন ? বাঁধা রাখলেই কি বেচতে হয় ?"

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি, এখন কি করতে চাও লক্ষ্মণ ?"

লক্ষ্মণ বল্লে—"সেই কথাই ত বাবা ঠাকুরের কাছে বলতে এসেছি। ওনার কাছে সলা করে যা যুক্তি হ'বে সেই মোতই ক'রবো মাঠাকরুণ— শুনলুম উনি না কি ঘরে আছে ?"

তখন কল্যাণী তা'র স্বামীর ব্যারামের কথা বল্লে। শুনে লক্ষ্মণ চমকে উঠলো—"মার দয়া ! বল কি মাঠাকরুণ !"

"হ্যাঁ— তাই ত হ'য়েছে। এখন ত ওসব কথা হ'তে পারে না লক্ষ্মণ ! উনি ভাল হ'য়ে উঠুন—"

লক্ষ্মণ বল্লে—"সে কথা কি একবার বলতে ? কি আর আমার মন

কাজ,—ছাইএর কাজ,—না হয় আমার জমীটুকু যা'বে, ওনার পরাণটা থাকলে—"

করিমন বল্লে—"চুপ কর বাপু, বেশী কথা কও না; তুমি একবার মহেশতলায় যাও দিকি—"

"গিরীশ চক্কোত্তিকে ডাকতে? এক্ষুনি;—শেতলা-বাড়ীর চক্কোত্তি মশাই এলেই মা'র দয়া সেরে যাবে।" তার পর কল্যাণীর দিকে চেয়ে বল্লে—"দোরটা ছাড় না মাঠাকরুণ; আমি একবার বাবা ঠাকুরকে দেখে যাই?"

দরজা ছেড়ে দিতে লক্ষ্মণ ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখলে, লালমোহন চোখ বুজে পড়ে আছে। অনেকবার ডেকেও আর তা'র সাড়া মিললো না। এই অজ্ঞান আচ্ছন্ন ভাব দেখে কল্যাণীর চোখের জল আর বাধা মানলো না—হুহু করে দু'গাল বেয়ে পড়তে লাগলো। করিমনও এবার ততটা শক্ত হ'তে পারলে না, আঁচলে চোখ মুছে বল্লে,—"যা লক্ষ্মণ, আর দেরী করিস্‌নি—চক্কোত্তি মশাই আবার কোন্ গাঁয়ে বেইরে যাবে, তাঁর অনেক দূরের ডাক আসে।"

লক্ষ্মণ বল্লে—"আমি যেখান থেকেই হোক ঠাকুরকে পাকড়া করে আনবো, তার ভয়টা কি? কিছু ভেব না মাঠাকরুণ—ওনার জন্যে গাঁশুদ্ধ লোক আমরা পেরাণ দেব। তুমি ঘরে ধুনো গঙ্গাজল দাও—আর যা' তা' কাপড়ে ছুঁও না। ছেলেটাকে না হয় আমাদের বউ এসে নেবে'খন"—এই বলেই সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

৩

এক মাস মরণ-বাঁচনের সন্ধিক্ষণে থেকে মা শীতলার অনুগ্রহে লালমোহনের জীবনের আশা পাওয়া গেল। কল্যাণীর অক্লান্ত সেবা আর পাড়া-পড়সী আবাল-বৃদ্ধ বনিতার আন্তরিক যত্নে ও নিঃস্বার্থ চেষ্টা তদ্বিরের ফলে এ যাত্রায় সদ্য-মৃত্যুর মুখ হ'তে সে ফিরে এল। মা শীতলার সেবাইৎ গিরীশ চক্রবর্ত্তী এখনও প্রত্যহ আসে। অন্যান্য স্থলে সে অনেক উপার্জ্জন ক'রলেও এখানে,—এই দরিদ্র-পল্লীর লোকেরা, বেশী অর্থ তাকে যোগাতে পারেনি। লালমোহনের অবস্থা যখন নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন—যখন সে একেবারেই বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত, সেই সময় কথায় কথায় চক্রবর্ত্তী শুনেছিল যে এরা ব্রাহ্মণ,—মাত্র কয়েক বৎসর এই পল্লিতে বাসা ক'রে আছে; আর নিকটস্থ চটকলে তাঁত চালায়। আলিমদ্দি সর্দ্দার আর তার স্ত্রী করিমন বিবি এদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। চোখেও দেখা গেল যে এই মুসলমান দম্পতি লালমোহন আর কল্যাণীকে যেন ঠিক নিজের ছেলে মেয়ের মতোই স্নেহ করে। ওই দু'টী প্রৌঢ় স্ত্রী পুরুষ দিবারাত্রি সজাগ পাহারা দিয়ে এদের রক্ষা ক'রছে, আর তা'দের খাতিরে আর হুকুমে অন্যান্য প্রতিবাসীরাও যখন যা' দরকার এনে যোগাচ্ছে। এই পাড়াটায় মুসলমানেরই ভাগ বেশী, মোটে ৫ পাঁচ ঘর হিন্দু বাস করে। সকলেই চটকলে তাঁতের কাজ করে; সেই জন্য

এখানটার নামই তাঁতীপাড়া। তা'দের মধ্যে কারো কারো ঘরে আবার হাতে চালানো তাঁতও আছে; তাতে তারা কাপড়-গামছা বুনে ঘরাও খদ্দেরদেরে বিক্রী করে; এমন কি এখানকার কেউই কাপড় কিনতে সহজে বাজারে যেতে না। চক্রবর্ত্তী ঠাকুর একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করলে, সেটা এই যে—লালমোহন আর কল্যাণীর ঘর সংসারের যা কিছু সবই ওই ক'ঘর হিন্দু পড়শীরাই নির্ব্বাহ করে দিচ্ছে। রাঁধবার যোগাড় তারাই করে দেয়,—কেবল একবার কল্যাণী ছ'টো চাল ফুটিয়ে নেয় মাত্র। তা'র কচি ছেলেটি পর্য্যন্ত অপর একজনের কাছে মানুষ হ'চ্ছে। লক্ষ্মণ মাইতির স্ত্রী তা'কে নিয়ে রেখেছে;—মাই পর্য্যন্ত খাওয়াচ্ছে। বাইরের সব দেখা শুনা, ওষুধ-পত্র আনা, লোক-জন ডাকা, দিন রাত্রি পাহারা দেওয়া, রাত জেগে বসে' থাকা, এসব আলিমদ্দি আর তার স্ত্রী আর তাদের স্বজাতির মধ্যে আরও ছ'চারজনই ক'রে থাকে। গরুর দুধ দুয়ে এনে উনান ধরিয়ে দিচ্ছে মুসলমান—আর তাই জাল দে' এনে রোগীকে খাওয়াচ্ছে হিঁদু—এ বেশ দেখবারই তারিফ! ভিন্ন ধর্ম্মীর মধ্যে এ রকম সম্প্রীতি দুর্লভ!

সেদিন চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করলে—"আজ কেমন বোধ ক'রছো লাল-মোহনবাবু?" লালমোহনের জ্ঞান হবার পর থেকে তাকে 'বাবু' 'মশায়' ছাড়া গিরীশ চক্রবর্ত্তীর মুখ থেকে অপর সম্বোধন বা'র হয়নি। নেহাৎ কুলির মত তা'কে দেখাত না।

লালমোহন একটু চুপ করে থেকে তার পর বল্লে—"কাল থেকে বেশ একটু সুস্থ বোধ ক'রছি। তবে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলুম, পা' কাঁপতে লাগলো।"

কল্যাণী ঘোমটাটা একটু সরিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বল্লে—"এখনই দাঁড়ান কেন বাপু? কোবরেজ-মশায়, আপনি ওঁকে চলাফেরা ক'রতে মানা ক'রে দিন।"

আলিমদ্দি কাজ থেকে ফিরে এসেছে তখন। সে বল্‌তে লাগলো—"না লালু-খুড়ো, ওরকম গোয়ারতুমি ক'রো না বাবু,—খোদার দোয়ায় পরাণটা য্যাখন ফিরে পেয়েছ, ত্যাখন দু'দিন পরে ত সবই হ'বে?"

লালমোহন বল্লে—"বাঁচলে সবই যে চাই। অজ্ঞান ছিলুম কোন চিন্তাই ছিল না; অমনি অমনি যদি অজ্ঞানই থেকে যেতুম—"

"কি হ'ত তা'হলে?"

"কি হ'ত? হুঁঃ—কি আর হ'ত!—"

"দ্যাখ খুড়ো, মনটাকে অমনতর গুমরে রেখ না। ওর চেয়ে আর পাপ নেই বাবু।"

সে কথা কাণে না তুলেই লালমোহন ব'ল্লে—"বাবু কি বল্লে সর্দ্দার?"

"কি আবার বল্‌বে? একটা একটিনি লোক দে আমি কাজটা চালিয়ে নে যাচ্ছি। তুমি সেরে উঠলেই কাজে গে বসবে। আমি য্যাতক্ষণ আছি ত্যাতক্ষণ তোমার ভাবনা এক চুলও নেই।"

"তা ঠিক বটে; তবে বাবু—হরিবিলাস বাবু আমার উপর কি জানি কেন—"

"তোমার উপর নারাজ বল্‌ছো? হ্যাঁ—তা একটু সময় সময় চুকলী কাটে বটে,—তা হোক্‌গে। আমাকে চটিয়ে সে কিছু করতে

পারবে না। এইখানে তার পরাণ, জানলে ?" এই বলে সে আপনার ট্যাকটা দেখিয়ে দিলে।

আলিমদ্দির কথায় লালমোহন একটু বিরক্ত হয়ে ডাকলে, "সর্দ্দার—"

আলিমদ্দি থতমত খেয়ে গিয়ে বল্লে—"না—তাই বলছি। তাবলে কি দেব না কি ?"

লালমোহন অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে বল্লে—"দেখো, তা যেন তোমার দ্বারা অন্ততঃ না হয় সর্দ্দার। প্রতিজ্ঞা করে তা পালন করা চাই !"

গিরীশ চক্রবর্ত্তী তাদের দু'জনের কথাবার্ত্তা বুঝতে না পেরে উঠে পড়ে বল্লে—"ওসব ভাবনা এখন দিন কতক ছেড়ে দিয়ে আগে বেশ সেরে উঠুন লালমোহনবাবু।" বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

আলিমদ্দিও তার সঙ্গে সঙ্গে উঠানে নেমে এসে বল্লে—"আমিও তাই বলতে লেগেছি কোবরেজ মশায় ; বলে ভারি ত কর্ম্ম ! লালু-খুড়ো যা নেকাপড়া জানে, অমন দশটা বাবুর কাজ একা করতে পারে।"

চক্রবর্ত্তী একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"নেকাপড়া জানে ?"

"জানে বৈ কি !—অনেক জানে। বাবুদের তাই লেগেই ত এত আক্রোশ, বলে, কোন্ দিন সায়েবের নজরে নেগে যা'বে, শেষকালে আমাদের তাড়া'বে।" কথা কইতে কইতে তখন তা'রা দু'জনেই বেড়ার ধারে এসে পড়লো।

চক্রবর্ত্তী বল্লে—"তবে সর্দ্দার সে অমন ছোট কাজ ক'রছে কেন ?"

"কাজটা কি ছোট হ'ল কোবরেজ মশায় !"

গিরীশ একটু অপ্রতিভ হ'য়ে বল্লে—"না, তা নয়, তবে কি না নেকা পড়ার কাজও ত নিতে পারতো?"

"সে ওর খেয়াল ঠাকুর মশাই। আমি আগেই তা' লালুখুড়োকে বলেছিলুম। বলেছিলুম সাহেবের কাছকে গে' দাঁইড়ে পেরিচয় কর। —অমন খুবসুরৎ চেহারা, ঠিক ভুলে যা'বে, তোমায় নেকাপড়ার কাজ দেবে। তা' ও বল্লে' যে না, তাঁতীর কাজ শিখতে ওর বড্ড ইচ্ছে। তাই ত আমি হাতে ধরে কাজ শেখায়। নইলে? বাস্ রে! যা ইঞ্জিরী বই পড়ে!"

বেড়ার আগলটা খুলে দু'জনেই পথে বেরিয়ে পড়লো। শীতের সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। দূর থেকে পথে একটা লোক হন্ হন্ করে এগিয়ে আস্‌ছিল, কিন্তু সাম্‌নে দু'জন মানুষকে দেখেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"আপনারা বল্‌তে পারেন, শিশির চাটুয্যে এখানে কোথায় থাকে?" সে দিকে কাণ না দিয়ে গিরীশ চক্রবর্ত্তী বল্লে—"আজ তবে চল্লুম সর্দ্দার, এবার চারদিন পরে আসবো। আর কোন ভয় নেই, একটু সাবধানে থাক্‌লেই সব সেরে যা'বে।"

আলিমদ্দি বল্লে—"তবে সেলাম্ কোবরেজ মশায়, মধ্যে মধ্যে এখন দেখবেন। আমি আপনার যেমন করে পারি মান রাখবো।"

গিরীশ চক্রবর্ত্তী চলে' যাবার পর আলিমদ্দি মিঞা আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করলে—"কার নাম আপনি বল্লেন? শিশির চাটুয্যে। কই না ত', ও নামের কেউ এখানে ত নেই। আপনি কোত্থেকে আস্‌ছেন?"

"চন্দনপুর থেকে—"

"কম্‌নে যাবেন?"

বাঁশী

"এই তো স্যাঁকরেলের কলবাজার?"

"স্যাঁকরেল বটে, তবে কলবাজার আরও পো টাক্ পথ, সে কলের ঠিক্ পশ্চিম গায়ে। এটা হ'ল পূর্ব্ব দিক্।"

"তাঁতীপাড়া কোনখানটায় বল্‌তে পার?"

"সে তো এইখানটাই। এরেই তাঁতীপাড়া বলে।"

"তাহ'লে তোমাদের এখানে শিশির চাটুয্যে ব'লে কেউ নেই?"

"উহুঁ। এখানকার সব আমি জানি।"

"এই কুড়ি বাইস বছরের ছোক্‌রা, লম্বা চওড়া চেহারা, বেশ ফর্সা, জোয়ান্, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, আর এখানে তা'র স্ত্রীকে নিয়ে বাসা ক'রে আছে—"

সেই সময় করিমন বিবি লালমোহনের বাড়ীতে আস্‌ছিল, আগলের ধারে অচেনা লোক দেখে সে এক পাশে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে এদেরই কথা-বার্ত্তা শুনছিল। আগন্তুকের মুখে চেহারার বর্ণনা শুনে এগিয়ে এসে বল্লে—"হ্যাঁ গো বাবু, ওই রকম ছেলে বৌ নে' এখানে একজন আছে—আমি তা'দের ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তোমার কি নাম বল দিকি?"

করিমনের কথায় আগন্তুক যেন একটু আশ্বাস পেয়ে হাঁপ ছেড়ে ব'ল্লে—"চল ত বাছা দেখিয়ে দেবে।"

আলিমদ্দি তা'র স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"তুই তেমন লোক্‌কে জান্‌বি কি করে? যা' তা' একটা ওম্‌নি বল্লেই হ'ল?"

করিমন বল্লে—"যা' তা নয়; তুমি চুপ কর না। তোমার নাম কি গা?"

"আমার নাম? আচ্ছা বোলো, বাঞ্ছারাম।"

'আচ্ছা। আপনি এখন তাহ'লে এনার সঙ্গে যাও; আমি একটু কাজ সেরে তোমায় তাঁদের বাড়ী দে' আসবো। ওগো তুমি তোমার দাওয়ায় ত্যাতক্ষণ বসাও গে, আমি এখুনি আসছি।'

আমিনদ্দি একটু হতবম্ব মেরে গেল। কিন্তু স্ত্রীর কথার আর কোনও বাদানুবাদ না করে' আগন্তুককে নিয়ে নিজের বাড়ীর দিকে চলে গেল। আর করিমন-বিবি তখন আগল ঠেলে কল্যাণীদের বাড়ী ঢুকলো।

৪

পরের দিন দুপুর-বেলায় ঘরের মেজেয় একখানা মাদুরের ওপর লালমোহন শুয়ে ছিল, আর বাঞ্ছারাম বসে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছিল। একটু দূরে কল্যাণী তার ছেলেকে দোলায় শুইয়ে আস্তে আস্তে তাকে দোল দিতে দিতে উভয়ের কথা শুনে যাচ্ছিল। বাঞ্ছারাম বল্লেন,—"তুমি যাই কেন না বল, তোমার আরও দিন কতক কোলকেতার বাসায় থেকে অপেক্ষা করা উচিত ছিল না কি? তা হলে ত আমার সঙ্গে দেখা হত। তুমি চলে আসবার দিন আষ্টেক বাদেই আমি গিয়ে দেখলুম কেউ কোথাও নেই।"

লালমোহন বল্লে—"আমার তখনকার মনের অবস্থা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। আমি তখন নির্ব্বান্ধব, নিঃসহায়। আপনারা সকলেই আমায় ছেড়ে গেছেন। তার ওপর ঘাড়ে একটি মুমূর্ষু রোগী —তিনি ত বে'র সাত দিন পরেই মারা গেলেন।"

—"কেন, সমিতির ছাত্রেরা?"

—"একমাত্র সুশীলবাবুই শেষ পর্য্যন্ত এসেছিলেন। আর সকলেই একে একে আমায় ত্যাগ করেছিল। যে মুহূর্ত্তে প্রকাশ হল যে বে' করার অপরাধে বাবা আমায় তেজ্যপুত্র করেছেন—বিষয় থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি, সেই মুহূর্ত্তেই সকলে আমাকে একটা দুঃস্বপ্নের মত—

সমাজের অস্পৃশ্যের মত ভেবে নিয়ে গা ঢাকা দিলে। শুনলাম বাপ-মা তাদের আমার সঙ্গে মিশতে বারণ করে দেছে।" বলেই লালমোহন হাস্‌তে লাগলো।

বাঞ্ছারাম আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—"কি দুর্ভাগ্য সমাজের। অপরাধ কই—অপরাধ কোথায় ?"

কল্যাণী এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল—মাথার কাপড়টা একটু সরিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বল্লে—"আমি সেই সময়েই বলেছিলুম আমায় ত্যাগ করে ঘরে ফিরে গিয়ে বাপের পায়ে ধরে মার্জ্জনা চাইতে। তাহলে আজ এই দীনহীন কাঙ্গালের মত এই দূর দেশে লুকিয়ে থাকতে হত না। তুমি যেখানকার সেথায় থাকতে, বাপ-মারও মর্য্যাদা থাকতো। আমার ভাগ্যে,—আমিই তোমার চির-জীবনের পথের কাঁটা হয়ে রইলুম।" তার গলাটা ধরে এল, সে আর কথা কইতে পারলে না। চুপ করে বসে নখে করে মাটিতে আঁক কাটতে লাগলো।

লালমোহন অনেকক্ষণ ধরে সেই স্থির নিশ্চল প্রতিমার মত মূর্ত্তিটির পানে চেয়ে থেকে বল্লে—"কি দোষে তোমায় ত্যাগ করবো কল্যাণী ? একদিন আদর করে তোমায় গ্রহণ করেছিলুম কি আর একদিন তোমায় ত্যাগ করবো বলে ?"

কল্যাণী বল্লে—"তখনত আমি জানতুম না যে তুমি তোমার বাপ-মা সকলকার অমতে বে' করেছো।—মাসীমার কথাও থাকবে না, সমাজও আমাদের বে'তে মত দেবে না!"

একটু বিরক্তির সঙ্গে লালমোহন বল্লে—"সমাজ মত দিক চাই না দিক, বে'ত ফেরান চলে না কল্যাণী ? শালগ্রামও ছিল—পুরোহিতও

ছিল, অনুষ্ঠানের ত্রুটিও কিছু হয়নি। লোকাচার মানিনি বটে, শাস্ত্রের ত কোনই অমর্য্যাদা করিনি।"

বাঞ্ছারাম বলে' উঠলেন—"লোকাচারই এখন শাস্ত্রকে ছাপিয়ে উঠেছে। লোকে শুনে কি বলবে সেই ভেবেই মানুষ অস্থির যে—"

লালমোহন জিজ্ঞাসা করলে—"মানুষের মনুষ্যত্বকে, কর্ত্তব্যকে লোকাচারের নাগপাশে বেঁধে রাখাটাই কি সমাজের প্রধান কাজ?—চুপ করে রইলেন কেন? আপনিই ত এ বিবাহ দেছেন?"

বাঞ্ছারাম বল্লেন—"আমার আর এতে বলবার কি আছে? আমি বিবেকের অনুসরণ করেছিলাম।" তার পর একটু চুপ করে থেকে আবার বল্লেন—"তবে দেখ, আমি শাস্ত্রই পড়েছি,—পৌরোহিত্য কখন করিনি; হয়ত তাঁদের মতে এটা ঘোর অন্যায়। তাঁরাই ত এখন সকল বিধান দিয়ে থাকেন, লোকেও তাই মেনে চলে। আমি তোমার এই বিবাহে মত দিয়েছি, নিজেই সম্প্রদানের মন্ত্র পড়িয়েছি;—কিন্তু আমার দাদা তোমাদের কুল-পুরোহিত, তাঁরই বিধানে তোমার বাপ তোমায় ত্যজ্যপুত্র করেছেন—আর অসামাজিক কাজে সহায়তা করেছি বলে আমায় গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

এই ঘটনা শুনে পর্য্যন্ত তাদের স্বামী-স্ত্রীর অন্তরে বড় আঘাত লেগেছিল। গত রাত্রে বাঞ্ছারাম যখন তাঁর অপমান আর লাঞ্ছনার কথা বিবৃত করেছিলেন—কেমন করে লালমোহনের বাপ তাঁকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে দাসী চাকরের সমুখে অপমান করে' বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কর্ম্মচারীদের হুকুম দিয়ে তাঁর ঘরের চাল কেটে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন, সে সময় লালমোহন আর কল্যাণীর চোখের

কল বাবা মানেনি। দু'জনেই কাতর হয়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করেছিল। এখন আবার সে কথার উত্থাপন হওয়াতে তারা মাথা নীচু করে বসে রইল। অনেকক্ষণ ঘরটার মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো—কারো মুখ দিয়েই কোন কথা বার হল না। খানিকটা সেই ভাবে কেটে যাবার পর বাঞ্ছারাম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন—"এখন মনে হয় তোমরা দু'জনে সেই সময় ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেই বোধ হয় ভাল হ'ত, কারো কোন কথা বলবার থাকতো না।"

লালমোহন অল্প হেসে বল্লে—"হ্যাঁ—মনকে চোখ ঠারা হত বটে। কেউ কেউ সে কথা বলেও ছিলেন, কিন্তু আমি সেটাকে কাপুরুষের কাজ বলে মনে করেছিলুম।"

—"কাপুরুষের কাজ মনে করেছিলে?" বাঞ্ছারাম বিস্মিত হয়ে লালমোহনের মুখের দিকে চাইলেন।

লালমোহন কতকটা যেন কৈফিয়ৎ দেবার মতই বল্লে—"না না, আপনি আমার কথায় মনে করবেন না তাবলে যে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের দোষ দিচ্ছি। সে কথা নয়। সে ধর্ম্মের মধ্যে যথেষ্ট উদারতা আছে আমি তা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমি কেন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করতে যাব? সহায়-সম্পত্তি হীনা নিস্তারিণী দেবীর অক্ষণীয়া মেয়েকে বিবাহ করে, বা সেই অবস্থার মধ্যে থেকে বারেন্দ্র সমাজের একটী পাত্রীকে ঘরে এনে সত্যই কি আমি ধর্ম্মে পতিত হয়েছি?"—তার পর একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভেবে নিয়ে আবার লালমোহন বল্‌তে লাগলো—"যাক, কেন আর মিছে সে সব কথার আলোচনা করা। এ নিয়ে ত

আপনারা অনেক বাদানুবাদ করেছেন, আমাকেও যেমন আদেশ দিয়েছিলেন—কর্ত্তব্য ভেবে আমিও তাই করেছিলুম।"

অনেকক্ষণ আবার সব চুপচাপ রইল। তার পর বাঞ্চারাম বল্লেন—"তোমার শেষটা ত এখনও শোনা হয়নি? লেখাপড়া হঠাৎ ছাড়লে কেন?"

লালমোহনের রুগ্ন পাণ্ডুর মুখে আবার একটু ম্লান হাসি দেখা দিলে। সে বল্লে—"কই আর তা হল। আগের মাস থেকেই ত বাবা টাকা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আপনি চলে যাবার পর একদিন কলেজ থেকে এসে দেখি, আমার সেই মানুষ-করা মা—যে আমার বাসায় ছিল, এরই কাছে একখানা চিঠি আর কিছু টাকা রেখে পুরন ঝিটাকে পর্য্যন্ত সঙ্গে নিয়ে দেশে চলে গেছে। চিঠিটা আপনারই,—প'ড়েও ব্যাপারটা বুঝে নিলুম। তবে মনে করেছিলুম, দু'একদিনের মধ্যেই ফিরবে। দু' হপ্তা কেটে গেল, কেউ এল না। তার পর কল্যাণীর মা যেদিন মারা যান্ সেইদিন আবার বাবার উইলের কপি পেলুম—বাবাই পাঠিয়েছেন, তাতে আমায় তেজ্যপুত্র করা আছে। আমি কিন্তু কোন কথাই কাকে কাছে লুকুই নি। বাড়ীওলা ভাড়ার তাগাদা জুড়ে দিলে। নতুন ঝি চাকর মাইনে না পেয়ে হৈ হৈ করতে লাগলো; ডাক্তারও বাকি টাকা ক'টার জন্মে লিখে পাঠালে। দেখলুম আসরে নামাবার বেলা বাঙালী সমাজে অনেকে জোটে, শেষে কৈফিয়ৎ দেবার সময় এলেই সব গা ঢাকা দেয়—আর আড়ালে দাঁড়িয়ে মজা দেখে।" এই পর্য্যন্ত বলেই লালমোহন শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে বালিসে মাথাটা দিয়ে শুয়ে পড়লো।

বাঞ্চারাম বল্লেন—"আমাদের ওপর যেন সে কলঙ্ক চাপিও না।

আমি যে কেন আস্‌তে পারিনি, তার কারণ ত সবই শুনেছ। তার পর তিনি, যিনি তোমায় মানুষ করেছেন, তিনি মস্ত বড় একটা ভুল করেছিলেন ;—তাঁরই বিশেষ অনুরোধে আমি দেশে গিয়ে সেখানে যা যা ঘটেছিল—কেবল সেই খবরটা দিয়েছিলুম,—তাই লিখেছিলুম তোমার বাবা উইল বদ্‌লেছেন ; তিনি কেন যে তার প্রতিকার করবার আশায় একেবারে সেথা গিয়ে হাজির হলেন, বলতে পারি না। অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতা হয়েছিল তাঁর। হয় তো বা তোমার বাবা বাড়ীতে তাঁকে বন্দী করে রেখেছেন—তাই বা কে বলতে পারে? এক বছর গ্রামের ত্রিসীমায় যাইনি। সহরেই ছেলে পড়িয়ে কোন গতিকে চালাচ্ছি। সম্প্রতি—এখানে আসবার কিছু দিন আগে শুনলুম তোমাদের বাড়ীর সকলেই না কি কোলকাতায় রয়েছেন।" লালমোহন বিরক্তভাবে বল্লে—"যাক্ সে কথা, এখন আমার কথাটা শুনুন। শেষে তাগাদার চোটে অস্থির হয়ে আমি আমার ঘড়ী চেন আংটি যা ছিল সব বেচে সকলের দেনা মেটালুম! বাসা কাজে কাজেই তুলে দিতে হল। তার পর ভাবলুম কোলকাতা সহর—ছেলে ফেলে পড়িয়ে যা হয় করে একটা ব্যবস্থা করে নেব। তাই কল্যাণীকে ওর এক পিসীর বাড়ীতে দিন কতক রেখে একটা আস্তানা খুঁজে বার করবো ভেবে একদিন ওকে সেখানে নিয়ে গেলাম।—"

বাঞ্ছারাম আগ্রহের সহিত বল্লেন—"সে ত খুব ভালই হত—"

—"আগে শুনুন, ভাল ত হত, কিন্তু তাতে আরও বিপরীত হল।"

—"বটে? তিনি কি বল্লেন?"

—"তিনি যা বল্লেন, সে কথা মুখে আনা চলে না। অনেক অকথা

কুকথা বলে তিনি কল্যাণীর স্বর্গীয়া মাকে গালাগালি করলেন আর জানালেন যে তাঁর স্বামী একজন সমাজপতি লোক, ও মেয়েকে ঘরে রাখলে পাঁচজনে গায়ে থুথু দেবে। তার পর গৌরচন্দ্রিকা শেষ করে স্পষ্ট বল্লেন—তুমি বাপু তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এখনি চলে যাও। নইলে কর্ত্তা এসে পড়লে একটা অনর্থ বাধাবে, পাঁচজনে তাকে মানে গণে—ও কলঙ্কের কথা আর ঢাক পিটে বেড়িও না।"

বাঞ্ছারাম স্তব্ধ হয়ে লালমোহনের মুখের দিকে খানিক চেয়ে বল্লেন—"তোমার শ্বশুরের আজ যদি হাজার দশেক টাকার কোম্পানির কাগজ বা ইন্‌সিওরেন্স পলিসি থাকতো, তা হলে দেখতে—তিনিই আবার আদর করে তোমাদের গাড়ী থেকে নামিয়ে নিতেন।"

লালমোহন বল্লে—"তা হয় ত হত। তখন সেই সন্ধ্যার সময় পথের মাঝে আমি কি করি! বাসা তুলে দিয়েছি। আমি অগাধ ভাবনায় পড়লুম। কল্যাণী কাঁদছে—পিসীর দুর্ব্বাক্য বুকে তার শেল বিঁধে দিয়েছে। কিছু না ঠিক করতে পেরে তাড়াতাড়ি গাড়ী ফিরিয়ে এক বন্ধু—আপনি ত জানেন সেই নলিনীদের বাড়ী—?"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ যার বাড়ী থেকে তোমার বে হয়েছিল!"

—"হুঁ। তাদের বাড়ীতে গিয়ে নামলুম। কিন্তু নলিনী সে আর সে নলিনী ছিল না। তারা বড় লোক—বাপ ধানবাদের কুঠিতে থাকে, মা আর ছেলে কোলকাতায় থাকে। সেদিন আমায় তারা আমলই দিলে না।"

—"কেন—কেন, তারা ত আগে অনেক সাহায্য করেছিল?"

—"তখন জানতো আমিও জমীদারের ছেলে, তাই সাহায্য করে

ছিল। পথের ভিখারী দেখে আর সে ভাবে কথাই কইলে না।" একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস লালমোহনের বুক থেকে উঠে গলার কাছে আটকে তা'কে একেবারে চুপ করিয়ে দিলে,—সে যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে হাতখানা বুকের ওপর রেখে আবার শুয়ে পড়লো।

ঘরটার মধ্যে তখন যেন জমাট নিস্তব্ধতা বিরাজ ক'রতে লাগলো—কা'রো কোন কথা ক'বার শক্তি ছিল না। খোলার চালের ওপর একটা কাক উড়ে এসে বসতেই সেই শব্দটায় সকলকার চমক ভাঙিয়ে দিলে। বিষণ্ণ মুখে কল্যাণী বলতে লাগল—"ওগো, চুপ কর এখনও তোমার শরীর বড় দুর্ব্বল, কথা বলতে হাঁপিয়ে উঠছো—ও পুরন কাহিনী বলে' আর কি হ'বে?"

লালমোহন আবার উঠে বল্লে—"না কল্যাণী, কথাটা শেষ' করে নি। পূর্ব্বেই সব লোক জানাজানি হ'য়ে গিছলো। আমাদের গোমস্তা, বাবার হুকুমে আমার সব বন্ধু-বান্ধবের কাছে আমার নামে অনেক কথা বলে গিছলো। আমার দুষ্কৃতির জন্যেই যে বাবা আমায় ত্যাজ্যপুত্র করেছেন, এইটাই সকলের বিশ্বাস। নলিনীও আমায় আশ্রয় দিতে স্বীকার ক'রলে না। তা'র মা আগে আমায় কত ভালবাসতেন, তিনি ভিতরে ডাকিয়ে বল্লেন—'না বাছা, তোমার অনেক দোষ, তুমি স্বদেশী কর, খদ্দর পর, কোম্পানী তোমার পিছনে লেগে আছে। তোমার আপন বাপই যখন ঠাঁই দিতে ভয় পেলে, তখন আমরা বাছা আর কি ক'রতে পারি?' নলিনীর ব্যবহারে আমার মাথাটার মধ্যে যেন আগুন জ্বলে' উঠলো। বাপ-মা, সমাজ-ধর্ম্ম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সব একে একে আমার চোখের সমুখ থেকে সরে গেল। আর কারো কথা আমার মনে রইল

না। নলিনীকেও আর বিপন্ন করতে চাইলুম না। কল্যাণীকে নিয়ে রাত্রিটুকু কোন গতিকে তা'দের বাইরের ঘরে কাটিয়ে, ভোরের অন্ধকার থাকতে থাকতে কাকেও কোন কথা না বলে' একেবারে আর্মানী ঘাটে এসে হাজির হ'লুম,—তার পর ছ'খানা রাজগঞ্জের টিকিট কিনে ছ'জনে বেলা দশটার জাহাজে চড়ে' বসলুম। তখন আমার সঙ্গে ছিল পাঁচ টাকা দশ আনা আড়াই পয়সা। সেই থেকে হেতা আমি কি করছি না করছি তা' ত সবই শুনেছেন?"

বাঞ্ছারাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন—"আনিমুদ্দি সর্দ্দারের মধ্যেও অনেক মনুষ্যত্ব আছে। যাই হোক্, আমাকেও যদি একটা খবর দিতে তাহলে এতকাল ধরে তোমার অনুসন্ধান করে বেড়াতে হ'ত না। তখনই আমি চলে আসতাম।"

লালমোহন বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল—হতাশভাবে বল্লে—"কারো কাছে আমাদের অস্তিত্ব জানাবার ইচ্ছা ছিল না। তবে না কি ব্যারামটা বড়ড শক্ত হয়েছিল, যদি মরে যাই, কল্যাণীর জানা লোক কেউ থাকবে না—সেই ভেবেই আন্দাজে পুরাণ বাড়ীওলার ঠিকানায় চিঠিখানা লিখেছিলুম, যদি কোন দিন আপনার চোখে পড়ে।"

বাঞ্ছারাম বল্লেন—"আমি যে প্রায়ই সেখানে সন্ধান নিতে যেতাম।"

সেই সময় বার হতে কে ডাক্‌লে—"লালমোহন বাবু কি কর্‌ছেন?"

লালমোহন একটু চকিত হয়ে বল্লে—"হরিবিলাস বাবু না কি? আসুন না।"

কোন জবাব না দিয়েই হরিবিলাস ঘরের দরজা ঠেলে উঁকি মারলে।

কল্যাণী চট্ ক'রে ঘোমটা টেনে উঠে পড়লো। হরিবিলাস তাই দেখে যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েই বল্লে—"ও—আপনার স্ত্রী এখানে আছেন—তবে এখন আসি। একটা বিশেষ কথা ছিল।" লালমোহন বসে বসেই বল্লে—"না—না, সে কি কথা, আপনি একটু পাশ দিন না, এখনই ও চলে যাবে।"

এক রকম দরজা চেপেই সে দাঁড়িয়ে ছিল, লালমোহনের কথায় সরে দাঁড়াতেই কল্যাণী ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কল্যাণী মুখখানা ঢেকে ফেলবার পূর্ব্বেই হরিবিলাস তার অনুপম সৌন্দর্য্য আর অপূর্ব্ব যৌবনশ্রী দেখে একেবারে বিমুগ্ধ হয়ে গিছলো। কেবলই মনে হচ্ছিল—এত রূপ লালমোহনের স্ত্রীর। হতভাগা,—একটা তাঁতি বই কিছুই নয়—।' কল্যাণী চলে গেলেও সে সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘরে যে আরও ত'জন আছে, সে কথা যেন সে ভুলেই গেল।

লালমোহন ডাকলে—"আসুন, ঘরের ভিতর এসে বসুন—" হরিবিলাসের চমক ভাঙলো—"হ্যাঁ—এই যে" বলেই সে ঘরের ভিতর এসে বসে বল্লে—"কই, আপনি ত এখনও সারতে পারেন নি?" বলে সে লালমোহনের দিকে চেয়েই চোখটা নামিয়ে নিলে। লালমোহনের চোখের একটা অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ ছিল। গম্ভীরভাবে লালমোহন বল্লে—"আপনার কি বলবার আছে বলুন—ইনি আমার আপনার লোক।"

৫

কল্যাণী তাদের শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে ধীর-মন্থর গতিতে সোজাসুজি উঠানটা পার হয়ে ওদিককার ছোট রান্নাঘরখানির দাওয়াতে গিয়ে চুপ করে বসলো। হাতে তার তখন কোন কাজই ছিল না,—ছেলেকেও ঘুম পাড়িয়ে দোলায় শুইয়ে রেখে এসেছে। তখন সে কি করবে না করবে ঠিক করতে না পেরে ভাবলে, তবে একবার নাস্তুদের বাড়ী বেড়িয়ে আসি। নাস্তুর বাপ নফর মিস্ত্রী চটকলেই কাজ করে সেই পাড়াতেই থাকে। কল্যাণী উঠি উঠি করছে, এমন সময় একদল ছেলে মেয়ে মহা হৈচৈ করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হল। তাদের দেখে কল্যাণী বল্লে—"কি রে কি, তোদের আজ আবার ঝগড়া বাধলো না কি? ওসব আবার কেন—ওসব এখন কে খাবে?" ছেলে-গুলো তখন কেউ বা লাউ-শাক, কেউ বা পুঁই-শাক, কেউ গোটাকতক বিলাতী-আমড়া, কেউ দু'টো কয়েৎবেল আর চারিটি পাতি লেবু এনে তার পায়ের কাছে রেখে পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে ঢিব ঢিব করে প্রণাম করতে লাগলো। তাদের মধ্যে একটু মাথায় উঁচু একটি ছেলে বল্লে—"বিলের কৈ, শিঙি মাছ ত আনতে পান্নুনি মাঠান্, নইলে আজ এই এত ছ্যাল।" অমনি তার মুখের কথা লুফে নিয়ে আর একটা গালফুলো গোবিন্দ গোছের ছেলে বলতে লাগলো—"আলিমদ্দির বিবি

মাছ আনতে দিলে না যে মাঠান, নইলে—হুঁ। এতক্ষণ আপনি তাহলে দেখতে পেতে।” কল্যাণী বল্লে—“না রে বাবা, না, মাছ-টাছ কিছু এখন আসিনি, ওসব এখন হাঁড়িতে তুলতে নেই যে ধন। আর এসবই বা এত আনলি কেন—এত রাঁধবেই বা কে, আর খাবেই বা ক'জন?” একজন ছেলে জবাব দিলে—“যা পার বেনিয়ে নিও, বাকি না হয় ফেলে দেবে। দরকার হলেই আবার এনে দেব তার কি, গাছের জিনিস।” আর একজন জিজ্ঞাসা করলে—“বাবাঠাকুর কেমন আছে গা মাঠান্?” কল্যাণী বল্লে—“তোমাদের কল্যাণে একটু সেরেছেন বাবা, এইবার কাজ-কর্ম্ম করবেন। তোদের পড়া-শুনা সব বন্ধ আছে, নয় রে?”

—“হিঁ গো মাঠান, ওমাস থেকে ত সবই বন্ধ আছে—কে আর পড়া বলে দেবে? কাজ থেকে এসে ওই আপনারাই এট্টু পড়ি নিকি।”

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করলে—“কারখানার আর কাকেও তোরা জিগ্‌গেস্‌ করতে পারিস না?”

কল্যাণীর কথায় অবাক হয়ে গিয়ে একজন বল্লে—“তা কি আমরা পারি?”

—“কেন পারিস না?”

—“কেউ তা বলে দেয় না মাঠান্। সব ঠাট্টা করে, গালাগাল দেয়।” তার পর গলার আওয়াজটা খাটো করে বল্লে—“ওই যে দত্ত মোশাই, আমাদের তাঁত ঘরের বাবু—এখন আপনাদের ঘরকে এল, ওনাকে সে দিন আমি একবার বলেছিনু—‘বাবু যদ্দিন না আমাদের সেরে ওঠেন, সাঁঝের বেলা আমরা এসবো—এট্টু পড়া বলে দেবেন?’

তা' তেড়ে মারতে এল মাঠান! বল্লে—'শালা ব্যাটারা, লেকাপড়া শিখে নাটসায়েবী করবি না কি? যা সব নল গুছোগে যা, নইলে সায়েবকে দে নাতি খাওয়াব।"

কল্যাণীর প্রাণটা করুণায় গলে গেল। তাদের দিকে চেয়ে বল্লে—"তোরা সব কত করে রোজ পাস বাছা?"

সেই ছেলেটি জবাব দিলে—"চোদ্দ পয়সা মাঠান,—আমরা ছোকরারা আর কত পাব?"

—"তোদের বাপ-মা, তারাও ত কাজ করে? তবে এত কচি বয়সে এখনি তোদেরও কাজে লাগিয়েছে কেন? পাঠশালে যাবার বয়স—"

—"আর মাঠান্! কাজ না করলে খাব কি? বাবা ত হপ্তায় চার টাকা আর মা আড়াই টাকা এই ত তারা ত'জনে কামায়। ঘরের ভাড়া দে, সর্দ্দার দারোয়ান বাবুদের দে কত আর থাকে মাঠান্? আমার চোদ্দটি পয়সায় তবু তোমার গে হপ্তায় এক টাকা সাড়ে আট আনা ঘরে আসে।"

অমনি আর একজন বল্লে—"আর পাঠশালে পড়বার কথা যে বলছো আপনি, সে কি আমাদের ঘরে হয় গা মাঠান্। তবে বাবাঠাকুর না কি অমনি পড়া শেখায়, তাই—"

কল্যাণীর মুখে আর কথা বেরুল না। এই সব অকাট্য যুক্তির কাছে আর কোন উত্তরই দেওয়া চলে না। বাপ-মা আর এই দুগ্ধ-পোষ্য বালকেরা সবাই মিলে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সপ্তাহে বড়জোর আটটি মাত্র টাকা রোজগার করে; যদি সারা মাসটা কাজ হয়, তবে

মাসে বত্রিশ টাকা ঘরে আসে। তার পর অসুখ বিসুখ আছে, কল বন্ধ আছে,—আর এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে,—উঃ কি কষ্ট? কল্যাণী চট করে জিজ্ঞাসা করলে—"হ্যাঁ রে তোরা ক'টি ভাই বোন্? তোদের ঘরে আর কে কে আছে?"

ছেলেটি উত্তর দিলে—"এই আমি, আমার ছোট দু'টো ভাই আর একটা বুন,আর বাবা, মা নানী—"

—"থাম বাবা থাম, আর বলতে হবে না, আমি সব বুঝতে পেরেছি রে তোরা তাহলে সাতটি খেতে। তোর নানী খুব বুড়ী হয়ে গেছে না রে?"

—"ও খুব বুড়া সে, কোমর বেঁকে গেছে—লাটি ধরে চলে; রাত্তিরে চোখে দেখতে পায় না।"

কল্যাণীর বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে উঠলো। চোখ দু'টো তার জলে ঝাপসা হয়ে এল। সে যেন তার চোখের সামনে দেখতে পেলে—এক-ঘর কঙ্কাল সার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে তাদের মাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কেবল খাই খাই করছে, আর তাদের মা সকালে উঠে কিছু খেতে দিতে না পেরে এক হাতে চোখের জল মুছছে আর অপর হাতে কারো গায়ে বা মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে—কত রকম মিথ্যা কথা বলে তাদের ভুলাবার বৃথা চেষ্টা করে তাড়াতাড়ি কারখানায় চলে যাবার জন্যে বাড়ীর বাইরে ছুটে পালাচ্ছে। কিন্তু সে সব আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করতে না পেরে সেই ক্ষুধার্ত্ত উলঙ্গ শিশুরদল মার পিছনে পিছনে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে। অপর দিক হতে একজন জীর্ণা শীর্ণা শুষ্ক কঙ্কালের মত বৃদ্ধা লাঠিতে ভর দিয়ে প্রতি

পদক্ষেপে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে গিয়ে তার সেই নাতি-পুতিদের ধরে রাখবার জন্যে বৃথা পরিশ্রম করে পথের মাঝেই বসে বসে হাঁপাচ্ছে আর চেঁচিয়ে বলছে—'ওরে আয় আয়, ঘরে আয়, যাস্‌নি যাস্‌নি, পথে গাড়ী চাপা পড়ে এখনি মারা যাবি। বড় সাহেবের হাওয়ার গাড়ী এখনি বেরুবে! আয় দাদা আয় দিদি, মাকে তোদের কাজে যেতে দে, নইলে ফটক বন্ধ হয়ে যাবে—বাঁশী অনেকক্ষণ থেমে গেছে। না গেলে রোজ কেটে নেবে, ঘরে একটাও চাল নেই। এই আধলাটা নিয়ে উড়েদের দোকান থেকে মুড়ি কিনে এনে ভাগ করে খা। কল্যাণীর বুকের ভিতর থেকে একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে উঠে এসে বাইরের বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে গেল। সেই রকমই কতকগুলি অস্থি-চর্ম্মসার ক্ষুধার্ত্ত ছেলে মেয়ে তখন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেন তার কাণের কাছে অবিরত ধ্বনি উঠছে—'ওগো আমাদের খেতে দাও খেতে দাও,—পেট ভরে না খেতে পেয়ে আমরা এত শীর্ণ, এত দুর্ব্বল। সে এক এক করে সব ক'জনেরই মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। হঠাৎ চিন্তার-ধারা বাধা পেয়ে তাকে অন্য দিকে নিয়ে গেল। তার মনে হল –আমিও ত এদেরই একজন। আমার স্বামীও ত এদের বাপ খুড়োর মত কলঘরে তাঁত চালায়—পুরো সাতটা দিন খেটে তবে শনিবার সাতটি টাকা নিয়ে ঘরে এসে আমায় রাখতে দেয়। আজ একমাসেরও উপর কাজ নেই—ঘরে একটা পয়সাও নেই। যা ছিল সব ফুরিয়ে গেছে। আলিমদ্দিরা সব দিকে নজর রেখেছে বলেই অভাব টের পাইনি। কিন্তু—তখন তার মনে হল—'আচ্ছা, আরও দু'তিনটি ছেলে মেয়ে হলে আমাদের অবস্থা কি ভীষণ দাঁড়াবে! কোথা

থেকে তাদের খাওয়াবো, কে যোগাবে! শিক্ষাই বা তারা পাবে কেমন করে? এদের মত এই রকম করেই ত তারা তখন বেড়াবে?—গরীবের ঘরে বেশী ছেলে-পুলে হওয়া ভাল নয়!' মাথাটা কল্যাণীর কেমন ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো। এমন সময় তার মনে আপনা হতে একটা প্রশ্ন উঠলো—'এই সব ছেলে-মেয়েগুলি—যারা এখন এমনি অসভ্যের মত ধুলো-কাদা মেখে বেড়াচ্ছে, কারখানায় গিয়ে সামান্য রোজগার করে বাপ-মার সাহায্য করছে, এরা যদি বেশ সৎ শিক্ষা পায়, একটু লেখাপড়া শিখতে পারে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ভদ্র-সংসর্গে বেড়াতে পায়, তখনও কি এরা এমনিতরই থাকবে! এরা কি তখন বেশ মানুষের মত মানুষ হয়ে আর কোন রকম একটা আলাদা উপার্জ্জনের পথ বেছে নিতে পারবে না?' কল্যাণীর অন্তরাত্মা যেন সাড়া দিয়ে বল্লে—'হাঁ। পারবে, খুব পারবে, আজীবন সে সুযোগ পায়নি বলেই ত এরা এমন দুর্দ্দশা ভোগ করছে। কেউ এদের মুখ চায় না বলেই ত এরা এক পাশে ঠেলা পড়ে রয়েছে—সমাজই এদের সমাজের আবর্জ্জনা করে রেখেছে। একখানা কালো-পর্দ্দা এদের চোখে ঢাকা রয়েছে তাই;—যেদিন সেই মোটা কালো পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে একটুকু আলোর সন্ধান এরা পাবে বা কেউ সেটুকু দেখিয়ে দেবে, সেদিন কেউ আর এদের ঠেলে রাখতে পারবে না, নিজেরাই নিজেদের পথ খুঁজে নিয়ে আলোর সন্ধানে ছুটে বেরিয়ে পড়বে।' কল্যাণীর নির্ম্মল চিত্তে এই কথা উদয় হবামাত্র সে যেন অন্তরে কেমন একটা নতুন প্রেরণা অনুভব করলে,—যেন তার বুক থেকে একটা ভারি বোঝা নেমে গেল। এমন স্বচ্ছন্দতা পূর্ব্বে সে কখন পায়নি; এ যেন একটা নতুন ইঙ্গিত। পরক্ষণেই তার মনে হল

ঝাঁশী

—প্রায় বছরাবধি তার স্বামী প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা কাজ থেকে এসে হাত-মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তিন চার ঘণ্টা যতক্ষণ সে বাইরে থাকে—আলিমদ্দির স্ত্রী এসে তার সঙ্গে গল্প-গাছা করে কাটায়। কিছুদিন এমনি. করে কেটে গেলে পর একদিন স্বামীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে স্বামী উত্তর দিয়েছিল—আলিমদ্দির বাইবের ঘরে একটা পাঠশালার মত করা হয়েছে, সেখানে সব কারখানার মজুরদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পড়তে আসে। তার স্বামী তাদের এই অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়েছে। পড়া-শোনার এমন নেশা ধরে গেছে যে ছেলে-মেয়েদের দেখাদেখি বুড়ো বুড়ো লোকগুলো পর্যন্ত পড়তে সুরু করেছে। আর সব মিস্ত্রী আর সর্দারেরা মিলে হপ্তায় দু আনা চার আনা করে চাঁদা দিয়ে একটা ফণ্ড খুলে ফেলা হয়েছে, সেই পয়সা থেকে যখন যা দরকার হয়—বই, শ্লেট, পেন্সিল কেনা হয়! কল্যাণী শুনেছিল বটে কিন্তু এত দিন তার মনের মধ্যে কোন ছাপ পড়েনি। কিন্তু আজ হঠাৎ শুভ মুহূর্ত্তে সেই সব কথা মনে পড়ে তার অন্তরে কেমন একটা শিহরণ এনে দিলে—তার চোখের সমুখে তার স্বামীর একটা উজ্জ্বল মূর্ত্তি ভেসে উঠলো, এ মূর্ত্তির দর্শন সে অদ্যাবধি পায়নি। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে গর্বে তার বুক খানা ভরে উঠলো, ভগবানের উদ্দেশে তার মাথা নত হয়ে পড়লো। ছেলে-মেয়েদের দিকে প্রসন্ন-মূর্ত্তিতে চেয়ে সে বল্লে—"ঘ্যাখ বাবা, উনি যদ্দিন না বেশ ভাল হয়ে সেরে ওঠেন, তোরা আপনি আপনি পড়া শোনা করিস—যেন ছাড়িস্ নি। আর যখন কিছু জেনে নেবার দরকার হবে আমার কাছে আসবি, আমি যা পারি বলে দেব।"

কল্যাণীর মুখে ওই কথা শুনে ছেলেরা মহা উল্লাসে বলে উঠলো—"তুমি বলে দেবে মাঠান —তুমি আমাদের পড়া নেবে ?"

"—হ্যাঁ রে, আমার কাছেই আসবি, আর কোথাও যাসনি।"

একজন ছেলে তখন একটু বিমর্ষ হয়ে বল্লে —"তা মাঠান এই নেংটে পুঁটে-নুরফৎ কি সেতু এরা যাখন ত্যাখন আসতে পারে ; কিন্তু আমরা কাজে লেগেছি—সন্ধ্যাবেলা ছাড়া ত পারবো না ?

কল্যাণী বল্লে—"তখনই আসবি। যখন তোদের সুবিধে হবে তখনই আসবি—আমার ত সব সময়ই ছুটি।"

৬

ছেলেরা দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে মহা কলরব করছিল। সেই সময় হরিবিলাস, বাঞ্ছারাম, আর তাদের পিছনে লাঠি ধরে আস্তে আস্তে লালমোহন এসে উঠানে নাম্‌লো। হরিবিলাস বলছিল—"আপনাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না, যান শুনগে। যাক্—তাহলে ওই কথাই রইল। আমি সাহেবকে বলবো—আরও দিনকতক আপনি কাজে লাগতে পারবেন না—কি বলেন?" লালমোহন বল্লে—"দেখুন মশাই, আমার যা রোগ—এত বেশী কথা আপনাকে বলতে হবে না। সাহেবরা এই রোগকে যমের মত ভয় করে। রোজটা না দিক্ কাজটা থাকবে ত, কি বলেন হরিবাবু?" বলেই সে একটু হাস্‌লে। তারপর সে ভাব সামলে নিয়ে বল্লে—"আর যদি আপনাদের কলে কাজটা নাই থাকে তাতেই বা কি,—আমি ত আর আপনাদের মত বাবু নই; কেরাণীও নই,—মজুরদার মানুষ, কাজ গেলে আমাদের কাজের ভাবনা নেই।" হরিবিলাসের চোখ তখন চতুর্দ্দিকে কল্যাণীর সন্ধান করে ফিরছিল। সে এসে দাঁড়াতেই কল্যাণী ছ্যাঁচা বেড়ার আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হরিবিলাস লালমোহনের কথার খোঁচাটা বুঝলে—কিন্তু সেটা প্রকাশ না করেই বল্লে—"এ ছোঁড়াগুলোকে এত নাই দেন কেন? ছোটলোকগুলো আপনার আস্কারা পেয়ে আজকাল

বেল্লায় মাথায় চড়ে বসেছে। কারেও মান্‌তে চায়না। এই ছোঁড়ারা, তোরা এখানে কি করছিস ? আমলো, তোরা দু'টোতে বড় যে কাজে যাস্‌নি ? এ বেলা কামাই করেছিস বুঝি ? রোস্—হপ্তার দিন মজা দেখাব।" বলেই কর্কশ-দৃষ্টিতে তাদের পানে চাইলে।

ধমক খেয়ে ছোঁড়ারা লম্বা দৌড় দিলে। হরিবিলাস বাবুকে তারা যমের মত ভয় করতো। কলের বড় বাবু—তাদের সকলকার এক রকম অন্নদাতা। কারখানার মজুরেরা ম্যানেজার সাহেবের চেয়ে বড় বাবুকেই বিশেষ চেনে, ভয়ও করে। গেরস্থর ঝি চাকর যেমন যার হাত থেকে বাজারের টাকা, মাইনে কড়ি পায় যা কিছু ভয়-ভক্তি শ্রদ্ধা, তা তাকেই করে। জমীদারের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর গোমস্তাই মান্য পায় বেশী। সেই হিসাবে হরিবিলাসের কলের মজুরদের ওপর অখণ্ড প্রতাপ। তাছাড়া, বিধাতার করুণায় বাবুর মূর্ত্তিখানির আর তুলনা নেই। নাক মুখ চোখ গায়ের রং, সবই এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। শরীরখানির ওজন কত তা জানা না থাকলেও রাস্তা দিয়ে যখন যাতায়াত করতেন—রাস্তা কেঁপে উঠতো, আর ছেলেমেয়েরা ভয়ে আঁৎকে উঠতো। কলের অন্য বাবুরা ঠাট্টা করে তার নাম রেখেছিল দুরমুস দত্ত—আর সে কিছু অন্যায় নয়। বাস্তবিকই পথে নতুন খোয়া চাপিয়ে স্বায়ত্তশাসন বিভাগের কর্ত্তরা যদি এই বৃষস্কন্ধ বাবুটিকে বারকতক তার ওপর চল্‌াফের. করাতো তাহলে আর রুল টানার বিশেষ প্রয়োজন হত না কারখানার মজুরদের রক্ত শোষণ করে হরিবিলাসের মেদ মাংস এতই বেড়ে গিয়েছিল।

অনর্থক ছেলেগুলোকে তাড়না করায় লালমোহন বিরক্ত হয়ে

বল্লে—"আহা হা ও বেচারাদের ওপর তম্বি করেন কেন? ছেলেমানুষ ওরা রোজ কি কাজে মন দিতে পারে? ভদ্রঘরের ছেলেরা অমন বয়সে রাত্রে একা বেরুতে পারে না।" বাঞ্ছারাম লালমোহনের কথায় সায় দিয়ে বল্লে—"তা ঠিক কথা এখনই ওদের খেটে খেতে হচ্ছে—এ্যাঁ!"

হরিবিলাস তাতে বল্লে—"না খাটলে খাবে কি, ওরা ছোটলোক ব্যাটারা। ওদের নিয়ে লালমোহনবাবু পাঠশালা খুলেছেন, জানেন মশাই? আক্কেলটা দেখুন একবার! বলি আপনি ত ঠাকুরমশাই, বলুন দিকি অনাচার আর কাকে বলে? শাস্তোরে আপনার কি আছে? বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়ে যত হতভাগা মেলেচ্ছগুলোকে নিয়ে থাকা, তাঁত চালিয়ে ওই রকমই বুদ্ধি হয় বটে—ছিঃ ধর্ম্মে কি এসব সয়?"

লালমোহন বা বাঞ্ছারাম কোন কথা কইল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হরিবিলাস বলেই যেতে লাগলো—"তার পর ঘরের ভিতর আপনাকে এতক্ষণ যা বলছিলুম সে গুলো বেশ করে সমঝে চলবেন। আপনি এই যে এদের নিয়ে পাঠশালা করেন—নানা রকম কুশিক্ষে দ্যান, রোজ বাড়িয়ে দেবার জন্যে এদের হয়ে নিত্য দরখাস্ত, করেন সাহেবরা পর্য্যন্ত সে কথা শুনেছে!"

লালমোহন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হরিবিলাসের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে একটু সন্দিগ্ধ হয়ে বল্লে—"তাই না কি? আপনি বুঝি বলেছেন?"

হরিবিলাস উত্তর দিল—"না ও কথা তাদের কি চোখ কাণ নেই? আর এ যে হবারই কথা বুঝলেন না? লেখাপড়া জানা একটা লোক এসে দুম করে যদি তাঁতীর কাজ করে আর অষ্টপ্রহর মজুরদের কাছে মেশে, তা'হলে সন্দেহ ত হ'বেই। যাই হোক, লালমোহনবাবু, ছোট-

লোকগুলোকে লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে আপনি যে দেশের কতটা ক্ষতি ক'রেছেন আর ওদের মাথা খাচ্ছেন, তা আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না।"

লালমোহন জিজ্ঞাসা ক'রলে—"ওদের তাতে কি ক্ষতি হ'তে পারে তা আমায় বুঝিয়ে দিতে পারেন হরিবাবু? আমার ধারণা কিন্তু অন্য রকম। ওদের একটু আধটু লেখাপড়া শেখালে বরং পরম উপকারই করা হয়। আর প্রত্যেক মানুষেরই তা' করা দরকার। একখানা রুটি গড়ে নিয়ে যারা সাত টুকরো করে খেয়ে' সারা পরিবারটা মিলে আপনাদের কলে মজুরী করে যারা দু'বেলার পেটভরা অন্ন সংস্থান করে উঠতে পারে না,—ঘরের বাইরে তা'দের কি হ'চ্ছে না হ'চ্ছে কত দেশের কত অসভ্য জাত মানুষ হ'য়ে উঠছে তা'র খবরই রাখে না, তা'দের মানুষ করে দেওয়াটা কি ধর্ম্ম নয়? এই মাত্র আপনি যে শাস্ত্রের কথা বল্লেন—ভাল, বলুন দিকি, শাস্ত্রের কোনখানটায় লেখা আছে যে জোর করে এই সব দীনহীন কাঙালের মুখের গ্রাস কেড়ে খাওয়া আর তা'দের অন্ধকারে ফেলে রাখাটাই ভদ্রলোকের বা বর্ণশ্রেষ্ঠ লোকের আসল ও সনাতন ধর্ম্ম?" আর বেশী কথা লালমোহন বলতে পারলে না—তার গলার স্বর কাঁপছিল, সে তখনও বড় দুর্ব্বল। লাঠির ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে ফিরে গিয়ে সে দাওয়ার ওপর বসে পড়লো।

হরিবিলাসের মুখটা হাঁড়ীর মত হয়ে উঠলো। সে বল্লে—"আমি আপনার ভালর জন্যেই বলতে এসেছিলুম, নইলে কোন দরকারই ছিল না। সাহেবদের বিশ্বাস, আপনি মজুরদের ক্ষেপিয়ে কলের মধ্যে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করছেন। বাবুরাও আপনার ব্যাভারে দিন দিন বিরক্ত

হয়ে পড়েছে! তারা বলে আপনার জন্যেই সর্দাররা বাবুদের আর মানতে চায় না।"

হরিবিলাসের কথায় বাধা দিয়ে লালমোহন বল্লে—"সেটা আপনাদের মস্ত ভুল— আমি কাকেও কিছু শিখিয়ে দিইনি। বাবুদের অসম্মান করতে আমি কোন সর্দারকেই বলিনা। তবে তারা যদি আপনাদের ন্যায্য প্রাপ্য বুঝে নিতে চায় তাতে আপনাদেরই বা এত আক্রোশ কেন।"

বাঞ্ছারাম এগিয়ে গিয়ে হরিবিলাসের হাত দু'টো ধরে বল্লে—"যান হরিবাবু, আপনি ঘরে যান, স্বজাতির ওপর কি রাগ করতে আছে? কেন মিছে সন্দেহ করছেন? আমি বেশ বলতে পারি—একটু আধটু লেখাপড়া শেখান, আর পাঁচটা হিতোপদেশ দেওয়া ছাড়া লালমোহনের আর কোনই উদ্দেশ্য নেই।"

হরিবিলাস আর অন্যান্য বাবুরা সত্য সত্যই লালমোহনের ওপর চটে উঠেছিল। আজকাল প্রায় সমস্ত মিস্ত্রী আর সর্দাররা মুখের ওপর চোপরা করে—বাবুদের প্রাপ্য গণ্ডা সহজে দিতে চায় না। অনেক জোর জবরদস্তি করে তবে তাদের কাছ থেকে আদায় করতে হয়। কলের সব ক'জন বাবু একত্রে পরামর্শ করে তবে আজ হরিবিলাসকে পাঠিয়েছিল, লালমোহনকে একটু সাবধান করে দিতে,—নইলে তাকে দেখতে আসা একটা ছলমাত্র। বাবুরা তাকে তাঁত ঘর থেকে সরাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও পারে নি। যে কোন সর্দার বা মিস্ত্রী বা কোন তাঁতী বাবুদের বিষ-নয়নে পড়তো, তাকে তিন দিন টেঁকতে হত না—অতি সহজেই তাড়ানো যেত। কিন্তু লালমোহনকে তাড়ানো

কিছু শক্ত হয়ে পড়েছিল! সকল সাহেবেই এই লোকটাকে চিন্‌তো। এর কথা বার্ত্তা, চাল-চলন সব ভদ্রলোকের মত—দেখতে সুপুরুষ, লেখাপড়া জানে; অথচ সব ঘরের মিস্ত্রীদের সঙ্গে মিশে নানা রকম কাজকর্ম্ম করে বেড়ায়। নিজে রীতিমত তাঁত চালিয়ে পেটের খোরাক উপায় করে। কিছুকাল এই রকম করতে দেখে কোন কোন সাহেব লালমোহনকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল। সে তাতে স্পষ্ট জবাব দিয়েছিল যে, পাঁচ রকম কাজ শিখে নিয়ে ভবিষ্যতে স্বাধীনভাবে কল কারখানা করবার মতলব আছে, তাই হাতে করে সব কাজ সে শিখে বেড়াচ্ছে। এই রকম লোককে মনে মনে সাহেবরা ভালই বাসে, কাজে কাজেই লালমোহনকে তারা উৎসাহই দিত।

বাবুরা তার ওপর চটেছিল অন্য কারণে। কারখানার মধ্যে নানা রকম দুর্নীতি ছিল। সততার ধার কেউ সেখানে ধারতো না। ঘুস নেওয়া আর ঘুস দেওয়া দুইই ছিল সেখানকার সনাতন প্রথা। সাহেবরা সে সব দেখেও দেখতো না। মাঝে পড়ে গরীব দুঃখীরা মারা পড়তো; আর মন্দ কাজটা তারা ভাল বলে জানতো। লালমোহনের চেষ্টায়, শিক্ষায় আর অধ্যবসায়ের গুণে ক্রমশঃ সেই সব জুলুম অত্যাচার বন্ধ হতে লাগলো, দুর্নীতিও কমতে আরম্ভ হল। বাবুরা চটলো তাইতে। সহজে নির্ব্বিবাদে আর তারা ঘুস নিতে পারতো না। অথচ লালমোহনের নামে যা তা বলে সাহেবদের কাছে লাগালে নিজেরাই ধরা পড়ে যাবে। ঘুস নেবার কথা প্রমাণ হলে তারাই শাস্তি পাবে সে জন্যে কিছু উপায় করতে না পেরে তারা মনে মনে চটতে লাগলো। এইবার তারা— লালমোহনের কামায়ের সময় মতলব এঁটেছে যে যদি কিছু না করতে

পারি হলে সবাই মিলে এটার যে লালমোহন মজবদের মাথা খারাপ করে ক্ষেপিয়ে দিচ্ছে—আর সে একজন স্বদেশী পাণ্ডা।

হরিবিলাসের আজকের কথার আভাসেই লালমোহন বুঝতে পারলে যে হাওয়া কোন দিকে বইছে। তার বিরুদ্ধে যে বাবুরা মস্ত চক্রান্ত করে বেড়াচ্ছে, সে বিষয়ে লালমোহনের আর কোনই সন্দেহ রইল না। কিন্তু সে ভেবে দেখলে, উপস্থিত ক্ষেত্রে শত্রুদের রাগিয়ে না দিয়ে মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে রেখে কাজ করে যাওয়াই ভাল। নইলে মজুরদের পক্ষে ক্ষতি হবারই বেশী সম্ভাবনা। এখনও তারা ঠিক গড়ে ওঠেনি। চার হাজার লোকের মধ্যে এখনও পুরোপুরি সদ্ভাব স্থাপিত হয়নি। যেদিন সেটা হবে সেদিন উপরওলা সাহেবেরা পর্য্যন্ত তাদের দাবী অগ্রাহ্য করতে পারবে না। বাবুদের জুলুম আর অত্যাচার তখন সহজেই নিবারণ করা যেতে পারবে। এই সব বিবেচনা করে বসে বসেই লালমোহন বল্লে—"হরিবাবু, অন্যায় সন্দেহ করে মিছামিছি আমার দোষ দেবেন না। আমি কি আপনাদের ছাড়া; না তাড় চালিয়েই আমার চিরদিন চলবে? ওটা আমার কি রকম খেয়াল হয়েছিল, তাই ওদের লেখাপড়া শেখাতে গিয়েছিলুম। আপনিও যেমন—ও কুম্ভকর্ণের ঘুম, ও কি সহজে ভাঙবে?"

একটু নরম হয়ে হরিবিলাস তখন বল্লে—"আমাদেরও ত তাই ইচ্ছা। ওসব ছেড়ে ছুড়ে ভদ্র-সংসর্গে আসুন দিকি, দেখবেন কত মজা তখন পাবেন, পকেটে পয়সা ধরবে না। ওই ছোটলোক ব্যাটারাই তখন সেধে পয়সা দিয়ে যাবে। সেই কথাই ভাল। আপনি সেরেসুরে উঠুন—আমরাই পাঁচজনে আপনাকে টেনে নেব। এখন তবে চল্লুম।"

হরিবিলাস চলে গেলে বাঞ্ছারামের দিকে চেয়ে লালমোহন বল্লে—"ব্যাপারখানা বুঝলেন ত? সুশীলবাবুর সেই তখনকার কথাগুলো মনে আছে আপনার? সব দিক ভেবে এই কাজই এখন আমার সেরা কাজ বলে মাথায় তুলে নিয়েছি। এগিয়েও অনেকটা গেছি। ঘটনাক্রমে আপনিও যথাকালে এসে পড়েছেন। তখন আশা করি, সবাই যেমন আমায় ত্যাগ করেছে, আপনি সে রকম করবেন না।" বলেই লাল-মোহন স্থির দৃষ্টিতে বাঞ্ছারামের মুখের দিকে চেয়ে রইল। বাঞ্ছারাম একটু ভেবে তার পর বল্লেন—"সংসার সমাজ যখন আমাদের চায় না, আত্মীয়েরাও যখন আমাদের অস্পৃশ্য ভেবে দূর করে দিয়েছে তখন ঘর-সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে যে বৃহৎ কাজ মানুষের মুখ চেয়ে পড়ে আছে, আমরা তাতেই ডুবে যাই এস। ধর্ম্মাধর্ম্ম বোঝবার কোন দরকার নেই। দেঁতো হাসি হেসে সমাজে বাস করার চেয়ে সমাজ যাদের পরিত্যাগ করেছে, সেই সকল অস্পৃশ্যদের সঙ্গেই আমাদের বাস করা ভাল।"

মধুর হাস্যোজ্জ্বল মুখে কল্যাণী এসে তাদের মাঝখানে দাঁড়ালো। তাকে দেখেই বাঞ্ছারাম বল্লেন—"কি মা, এত আনন্দ কিসের?" কল্যাণী বল্লে—"যদ্দিন না উনি ভাল করে সেরে ওঠেন, আর সেরে ওঠবার পরেও, আমি মজুরদের ছেলে-মেয়েকে পড়াব।" তার পর স্বামীর দিকে চেয়ে বল্লে—"তুমি আমায় মত দেবে?" লালমোহন মুগ্ধ হয়ে কল্যাণীর মুখের পানে চেয়ে ছিল, কল্যাণীর কথায় বল্লে—"পারবে কল্যাণী? লজ্জা-সরম-ঘোমটা সব বিদায় দিয়ে অবরোধ-প্রথাকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়ে পথে এসে দাঁড়াতে হবে। আত্মীয়তা—"

কল্যাণী বল্লে—"আত্মীয় কে?"

বাঞ্ছারাম বল্লেন—"এরাই আত্মীয়, যাদের তুমি মানুষ করে গড়ে নিতে চাচ্ছ।"

কল্যাণী আকাশের দিকে চোখ রেখে বল্লে—"অনেক দিনই ত এদের আপনার ভেবে নিয়েছি।" তার পর স্বামীকে আবার জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি এখনও মত দাও নি। তোমার মতই তোমার আদেশ,—আর স্বামীর আদেশ পালন করাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম।"

লালমোহন বল্লে—"কল্যাণী নাম তোমার সার্থক হোক্।"

৭

এইখানে আমাদের কিছু পূর্ব্বের কাহিনী বলা দরকার, না হলে গল্পের শেষটা বড় খাপছাড়া বোধ হবে। চন্দনপুরের অমিয় চাটুয্যে খুব একটা নামজাদা জমীদার না হলেও জমীদার বটে। তাঁর সেই জমীদারীটা পৈতৃক নয়—সোপার্জ্জিত। তিনি পূর্ব্বে কোন এক সেরেস্তায় নাজিরী করতেন। সদরালা, মুন্সেফ, আর কালেক্টরীর মধ্যে থাকার জন্যে, আর নিজেও খুব চালাক চটপটে ছিলেন বলে বছর পনের কুড়ির মধ্যে তিনি একটু একটু করে বিষয় সম্পত্তি বাড়াতে লাগলেন। কালেক্টরী বা পত্তনী দু' রকম মহলই তাঁর ছিল। অনেক নাবালক অবীরা বিধবার সম্পত্তি বাকী খাজনার দায়ে নীলামে উঠতো, চাটুয্যে মশাই সুযোগ আর সুবিধা পেলেই ভিতরে বন্দোবস্ত করে সেই সব ছোট-খাট মহলগুলি স্ত্রীর নামে কিনে নিতেন। কাজে কাজেই তাঁর স্ত্রী নবীন-কালীর বয়স যখন ষোল কিংবা সতের, সেই সময়ের মধ্যেই সেই স্ত্রী-লোকটি নিজের অজ্ঞাতসারে সরকারী কাগজে জমীদারণী বলে প্রচারিত হয়েছিলেন। বেশীর ভাগ সম্পত্তি কেনবার তাঁর সুবিধা হয়েছিল—অমিয়বাবু যখন মুর্শিদাবাদে নাজিরী করতেন। ওই অঞ্চলে থাকবার সময়ই তাঁর প্রকৃত পক্ষে জমীদার হবার বাসনা হয়েছিল। এই ভাবে ধীরে ধীরে এখানে সেখানে অল্প অল্প সম্পত্তি খরিদ করতে করতে অবশেষে যখন তাঁর জমীদারীর আয় দশ বারো হাজারে দাঁড়াল, সেই সময়

তিনি এসে চন্দনপুরে বাস করলেন। এই চন্দনপুর তাঁর পৈতৃক বাসস্থান নয়—তবে বছর কয়েক পূর্ব্বে এই গ্রামের মধ্যে তিনি খানিকটা বাস্তুজমী আর একখানা ভাঙা বাড়ী কিনে সেখানাকে বেশ সংস্কার করে রেখে-ছিলেন। নাজিরী ছেড়ে দিয়ে এইবার সেই বাড়ীতে জমীদার হয়ে বসলেন। ক্রমে ক্রমে দেশের সকলের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হ'তে থাকল। কেউ আর তাঁর জন্মস্থানের কথা জানতেও চাইত না, জানবার কারো দরকারও ছিল না। যখন এসে চন্দনপুরে তিনি বাস করেছিলেন তখন পরিবারের মধ্যে ছিল এক চিররুগ্না স্ত্রী নবনীতা আর একটী পাঁচ ছয় বছরের বালক, তার নাম শিশির, আর বামা ঠাকরুণ নামে একটী স্ত্রীলোক-বয়স আন্দাজ পঁচিশ ছাব্বিশ। সেই কিন্তু সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তার কারণ, স্বয়ং জমীদার-গৃহিণী বাতে পঙ্গু—বছরের মধ্যে আট মাস তিনি শয্যাগত থাকতেন, আপনার ছেলেটিকে পর্য্যন্ত দেখা-শোনা করতে পারতেন না। দৈবক্রমে এই স্ত্রীলোকটী অমিয়বাবুর সংসারে এসে জুটেছিল বলেই ছেলেটি বেঘোরে মারা যায়নি। তাকে প্রসব করার পর থেকেই গৃহিণীর অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। শেষে সর্ব্বাঙ্গ বাতে পঙ্গু হয়ে গিয়ে একেবারে দুরারোগ্য হয়ে পড়ে শোনা যায় অমিয়বাবু যখন বহরমপুরে ছিলেন, সেই সময়েই এই বিপত্তি ঘটেছিল। শিশুকে রক্ষা করার বিষয়ে যখন অমিয়বাবু এক-রকম হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, তখন ভগবান বামাঠাকরুণকে জুটিয়ে দিয়েছিলেন। বামার স্বামী বদ্ধ পাগল ছিল,—তাকে যখন বহরমপুরের পাগলা-গারদে আটকে রেখে সেখানে তার চিকিৎসা করাবার ব্যবস্থা হয়, সেই সময় বামাও সঙ্গে এসেছিল। বাইরে একটা বাসা ভাড়া করে কিছুকাল

সে থাকে। অবশেষে স্বামীর উন্মাদ রোগ যখন কিছুতেই আর সারলো না, আজীবন গারদেই থাকতে হবে শুনলে, তখন নিঃসহায় হয়ে বামা কোন একটা ভদ্র পরিবারের মধ্যে থেকে যাতে নিজের ইজ্জৎ রক্ষায় রাখতে পারে তার অনুসন্ধান রাখতে থাকে। সে একেবারে নিঃস্ব, অথচ বয়স আর রূপ দুই তার ছিল। ব্রাহ্মণের মেয়ে, ভাল রাঁধতে জানতো শুনে বিনয় অমিয়বাবু নিজের স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে বামাকে নিযুক্ত করেছিলেন। আরও একটা মস্ত সুবিধা হয়েছিল,—কিছুদিন পূর্ব্বেই তার একটি সন্তান হয়ে মারা যায় স্তনে তখন দুধও অপর্য্যাপ্ত ছিল, সেই দুধ খেয়ে শিশির মানুষ হতে লাগলো। নবীনকালীর স্তনে এক ফোঁটাও দুধ ছিল না। চন্দনপুরে এসে পর্য্যন্ত বামাকে সকলেই 'বামুন মা' আখ্যা দিয়েছিল।

যাই হোক চিররুগ্না হলেও নবীনকালীকে নিয়ে আর জমীদারীর কর্ম্ম দেখে অমিয়বাবুর দিনগুলো এক-রকম কাটছিল মন্দ নয়। কিন্তু সে সুখটুকুও তাঁর কপালে বেশী দিন সইল না। চন্দনপুরে আসবার বছর কতক পরেই নবীনকালী মারা গেল—অমিয়বাবুর বয়স তখনও চল্লিশ পার হয়নি। কুড়ি বাইশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর, যখন সবে মাত্র চারিদিকে গুছিয়ে নি... একটু আরামের নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ পেয়েছেন সেই সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে গেল! দশ বছরের বালক শিশির একেবারেই মাতৃহারা হল—আর বামাকে বেশী করে আঁকড়ে ধরলে। কচিবেলা থেকেই সে বামার কাছে ছিল তবুও এক-আধবার নবীনকালী তাকে কোলে নিত, আদর যত্ন করতো—এখন একেবারেই তা ঘুচে গেল।

ঝাঁশী

পত্নী মারা যাবার পর থেকেই অমিয়বাবু অন্দর মহলের সঙ্গে সম্বন্ধ একেবারেই উঠিয়ে দিলেন। সমস্ত ক্ষণই তিনি বিষয় কর্মের কাজ নিয়ে বাহিরে বাহিরে কাটাতেন—কোন কোন দিন রাত্রেও বার বাড়ীতে শুতেন। বামা শিশিরকে নিয়ে আর সংসারের রান্না-বান্না নিয়ে অন্দর মহলে কর্ত্রীত্ব করতো—খরচের টাকা অমিয়বাবু প্রতি মাসেই তার হাতে দিয়ে দিতেন। বামা যা বলতো তাই দিতেন কখনও হিসাব পর্য্যন্ত চাইত না। ঝি, চাকর, মালী, দারোয়ান সবাই বামাকে মান্য করতো। অমিয়বাবু চন্নপুরে এসে পর্য্যন্ত সাধারণ কাজে সকলকেই উৎসাহ দিতেন,—অনেক ভার-বোঝা ক্রমশঃ তাঁর ঘাড়ে এসে পড়েছিল। গ্রামের ভিতর ত দলাদলি লেগেই ছিল—আর তিনি ছিলেন পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট কাজেই ঝগড়া-ঝাঁটি, ভাগাভাগি, এ সকলের রফা-নিষ্পত্তি তাঁকেই প্রায় করতে হত। তা ছাড়া গ্রামের হরিসভা, ব্রাহ্মণসভা,—হিন্দুধর্ম্ম প্রচারিণী, বহু বিবাহ নিবারণী প্রভৃতি নানা সভা-সমিতির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। কারণ অর্থও আছে আর সময়ও যথেষ্ট আছে, তাই সকল দলের পাণ্ডারাই তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়তো—আর তিনিও সব কাজে দশ টাকা খরচ করতেন। গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠা বাড়াবার তাঁর আগ্রহও কিছু ছিল। প্রায়ই বলতেন 'আমার আর সংসারে সুখ কি ? ওই একটা ত ছেলে, ওর জন্যে কিছু রেখে বরং দশটা সৎ কাজে খরচ করে হাতের সুখ করে যাই। টাকা ত হাতের ময়লা—কি বল হে তোমরা?' যাদের কাছে বলতেন, তারাও উৎসাহ দিত, বলতো, 'সে তো ঠিক কথাই, পয়সা থাকলেই কি সকলে খরচ করে চাটুয্যে মশাই ? যখের ধন আগলেই থাকতে চায় ; আপনি

মহৎ ব্যক্তি, তাই এ কথা বলেন। যা খরচ করেছেন, তা সব তোলা রইল, আবার ফিরে পাবেন। পুণ্যের দেহ,—তেমনি হীরের টুকরো ছেলেও হয়েছে আপনার। আঃ, কি পড়া-শোনায় আঁঠা! এগার বছরের ছেলে, তা দিনরাত বই নিয়েই আছে।' কেউ বা বলতো—'যা' বল্লেন গাঙ্গুলী মশাই, ছেলেটির মুখে রা'টি নেই; বিনয়ী, নম্র, শান্ত, মাষ্টারদের মুখে সুখ্যাতি ধরে না। ও ছেলে, দেখবেন আপনারা পরে জেলার হাকিম হবে।' অমনি ঘোষাল মশাই বল্লেন—'কি যে বলেন আপনারা তার ঠিক নেই। রাজার ছেলে সে, চাকরী করতে যাবেই বা কেন? জমীদারী দেখবে।' এই রকম করে চাটুয্যে মশায়ের দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু কোন কোন সময়ে দেখতে পাওয়া যেত, তিনি বড় বিমর্ষ হয়ে পড়তেন। মনের সুখ যে তাঁর মোটেই ছিল না, তা সব সময়েই বুঝতে পারা যেত। কখন কখন তাঁকে বল্‌তেও শোনা গেছে যে, এত ঐশ্বর্য্য থেকেও তাঁর সংসার করা মোটেই হল না। স্ত্রী তাঁর থেকেও ছিল না। যা-ও বা ছিল, তা-ও গেল।

এমন সময় হঠাৎ একদিন বাড়ীতে কাণাঘুসা হতে লাগলো যে, চাটুয্যে মশাই না কি দ্বিতীয় সংসার করতে মনস্থ করেছেন। তারই কিছু দিন পরে লোকনাথপুরের নকুড় আচায্যির আঠারো বছর বয়সের মেয়ে অনঙ্গমঞ্জরী দিব্যি চেলির কাপড় পরে হাস্‌তে হাস্‌তে অমিয়বাবুর অন্দরে এসে নতুন-বৌ নাম নিয়ে জেঁকে বস্‌লো। বে'টা যে একেবারেই গোপনে সম্পন্ন হয়েছিল তা নয়—তবে প্রথমটা চাপা ছিল বটে। একেবারে সব ঠিক ঠাক্ হয়ে যাবার পর বে'র দিন দুই আগে পাড়ার পাঁচজন মুরুব্বিকে ডেকে অমিয়বাবু নিজের মনোভাব ব্যক্ত করলেন।

সেই দিন কথাটা চারি দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল, আর বুঝতে পারা গেল যে চাটুয্যে-বাড়ীর পুরোহিত রামনিধি তর্কচূড়ামণিই এই বিবাহের ঘটক। তিনিই না কি অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চেষ্টা চরিত্র করে দরিদ্র নকুড় আচার্য্যর অরক্ষণীয়া কন্যাটির পাণিগ্রহণে চাটুয্যেমশাইকে রাজি করিয়েছিলেন। নইলে দ্বিতীয়-সংসার করবার তাঁর মোটেই ইচ্ছা ছিল না।

তা, চাটুয্যেমশায়ের বিবাহ করবার ইচ্ছা থাক চাই না থাক পাড়া-পড়শীর তাতে কিছু আসে যায় না—আর সে কৈফিয়ৎ চা'বার কারো অধিকারও নেই। যে যা ভাবলে তার সে মনেই রয়ে গেল। আড়ালে কেউ কেউ বল্লে বটে যে, বহুবিবাহ-নিষেধের বক্তৃতা দিয়ে, বই পড়ে শুনিয়ে, তাঁর নিজের বে' করা তা'বলে উচিত হয়নি। এইবার বিধবা-বিবাহের দোষ দেখিয়ে কোন দিন না কেউ বিধবাই বে' করে বসে। অমিয়বাবু সে সম্ভারও সম্ভাপ ত ছিলেন।

প্রথমে যেদিন বাড়ীতে কথাটার প্রচার হল—দাসী-চাকরেরা সব মুখ-চাওয়া-চায়ি করতে লাগলো। বামাও শুনলে, কিন্তু তার মোটেই বিশ্বাস হল না। বল্লে, তা নাকি আবার হয়? এই এতবড় ছেলে থাকতে ভীমরতি যারা, তারাই আবার বে' করে। বামা চিরদিনই মুখরা, আর তার ক্রমে ক্রমে এতটা প্রতিপত্তি হয়ে উঠেছিল, যে, সে কাকেও দৃকপাত করতো না—সময়ে সময়ে কর্ত্তাকেও দু' কথা শুনিয়ে দিত। অনেক সময় অমিয়বাবু চুপ করে থাকতেন বা হেসে চলে যেতেন। আজ আবার নিস্তার,—বাড়ীর পুরোনো ঝি, যখন এসে সেই বে'র কথাই বল্লে, তখনও বামা তাকে খুব এক চোট গালাগালি দিলে। তখন ইস্কুল যাবার সময়—শিশির ভাত খাচ্ছিল,—বামাঠাকু-

শুণের চীৎকার শুনে সে জিজ্ঞাসা করলে "কি হয়েছে বামুন-মা? নিস্তারকে তুমি অত বক্‌ছো কেন?" বামা তার দিকে ফিরে বল্লে—"ও কিছু নয় খোকনমণি, তুমি খেয়ে নাও, নইলে ইস্কুলের বেলা হ'য়ে যাবে। এই নাও, দুধে আর চারটি ভাত তোল, আজ এত কম খাচ্ছ কেন? ওমা, সারা বেলাটা যে পেট জলে যাবে।"—তার পর শিশিরকে খাইয়ে, মুখ-হাত ধুইয়ে, মুখে গুঁচিয়ে, কাপড়-চোপড় বই শ্লেট সব গুছিয়ে, চাকরের হাতে তাকে জিম্মা করে দিয়ে মায়ের দরজায় গিয়ে সে দাঁড়ালো। খোকন ইস্কুলে চলে গেলে পর, বামা ভিতর মহলে ফিরে রান্নাঘরের একটু-আধটু কাজ যা সারতে বাকী ছিল সেই সব গুছুতে লাগলো। অস্থির হাতে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে গিয়ে আরও তার যেন দেরী হতে লাগলো।—হাঁড়িটা তুলতে গিয়ে কড়াটা উল্‌টে, দুধের বাটীতে ঝোলের ঝোল্ ঢেলে ফেললে তার পর আবার সেই বাটীটা ধুয়ে নিয়ে তুলে রাখলে। এই রকম গোলমাল হতে দেখে আপনা-আপনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সে তখনকার মত যেখানকার যা সব ফেলে রেখে রান্নাঘরের শিকলটা তুলে দিয়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠে পা টিপে টিপে একেবারে কর্ত্তার ঘরে গিয়ে হাজির হল।

অমিয়বাবু তখন এক-মনে কিসের একটা ফর্দ্দ মেলাচ্ছিলেন: ঘাড়টা ফিরিয়ে বামাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি খবর বামা? শিশিরের ইস্কুলের জলখাবারের পয়সা চাই বুঝি?" এই বলে তিনি ঘড়ীটার পানে তাকালেন। বামা উত্তর দিলে—"না, সে আমি খোকনকে দিইছি, এখনও পাঁচ টাকা আমার কাছে আছে। আমি আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।"

—"বল ?"

—"নিস্তারের কাছে যা শুনলুম তা কি সত্যি ?"

—"কি শুনেছ—কি সত্যি ?"

—"এই আপনি না কি আবার বে করবেন ?"

অমিয়বাবু একটু চুপ করে থেকে আর একবার হাতের ফর্দ্দটার এ-পিঠ ওপিঠ ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তার পর বল্লেন—"হ্যাঁ বামা, কথাটা সত্যি।"

—"সত্যি !—ঠিক বলেছেন ত ? মাথার কোন গোলমাল হয়নি ?"

—"ছিঃ—বামা !"

—"ছিঃ ! ও আবার কি ? মাথা খারাপই হয়েছে—না ?"

—"যাও, নিজের কাজ করগে। কেন মিছে মন খারাপ করছো ? ও সব ব্যাপারে তোমার মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই।" এই বলে অমিয়-বাবু চোখের চশমাটা খুলে নিয়ে কোঁচার খুঁটে মুছতে লাগলেন।

বামা চট্ করে মুখের উপর উত্তর দিলে—"আজ্ঞে, আপনার কথাই ঠিক। আমরা দাসী বাঁদী বৈ ত নই, আমাদের বড় লোকের কথায় কথা কওয়া সাজে না।"

এই কথায় অমিয়বাবু একবার দাঁড়িয়ে উঠে বামার মুখের দিকে চাইলেন, কিন্তু চোখোচোখি হবা মাত্রেই তাঁর নিজের চোখ মাটির দিকে নেমে গেল,—তিনি আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। তার পর জানালার বাইরে দৃষ্টিটা রেখে আস্তে আস্তে বল্লেন—"তোমাকে আমি ত দাসী বাঁদী বলিনি,—এ কথা তুমি বেশ ভালই জান।"

অমিয়বাবুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে বামা বল্লে—"সে আপনার অনুগ্রহ। দাসী, বাঁদী, না হয় রাঁধুনী ও একই কথা। তা যাক্—"

অমিয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কি বলতে চাও, খুলেই বল না ?"

বামা তখন একবার উঁকি মেরে ঘরের বাইরেটা চকিতের ন্যায় দেখে নিয়েই অমিয়বাবুর দিকে আরও একটু অগ্রসর হয়ে অপেক্ষাকৃত চাপা গলায় বল্লে—"দেখুন, আপনি বড় লোক, কাজেই আপনায় সবই শোভা পাবে, কিন্তু—" এই পর্য্যন্ত বলেই বামা থেমে গেল; মাথাটা নীচু করে অনেকক্ষণ ধরে সে ভাবলে। কি যে ভাবলে তা সে নিজেই জানে। মুখটা তার যেন ক্রমশঃ লাল হয়ে উঠলো,—আবার একবার চতুর্দ্দিকে দেখে নিয়েই খুব তাড়াতাড়ি বল্লে—"কিন্তু খোকনকে আমি যে কতটা ভালবাসি সে ত আপনি জানেন—আর সে ভালবাসাটা কি আমার অন্যায় ?" বলেই বামা তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে অমিয়বাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। অমিয়বাবুর গলার স্বরটা ঈষৎ কেঁপে উঠলো—কিন্তু সে এত অল্প ক্ষণের জন্যে যে সহজে তা বুঝতে পারা অসম্ভব। কতকটা জড়িত স্বরে তিনি উত্তর দিলেন—"বেশ ত, সে ভালবাসা আমি ত কেড়ে নিতে যাচ্ছি না। তুমি যা আছ তাই থাকবে, তোমার খোকনও যেমন আছে তেমনি থাকবে, সে বিষয়ে কোনই ত্রুটি হবে না বামা, বুঝলে ?"

—"আজ্ঞে বুঝলুম বৈ কি" বলে বামা আর একবার পিছন ফিরে দোরের দিকে চেয়ে দেখলে। অমিয়বাবু আলনা থেকে একটা সার্ট পেড়ে

নিয়ে গায়ে দিতে দিতে বলে গেলেন—"যাও, এখন যাও. আমি ভেবে দেখবো, অন্য সময় আরও কথা হবে"—জামাটা পরা হয়ে গেলে আর্শির কাছে দাঁড়িয়ে চুল ফেরাতে ফেরাতেই আবার বলতে লাগলেন—"খোকন জন্মাবার পর থেকেই তার মার সূতিকার ব্যারাম হয়েছিল। তার পর দেখতে দেখতে তার সর্ব্বাঙ্গ বাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। সে তো তুমি ভালই জান? তোমার মাই পেয়েই ও মানুষ হয়েছে, তোমাকে মার মতই ভক্তি শ্রদ্ধা করে, পুরে পুরি তোমারি ন্যাওটো।" চুল ফেরান হয়ে গেলে তিনি বামার দিকে ফিরে বল্লেন—"কে সে কথা না জানে বামা? নবীনকালী আরও ক'টা বছর বেঁচে ছিল বটে, কিন্তু তুমি ত জান, কি রকম সে বেঁচে থাকা?" বলেই অমিয়বাবু একটু হাসলেন। অধীরা হয়ে বামা উত্তর দিলে—"দোহাই আপনার, আমাকে আর অত করে মনে করে দিতে হবে না। কি যে হয়েছিল না হয়েছিল সে সব আমিও জানি আপনিও জানেন। সেই ক'টা বছর কি ভাবে যে কেটেছিল আজ তার সাক্ষী খুঁজে পাওয়া না গেলেও, ক্ষতি বিশেষ কিছু হবে না। সেই জন্যেই আজ জানতে এসেছি। তা এই মতটা সেই সময় হলেই ত বেশ হ'ত—মাকে হারাবার সঙ্গে সঙ্গেই খোকন একজন নতুন মা পেত, আমিও ন্যাওটো হতে দিতুম না।" বলেই বামা তীব্র দৃষ্টিতে অমিয়বাবুর দিকে চাইলে।

এইবার অমিয়বাবু যেন কিছু বিরক্ত হলেন। তাড়াতাড়ি বল্লেন—"তুমি বড় বেশী কথা কইছ। মানুষের মেজাজ সকল সময় এক রকম থাকে না বামা। আমি বলছি, প্রতিজ্ঞা করছি—তোমার কোন চিন্তার কারণ নেই। তোমার মর্য্যাদা চিরদিন যেমন থেকে এসেছে তাই থাকবে।"

—"মর্য্যাদা !—"

—"হ্যাঁ। খোকন তোমা ছাড়া দুনিয়ার আর কিছু জানে না। মোটে এগার বছর তার বয়স, সম্পূর্ণ ভাবেই তুমি এক-রকম তার মায় স্থান অধিকার করে আছ—এ অবস্থায় আর কোনই ব্যবস্থা হতে পারে না বামা—"

—"পারে না বলেই আমার এতদিন ধারণা ছিল। নবীনকালীর মৃত্যুর পরও সে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিছলো। কিন্তু আজ আপনি আমার সকল ধারণাই একেবারে উল্টে দিলেন। যাক—এখন দেখি, আরও কতদূর আপনি যেতে পারেন।" এই বলেই বামা ঠাকরুণ এদিক ওদিক আর একবার দেখে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ত্বরিৎ পদে সিঁড়ী দিয়ে নীচে নেমে গেল। নীচে নামতেই বিরাজী গলাটা উঁচু করে বলতে লাগলো—"কোথা গেছলে গা বামুন-মা ? বাস রে বাস। তিন ঘন্টা মাছের চুবড়ী কোলে করে বসে আছি, কে যে একটু নুন-হলুদ দেয় তার ঠিকেনা নেই,—সখের দাসী নিস্তারের পর্য্যন্ত দেখাটি পাবার যো নেই। বেলা তিন পো'র হল, এর পর কখন কি করবো বল দিকি ?" বিরাজীর গলার ওপর আর এক পর্দ্দা চড়িয়ে বামা ঠাকরুণ বল্লে—"বোকিস্‌নি মালা—থাম্। তিন ঘন্টা বসে আছে অমনি বল্লেই হল। আমি কতক্ষণ গেছি লা ?" বলতে বলতে বামা রান্নাঘরে ঢুকে পড়লো। লোকের চোখের সমুখ থেকে সে যেন তখন পালাতে পারলেই বাঁচে।

৮

তা' যাই হোক, নকুড় আচায্যিকে তার অরক্ষণীয়া কন্যার দায় থেকে মুক্ত করবার জন্যই হোক, অথবা নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যই হোক, নতুন বৌকে সংসারে এনে পর্য্যন্ত অমিয়বাবুর কিন্তু গোল বাধ্‌লো বামা ঠাকরুণকে নিয়ে। সে প্রথম দিন থেকেই অনঙ্গমঞ্জরীকে বাড়ীর গিন্নি বলে একেবারেই মেনে নিতে পার্লে না। বে'র এক বছর পরে অনঙ্গ যখন পাকাপাকি ঘর করতে এল—সে এসেই দেখলে সেখানে তার বিরুদ্ধে একটা প্রবল দল খাড়া হয়েছে। এত বড় বাড়ীটার মধ্যে সেই যেন একঘরে হয়ে আছে। সবাই যেন তাকে কোণ-ঠেসা করতে চায়। বাড়ীর দাসী রাঁধুনী সবাই কেমন এক রকম ছম্‌ছমে দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়—আড়ালে ফিস্ ফিস্ করে কথা কয়, এক ডাকে কাছে আসে না। জিজ্ঞাসা করলে ন্যাকা সেজে কেউ বলে—'শুনতে পাইনি বৌমা',—কেউ বলে, 'অমনে ছিনু বৌদি,—এই রকম নানা অছিলা করে সামনে থেকে সরে পড়বার চেষ্টা করে। কিন্তু রান্নাঘরের ভিতর অষ্টপ্রহর তাদের জটলা হয়,—নয় তো বামা ঠাকরুণের শোবার ঘরে গিয়ে সবাই মিলে গল্প করে, আর পান-দোক্তার শ্রাদ্ধ করে। প্রথম থেকেই অনঙ্গ শশিরকে আপনার দিকে টেনে নেবার বিধিমত চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু তার নাগাল পাওয়া দুষ্কর। সে বামাকে ছাড়া

আর কাকেও আমোল দেয় না। তার কাছে খায়, শোয়। সে যা বলবে—শিশিরের কাছে তাই বেদবাক্য। বছরাবধি চেষ্টা করেও অনঙ্গ পুরো দশ মিনিটের জন্যেও শিশিরকে কাছে রাখতে পারেনি। কথাই সে কইতো না।

একদিন সে ইস্কুল থেকে এসে যেমন উপরে উঠেছে, অমনি অনঙ্গ ঘর থেকে বেরিয়ে তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে চুমো খেয়ে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে। বালক প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে গিয়ে টানা টানি করে পালাবার চেষ্টা করলে বটে, কিন্তু তার পর বেশ শান্ত-শিষ্ট হয়ে অনঙ্গর কোলে বসে তা। মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে—"বল দিকি খোকন-মণি—আমি তোমার কে?" শিশির বল্লে—"তুমি এ বাড়ীর নতুন-বৌ, আমার কেউ নয়।" কথাটা—অনঙ্গর বুকে বেশ একটা ধাক্কা মারলে,—কিন্তু সেটা সে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে আর একটা চুমো তার গালে দিয়ে বল্লে—"ছিঃ! ও কথা তোমার বলতে নেই। আমি যে তোমার মা হই।"

শিশির বল্লে—"আমার মা ত মরে গেছে—বামুন-মা বলেছে। ঐ যে আমার মায়ের ছবি রয়েছে।" বলেই সে ছুটে গিয়ে ছবির নীচে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে তার মার ছবিখানা দেখিয়ে দিলে। অনঙ্গ তাকে আবার কোলে নিয়ে বল্লে—"ওঃ। এই কথা তোমায় বলেছে বুঝি? না, সে ঠিক জানে না. তুমি তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করো দিকি। আমিও তোমার মা হই।"

শিশির বল্লে—"আচ্ছা করবো।"

বালক বল্লে—"হ্যাঁ—রোজ আসবো।" এই বলেই সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে উঠানে ডুপ্ ডুপ্ করে বলটা নিয়ে খেলা করতে লাগলো, আর অনঙ্গ উপরের খড়খড়ির পাশে দাঁড়িয়ে তার খেলা দেখতে লাগলো। শিশিরকে জলখাবার খাইয়ে বামা পুকুরে গা ধুতে গিছলো। এখন গা ধুয়ে এসে ভিজা কাপড়ে উঠানে পা দিয়েই জিজ্ঞাসা করলে—

"ওটা কি খোকা?"

—"দেখতে পাচ্ছ না? এটা ফুটবল, আমি খেলবো।"

—"বেশ বাবা বেশ, খেলা কর।—কে এনেছে ধন? তোমার বাবা কিনে দিয়েছে বুঝি?"

—"দূর—তা কেন, নতুন-মা আমার জন্যে কিনে এনেছে।"

"কে—কে এনেছে?"

"আঃ একশো বার করে বলতে হবে। আমি বলে এখন খেলছি! নতুন মা দিয়েছে বল্লুম ত।" বলেই শিশির বলটাকে গড়িয়ে দিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে লাগলো। বামাঠাকরুণের মুখ থেকে কেবল একবার বেরুলো—"নতুন মা!"—এই বলেই সে একবার ওপরের দিকে চাইলে, চাইতেই অনঙ্গর সঙ্গে তার চোখোচোখি হয়ে গেল। অনঙ্গর মুখে একটু বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠলো, কিন্তু বামার মুখখানাতে কে যেন কালি মাখিয়ে দিলে। সে আর দাঁড়াল না, হন্ হন্ করে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে থেকেই বামাঠাকরুণের বুকে আর পেটে এমন ব্যথা ধরলো যে উনুনে হাঁড়ি চড়লো না। নিস্তার সদরে ছুটে

এসে অমিয়বাবুকে জানালে -"বামুন-মার বড় অসুখ করেছে, আজ খাবার দাবার বড় অবস্থা, বাবু একবার ভিতরে এলে ভাল হয়।" অমিয়বাবু তাঁর গোমস্তা গোপেশ্বরকে শীগ্‌গির করে হারাণ ডাক্তারকে খবর দিতে বলে, বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন। গিয়েই দেখেন, দর-দালানের এক ধারে—গায়ের মাথার কাপড় সব এলো-মেলো হ'য়ে পড়েছে—আর বামাঠাকরুণ ঠিক কাটা-ছাগলের মত ছট্‌ফট্‌ করছে। বাড়ীর সব ক'জন দাসী একত্র হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে জটলা করছে, অথচ কেউ কোনও ব্যবস্থাই করেনি। অমিয়বাবু ঢুকেই বল্লেন— "ডাক্তারকে খবর দিয়েছি, সে এখনই আসবে। তোরা সব কি করছিস? যা নিয়ে খানিকটা জল গরম করে আন্—একটা বোতলে ভরে পেটে বুকে সেঁক দে'।" কাতরাতে কাতরাতে বামা বল্লে— "ওগো, এ আমার সে অম্বলের ব্যথা নয়,—সেঁক্ দিলে এর কিছু হবে না।" অমিয়বাবু বল্লেন—"আচ্ছা—আচ্ছা, ডাক্তার এলেই ব্যথা আরাম হয়ে যাবে ভয় কি?" তার পর আর একজন দাসীর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন—"নতুন-বৌ কোথা রে?"

দাসী উত্তর দিলে—"নতুন একেবারে খাই খাই করছিল দেখে তিনি ভাত চাড়িয়ে দিয়েছেন!"

আবার বামা কোথাতে কোথাতে বল্লে—"তোরা তাকে রাঁধতে দিলি কেন বাপু?—ছেলেমানুষ, এখনই হাত পুড়িয়ে ফেলবে। তোদের ঘটে কি কিছু বুদ্ধি নেই?"

দাসী বল্লে—"আমরা কি করবো—তিনি যে আভাষ্টর শুনে আপনি এসে রান্না ঘরে ঢুকলো গো!"

অমিয়বাবু বল্লেন—"ও সব কথা এখন তোমায় ভাবতে হবে না বামা, তুমি চুপ করে শুয়ে থাক।"

হারাণ ডাক্তার এসে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করেও অসুখ কি ধরতে পারলে না। যাতনা যে ঠিক কোনখানে তা বামা নিজেই ঠিক করে বলতে পার্লে না; একবার এখানে একবার ওখানে এই রকম পাঁচ যায়গায় দেখাতে লাগলো। কিন্তু এত যাতনা যে এক মুহূর্ত্ত সে স্থির হতে পারছিল না। খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে ডাক্তার অমিয়বাবুকে বল্লে —"দেখুন, এতটা যন্ত্রণা ত দেখা যায় না—উপস্থিত আমি একটা মর্ফিয়া ইনজেক্ট করে দি, ঘুমিয়ে পড়ুক,—কি বলেন?"

অমিয়বাবুও অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, তাইতেই মত দিলেন। বামাঠাকরুণ তখন চেঁচিয়ে বল্লে—"ডাক্তারবাবু, আমায় তোমার ফুঁড়ে ওষুধ দিতে হবে না। তুমি লিখে ওষুধ দিতে পার ত দাও।"

ডাক্তার বল্লে—"ভয় কি আপনার, এখনি ব্যথা সেরে যাবে, কিছু লাগবে না।" এই বলে হারাণ ডাক্তার পকেট থেকে যন্ত্রপাতি বার করতে করতে একজন দাসীকে গরম জল খানিকটা আনতে বল্লে। বামা একেবারে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে পড়ে বলতে লাগলো—"ও আমি কক্ষনো ফুঁড়তে দেব না—আমি মরে গেলেও দেব না। খোকনমণির মাকে ফুঁড়ে ফুঁড়েই মেরে ফেলেছে তারা। শিশিতে ওষুধ দেবে ত দাও—নইলে আমার কিছু চাই না।"

তার আলু থালু বেশ আর এই রকম পাগলের মত চেঁচানীতে অমিয়বাবু ভয় পেয়ে গেলেন—বল্লেন,—"কাজ নেই ডাক্তার, প্রেস্-ক্রিপ্‌সন লিখে দাও, আমি এখনই ওষুধ আনিয়ে নিচ্ছি।" হারাণ

ডাক্তারও ভাবলে, কাজ নেই বাবু, ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইন্‌জেক্ট করে, শেষকালে যদি কিছু হয় বদনামের ভাগী হতে হবে। বামাঠাকরুণকে সে বিশেষ রূপেই জানতো, মনে মনে কিছু ভয়ও করতো;—তার কারণ, এই বাড়ীটাতে এই স্ত্রীলোকটির কি রকম আধিপত্য তা গ্রামের সবারই জানা ছিল, আর তাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে বাড়ীটাতে যে অন্য ডাক্তার কেউ সহজে মাথা গলাতে পারবে না, এ' বিশ্বাসটাও হারাণ ডাক্তারের ছিল। আরও একটা কথা, এক একজন মেয়েমানুষের কেমন এক রকম দৃষ্টি থাকে—সে দৃষ্টি পুরুষের উপর পড়লে যেমনই শক্ত লোক সে হোক না কেন, মাথাটা তার গুলিয়ে যেতেই হবে। আর তাকে খুসী করতে ইচ্ছা হবে। বামার সেই রকমের দৃষ্টি ছিল। সে দৃষ্টি বা চাহনী পুরুষকে আজ্ঞাকারী করে ফেলতো। আর সেদিকে বেশীক্ষণ চাইতে পারা যেত না।

প্রেসক্রিপ্‌সন লিখেই ওষুধ এলো। নিস্তারের উপরই বামার অসুখের তদ্বিরের ভার পড়লো। নিস্তার বাড়ীর সকলের চেয়ে পুরোনো ঝি···বামার সঙ্গেই তার বেশী মেলামেশা। কাজে কাজেই সে বামার ঘরে আবদ্ধ রইল। রান্না-বাড়া খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ কিছুই অব্যবস্থা হল না—কারণ অনঙ্গ ব্যাপার বুঝতে পেরে নিজে গিয়ে হাঁড়ী ধরলে। তাকে রান্না ঘরে ঢুকতে দেখে বাধ্য হয়ে দু'জন দাসীকে তার সাহায্য করতে হল। অনঙ্গ সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই এমন কর্ত্রীত্ব দেখিয়ে হুকুম চালাতে সুরু করে দিলে যে, ওই দু'জন দাসী, যারা তার কাছে ঘেঁসতেই চাইত না, বা সুবিধা পেলেই অগ্রাহ্য করতো, অথচ আর কথাটি কইতে সাহস করলে না, বরং এমন ভাব দেখাতে লাগলো

যেন তারা চিরদিনই অনঙ্গর অনুগত। ভাঁড়ারের কোথায় কি থাকে না থাকে, তা না জানলেও, এই দু'জন দাসীর সাহায্যে অনঙ্গ তখনই সব ঠিক করে নিলে। বাড়ীর পরিবারেরা ছাড়া একমাত্র গোপেশ্বর দু'বেলা এসে অন্দর-মহলে বসে খেয়ে যেত। বামাঠাকরুণ তাকে পরিবেষণ করে খাওয়াতো। অনঙ্গ আজ থেকে হুকুম দিলে যে সে প্রত্যহই দু'বেলা খেয়ে যাবে, তার জন্য ভাত বাড়া তৈরী থাকবে—আর একজন দাসী তদ্বির করবে।

৯

পুরোপুরি একটি মাস ধরে বামা বিছানায় পড়ে রইল, কোন দিন বা ব্যথা একটু বাড়ে আবার কোন দিন বা একটু কমে, এই করে দিন কাটতে লাগলো। সর্ব্বক্ষণ নিস্তার তার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছে। হারাণ ডাক্তার রোজ দেখে যায়—প্রেসক্রিপ্‌শন লেখে—আর ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ আসে। নিস্তার ঘরে গিয়ে হাসতে হাসতে বলে—"ওষুধ ঢালি?" শুয়ে শুয়ে বামা বলে—"দে আমি ঢেলে খাচ্ছি।" এই বলে সে নিজে এক দাগ করে ওষুধ গেলাসে ঢালে আর জানালা গলিয়ে ফেলে দেয়। রোজরোজই নিস্তার বলে, "এত ঢং ও জান তুমি? আর কেন? এইবার সেরে ওঠ না? এতটা কি তোমার সাজে? বেশ করে ভেবে দেখ দিকি?" বামা চোখ পাকিয়ে বলে—"বকিস্‌নি বাবু থাম্‌, আর দগ্ধাসনি," তার পর একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করে—"হ্যাঁ লা, বৌ-গিন্নির খবর কি—স্বামীকে কেমন যত্ন-সোহাগ কর'ছ?"

নিস্তার জবাব দেয়—"সে খুব, মুখে মুখে সব জোগান্‌ দিচ্ছে। তা দেখ বাবু···রোজই ত হাঁড়ী ঠেলছে—একটুও কাতরানি শোনা ত যায় না। বাবু সেদিন খেতে বসে বলছে শুনলাম—"আর একজন রাঁধবার লোক ঠিক করি, কি বল?" নতুন-বউ বল্লে—"না না, দরকার নেই, আমার এসব অভ্যাস আছে।"

"শুনে উনি কি বল্লেন?" "বল্লে, দু'একদিন না হয় হল, রোজ পারবে কেন? বামা আমাদের সব দিক্ দেখতো—কখন ব্যারাম স্যারাম বড় একটা তার হয়নি, ভূতের মত খেটেই আস্‌ছে। এবার যখন পড়েছে তখন দশদিন ভালর কম তদ্বির তিকিচ্ছে করাই, সে সেরে উঠুক। সে রাঁধবার জন্তেই শুধু এ বাড়ীতে আসেনি তা জেনে রেখো, সে আমাদের আপনার লোকের মতই।" বামা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে—"নিস্তার! একবার ওঁকে চুপি চুপি ডেকে আনতে পারিস্?" "—কখন আনবো বল দিকি? রাত্তির বেলা খেয়ে নিয়ে বাবু রোজকার মত এক-বার বাইরে যায়, তারপর সারাস্থরি হলে নতুন-বৌ উপরে উঠে গেলে তিনি বাড়ীর ভিতর আসেন। ওপরে শুতে যাবার আগে ক'দিন ত বাবু তোমার খবর নিতে এসেছিল, জান?"

—"তা জানি, কিন্তু সে কতটুকু নিস্তার?"

—"তুমিও ত বেশী কথা কওনি। তোমার যে তখন খুব অসুখ। পাশ ফিরেই রইলে। আর কোঁথাতে লাগলে।"

—"কি করবো বল? কথা কইতে রুচি হয়, তুইই বল না? তারপর তিনি জানেন আমার খুব অসুখ। এইবার একদিন আনতে পারিস্?"

—"দেখবো।—কিন্তু—ভাল কথা, ওদিকে পাহারা বসেছে বোধ হয়।"

—"কি রকম?—আমার ওপর?" বামা চম্‌কে উঠে নিস্তারের দিকে কট্‌মট্ করে চাইলে।

—"বিরাজী আর গোবিন্দর মা ওই দালানে রাত্রে চুপ করে বসে থাকে। উনি গড়গড়া হাতে নে ওপরে চলে গেলে তারা শোয়। নইলে হয় সুপারী কাটছে নয়তো গল্প করছে।" বামা অনেকক্ষণ পাশ ফিরে চুপ করে পড়ে রইল। তার পর আস্তে আস্তে যেন আপনা আপনি বলতে লাগলো—"বিরাজী—গোবিন্দর মা! কালই নেমো-খারাম।" আবার খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে—"খোকন কার কাছে শোয় নিস্তার?"

নিস্তার বল্লে—"নতুন গিন্নির ঘরেই শোয়।"

সেই সময় বাইরে একটা কলরব উঠ্‌লো। যেন চার পাঁচজন লোক কথা কইতে কইতে দরদালানের দিকে আস্‌ছে। বামা নিস্তারকে বল্লে —"দেখে আয়ত না, কারা আস্‌ছে?" নিস্তার দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে চলে গেল। বামা নিশ্বাস বন্ধ করে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে বিছানায় পড়ে রইল। নিস্তারকে আর ফিরে আস্‌তে হল না। তার আগেই অনঙ্গ দরজা খুলে বামার ঘরে ঢুকে পড়লো। তার সঙ্গে সঙ্গেই নকুড় আচায্যি আর তার স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী এসে দাঁড়ালো। অনঙ্গ বল্লে— "এঁর কথাই বলেছিলুম মা, ইনি অনেক দিন এই বাড়ীতে আছেন— শিশিরকে মানুষ করেছেন। আর ঠিক যেন আমাকে নিজের পেটের মেয়ের মতন দেখেন—কত যত্ন যে করেন, তা তোমাদের কি বলবো। আজ একমাস অসুখ করেছে, তা আমাকে যেন চোখে অন্ধকার দেখতে হচ্ছে।"

এরা ঘরে ঢুকতেই বামা উঠে বস্‌লো। অনঙ্গ চুপ করতেই সিদ্ধেশ্বরী বল্লে—"আহা ওঠ কেন বাছা, শোও—শোও, অসুখ শরীর।

তোমার অসুখের কথা শুনে পর্য্যন্ত ভেবে মরি, বলি, অনি আমার কচি মেয়ে, সংসারের কিছুই জানেনা, তবু মার মত একজন তুমি আছ, তাই একটু নিচ্চিন্দি হয়ে এখানে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

নকুড় আচায্যি একদৃষ্টে বামার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কোন কথা এতক্ষণ কয়নি, এইবার বল্লে—"তা বটে, একজন দেখ্‌বার শোন্‌বার লোক চাই বই কি" বলেই স্ত্রীকে বল্লে—"তা এখন চল, বাবাজীর সঙ্গে একরার দেখা করি? তোর ছেলে কোথায় রে অনি?"

—"সে স্কুলে গেছে বাবা।"

সিদ্ধেশ্বরী আর একবার বামাকে শুতে বলে—নিশ্চিন্ত থাকতে বলে, অনঙ্গর সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তারা চলে যাবার পরও বামা অনেকক্ষণ চুপটি করে জানালার দিকে চেয়ে বসে রইল। তার মাথাটা তখন সত্যসত্যই টল্‌মল্ করছিল। অনঙ্গর কথাগুলো সে সহজে পরিপাক করতে পারছিল না। সিদ্ধেশ্বরীকে সে এই প্রথম দেখলে, কিন্তু দেখেই বুঝতে পারলে—সে যদি এখানে থাকে, তাহলে এ বাড়ীতে আর তার বাস করা অসম্ভব। অনঙ্গমঞ্জরীকে সে যতটা কাঁচা মেয়ে মনে করেছিল—আজকের কথায় তার সে বিশ্বাস দূর হয়ে গেল। অনঙ্গর মুখের কথাগুলি যে চিনির কোটিং দেওয়া কুইনাইনের বড়ী, তা আর বামার জানতে বাকী রইল না। সে খানিকটা ভেবে নিলে, তার পর কি ভেবে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে দরজাটা খুলে, কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলে। দেখলে দরদালানে কেউ কোথাও নাই। তখন একপা, একপা, করে এগুতে লাগলো। খানিকটা যাবার পর নিস্তারের সঙ্গে তার দেখা

হ'ল—সে হাঁপাতে হাঁপাতে তা'র কাছেই আসছিল। বামাকে উঠে আস্‌তে দেখে সে বল্লে—"এ কি, যাচ্ছ কোথায় ?"

বামা জবাব দিলে—"আর শুয়ে থাকা চল্লো না; এরা সব কোন্ দিকে গেল বল্‌তে পারিস্ ?"

নিস্তার বল্লে—"মায়ে ঝিয়ে উপরে উঠেছে—আর মিন্সে সদরে গেছে। কিন্তু তুমি বড় বোকা, এখনই উঠতে হয় ?"

—"না উঠলে ওই চাল্‌দামুখী আর নড়বে মনে করেছিস ? মেয়ের কষ্ট শুনেই, এসেছে।"

—"তাই যদি এসে থাকে, তাহলে মনেও ভেবনা তুমি সেরে উঠেছ বল্লেই চলে যাবে। তার চেয়ে এখনও কেউ দেখেনি, তুমি চুপি চুপি শুয়ে পড়গে। আমি বরং বাবুর সময় বুঝে তাঁকে তোমার কাছে ডেকে দেব।"

বামঠাকরুণের মনের মধ্যে তখন ঝড় বইছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল সে এখনই যেন কিছু একটা করে ফেলে ;—অথচ কি যে করবে, তাই সে ঠিক করতে পারছিল না। অন্তরের ভিতর গুমরে গুমরে উঠছিল। কিন্তু তারই মধ্যে একটা কথা সে ভেবে নিলে, যে, এই নিস্তার ছাড়া তার এখন আপনার বলতে এখানে আর কেউ নাই। কাজে কাজেই নিস্তারের মতেই তার চলা উচিত। সে আর অগ্রসর না হয়ে ফিরে আপনার ঘরে গিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়লো। তাকে শুতে দেখে নিস্তার বল্লে—"হ্যাঁ, আমি যা যা বলি শোন দিকি, সব দিকে ভাল হবে। হট্ করে একটা কিছু করে ফেল্লে শেষে পস্তাতে হবে। আজ আমি বাড়ীতে রটিয়ে দিই যে, তোমার ব্যথা একদম্ সেরে গেছে—উঠতে চাইছিলে, আমি জোর করে আটকে রেখেছি—বলেছি, দুদিন ভাত খাও

তবে ঘর থেকে বেরুবে। আমি একটু জল গরম করে আনিগে, গাটা মাথাটা বেশ করে ধুয়ে ফেল। সুজির রুটি আর হালুয়া খেয়ে তোমার গায়ে চিম্‌সে গন্ধ হয়েছে। দেখলে কে অমাত্যি হবে যে, শক্ত অসুখ হয় নি।" নিস্তার এই সব উপদেশ দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল, বামা নির্ব্বাক হয়ে বিছানায় পড়ে রইল। অর্দ্ধেক কথা তার কানেই গেল না। অনেক দিনের অনেক পুঞ্জীভূত আকাঙ্ক্ষা আর ক্ষুব্ধ অভিমানরাশি তাকে অন্তরে অন্তরে পুড়িয়ে থাক্ করে দিচ্ছিল। এতদিন সে যেন সম্পূর্ণরূপে আপনাকে বিস্মৃত হয়ে এই সংসারের মধ্যে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছিল, আজ এই প্রথম হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, সে কে? কার জন্য তাহলে সে এতটা করেছে?

নকুড় আচায্যি সিদ্ধেশ্বরীকে এক সপ্তাহের জন্য অনঙ্গর কাছে রেখে সেই দিনেই নিজের বাড়ী ফিরে গেল। তার ইচ্ছা ছিল, বামার অসুখের দোহাই দিয়ে এখন কিছুকালের মতই সে গৃহিণীকে এখানে রেখে যায়, কিন্তু মেয়ে বাধা দিয়ে বল্লে—"না বাবা, ছি! এরা তা হলে কি মনে করবে? আমার কোন কষ্ট হয় নি; আমায় ত দেখা হল,—এইবার মাকে নে যাও।"

তারপর অনেক ভেবে চিন্তে—তার জামা'য়ের পীড়াপীড়িতে সাত দিনের জন্য সিদ্ধেশ্বরী মেয়ের বাড়ী রইল। ইতিমধ্যে বামুনঠাকরুণ সেরে উঠলেই চলে যাবে। এই সাত দিনে সিদ্ধেশ্বরী সাতশো রকম ব্যবস্থা করে ফেল্লে— সবগুলোই অবশ্য মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে। তার মধ্যে প্রধান গোটাকতক ব্যবস্থা উল্লেখ করা নিতান্ত প্রয়োজন। একদিন মাথায় অল্প একটু কাপড় দিয়ে গলাটা একটু খাটো করে সিদ্ধেশ্বরী

জামাইকে উপদেশ দিলে—"হ্যাঁ বাবা, সংসারে ক'টাই বা লোক, এতে এতোগুলো ঝি-চাকর রাখবার দরকার কি,—ওই যে নিস্তার বলে মেয়ে মানুষটি রয়েছে, ওর আর কি কাজ বাবা? ও তো দেখি কেবল তোমার রাঁধুনীর কর্ম্মই করে। আমি হলে ওকে ছাড়িয়ে দিতুম, খোরপোষ আবার পাঁচ টাকা মাইনে—এই বাজারে, এ কি রকম কথা!"

অমিয় বাবু বল্লেন—"ও অনেক দিন এ বাড়ীতে আছে, এখন ছাড়িয়ে দিলে যায় কোথা?"

সিদ্ধেশ্বরী বল্লে—"তা বটে, কিন্তু আরও ত অনেক রয়েছে?"

অমিয় বাবু সে কথার কোনও জবাব দিলেন না।

আর একদিন বামাঠাকুরুণকে উপলক্ষ করে, শাশুড়ী জামাইকে সদ্‌যুক্তি দিয়ে বল্লে—"বামাঠকুরুণেরই বা এত কি দরকার? তখন ঘরের গিন্নী ছিল না, না হয় রইল। এখন ত আর তার অভাব হচ্চে না—তার উপর অনিকে আমি ত পটের বিবির মত তৈরী করিনি,—এমন তিনটে সংসারের রান্না সে চালিয়ে দিতে পারে।"

সেদিন অমিয় বাবু চুপ করে থেকে রাত্রে স্ত্রীকে বল্লেন—"ওগো তোমার মাকে বলো—ওসব ব্যবস্থা তাঁর কিছু করতে হবে না! আর একটা ঝি কি একটা রাঁধুনীর পয়সা বাঁচিয়ে আমার এত বিশেষ কিছু লাভ হবে না।"

অনঙ্গর মার উপর ভারী রাগ হল—মাকে বল্লে—"হ্যাঁ মা, তোমার অত দরদ দেখিয়ে ঝি চাকর ছাড়াতে বলা কেন?"

সিদ্ধেশ্বরী জিজ্ঞাসা করলে—"জামাই কিছু বলেছে না কি?"

অনঙ্গ তাতে জবাব দিলে—"না, আমি তোমায় মানা করছি। তুমি ওসব কথা কইতে পাবে না বলে দিচ্ছি।"

সিদ্ধেশ্বরী একটু চুপ করে থেকে বল্লে—"তোর ভবিষ্যৎ ভেবেই করতে গেছি লো—থাকলে তোরই থাকবে।"

মেয়ে বল্লে—"না মা, আমার ভবিষ্যৎ তোমায় এখনি অত ভাবতে হবে না; তুমি এসেছ, শাশুড়ী,—এখানে তোমার ইজ্জতেই আমার মুখোজ্জ্বল, তা না করে দু'দিন না যেতে যেতেই যত উঞ্ছ লোকের মত ব্যবস্থা করতে যাওয়া, ছিঃ!"

সিদ্ধেশ্বরী মেয়ের কথায় একটু থমকে গিয়ে ভাবলে—বছর না ঘুরতেই এত মেজাজ! কিন্তু মনে মনে সাবধান হয়ে গেল, ওরকম কথা আর কইলে না। এর পর শিশিরকে উপলক্ষ করে, অমিয় বাবুকে একটু উপদেশ না দিয়ে থাকতে পার্লে না। সেদিন বল্লে—"দেখ বাবা, ছেলের তোমার দিন দিন বয়স বাড়ছে, ওকে একটু একটু করে সৎ শিক্ষা দাও—বল, দিন রাত অমন ছেলে মানুষের মত লাটিম ঘুড়ী লাটাই নিয়ে, বল্ খেলে বেড়ান ভাল দেখায় না। ষেটের কোলে পা দিয়ে তের চোদ্দ বছরের হল—বুঝলে না বাবা?"

জামাতা শাশুড়ীর মন্তব্যে স্তোক দিয়ে বল্লেন—"শিশির ত কেবল খেলা ধূলো করেই সময় কাটায় না,—ছেলেবেলা থেকেই তার পড়াশুনায় বিলক্ষণ চাড় আছে। এখন ত সে উঁচু ক্লাসে উঠেছে। স্কুলে ভাল লেখা-পড়াই করে। আর বাড়ীর মাষ্টারও তার খুব সুখ্যাতি করেন।"

কে জানে কেন, সিদ্ধেশ্বরী শিশিরকে প্রথম দিন থেকেই

ভাল চক্ষে দেখেনি,—আর অনঙ্গও সতীনপোকে অতটা আদর করে, এও তার পছন্দ নয়। যাহোক আর উপদেশ দিতে সিদ্ধেশ্বরী সাহস কর্ল্লে না। এবারকার মত সে চেপে গেল। ভাবলে, একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে জামাইকে বোঝাতে হবে। কিন্তু তার আক্রোশটা গিয়ে পড়েছিল বামাঠাকৃরুণের ওপর—যেমন করেই হোক তাকে এবাড়ী থেকে তাড়াতে হবে। কেন না, শিশিরের সে একজন মস্ত সহায়। তাছাড়া সে থাকলে অনঙ্গর সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকা সম্ভব নয়। এইটাই সিদ্ধেশ্বরীর মনে দিনরাত গাইত। কিন্তু 'এর মধ্যে হাজার চেষ্টা করেও এমন কোনও উপলক্ষ খুঁজে পাওয়া গেল না, যাতে করে বেশ রং চং লাগিয়ে অমিয়বাবুর কাণে বামার নামে নালিশ করা চলে। এমনি করে দেখতে দেখতে সাত দিনের স্থলে চৌদ্দ দিন কেটে গেল। কাজে কাজেই, আর ত সিদ্ধেশ্বরীর জামাই-বাড়ী থাকা ভাল দেখায় না। বিশেষ করে অনঙ্গ তার মাকে বেজায় পীড়াপীড়ি করতে লাগলো, যাতে মা শীগ্‌গীর নিজের বাড়ী চলে যায়। অনঙ্গর কথায় এক একদিন সিদ্ধেশ্বরীর খুবই রাগ হত, বলতো—"তোর এতটা-গায়ের জ্বালা কেন লা,—আমি তোর মা হই, তোকে বড়লোকের গিন্নী করলে কে জানিস?" অনঙ্গ তখন মাকে বলতো—"মা. তুমি আমার কথার মানে বোঝ না, নিজেকে নিজে ভুলে যাচ্ছ। আমি কি বুঝি না, আমার ভালর জন্যই সব করছো—কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন? আরও দু'বছর যেতে দাও না। নইলে সবাই মনে করবে, হাংলা ঘরের মেয়ে কি না, তাই বাড়ীতে পা দিয়েই সব ব্যবস্থা করছে।" সিদ্ধেশ্বরী মুখটা ভার করে বলতো—"ততদিনে ওই রাঁধুনী মাগী তোর হাড়ির হাল

করবে তা দেখে নিস। তুই যেমন হ্যাকা—ভাবছিস পুরোন লোক, তাই ওর অতটা ইষ্টাপত্তি—তা নয় লো, তা নয়; আরও অনেক কারণ আছে, আমি একটু আধটু তার হদিস্ পেয়েছি, তুইও বুঝতে পারবি। থাকগে, মরুক গে,—আমি ত কাল সকালে চলে যাব—তুই সবদিক একটু নজর রেখে চলিস— বুঝলি?"

সিদ্ধেশ্বরী পরদিনই চলে গেল; যাবার সময় আর একবার মেয়েকে বামাঠাকুরুণের উপর নজর রাখতে বলে গেল।

১০

পূর্ব্বের মতই দিন কেটে যেতে লাগলো। সিদ্ধেশ্বরী যাবার সময় অনঙ্গর কাণে যে বিষ ঢেলে দিয়ে গেল, সেটা তখনকার মত চাপা রইল। বামাঠাকরুণ আবার আস্তে আস্তে হেঁসেলের ভার নিলে। অনঙ্গ তাই দেখে বেশীর ভাগ সময়ই, ঘর-দোর সাজান-গোছানর দিকেই মন দিলে। কিন্তু সে মধ্যে মধ্যে রান্নাঘরের তদ্বির করতে ছাড়তো না। যখন যা জিজ্ঞাসা করবার দরকার হত, সোজাসুজি বামাকে জিজ্ঞাসা করতো। তাতে করে ক্রমশঃ বামার সঙ্গে যেন তার একটু মেশামেশি হতে লাগলো, অন্ততঃ বাড়ীর সকলে তাই মনে করলে। বামার অসুখের সময় নিজেদের অজ্ঞাতসারে পরস্পরের মধ্যে যে একটা গভীর খাতের সৃষ্টি হয়েছিল—এতদিন পর সেটা যেন ক্রমশঃ ছোট হয়ে গিয়ে উভয়ের ভিতর বেশ একটু সম্প্রীতির সূচনা দেখা গেল। তবে সময় পেলেই অনঙ্গ জানিয়ে দিত যে, সেই বাড়ীর কর্ত্রী—আর বামা রাঁধুনী ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে মনে মনে বামা বিদ্রোহী হলেও প্রকাশ্যে যেন সে অনঙ্গর দাবী অগ্রাহ্য করতে পারতো না—বা সাহসে কুলাত না। এমনি করে দেখতে দেখতে প্রায় দু'তিন বছর কেটে গেল। শিশির এখন বড় হয়েছে তার ঘাড়ে অনেক পড়ার চাপ্ পড়েছে। কাজেই এখন বেশীর ভাগ সময় বার-বাড়ীতে মাষ্টার মশায়ের কাছেই তাকে থাকতে হয়। স্কুলে সে একজন ভাল

ছেলে—সকল শিক্ষকই তাকে ভালবাসে,—স্নেহ করে। এইবার সে ম্যাট্রিকুলেশন দেবে; তার জন্য এখন থেকে অমিয়বাবু যথেষ্ট ব্যবস্থা করেছেন। গৃহ-শিক্ষক একজন ত বরাবরই আছে, তাছাড়া রামনিধি ভট্টাচায্যির ভাই বাঞ্ছারাম শিরোমণি কাশী থেকে দেশে ফিরেছেন—তাঁকে অমিয়বাবু সংস্কৃত পড়াবার জন্য নিযুক্ত করেছেন। কাজেই শিশি-রের এখন মোটেই ফুরসুৎ নেই। যেটুকু সময়ের জন্য সে অন্দরে আসে—সেটুকু অনঙ্গই তাকে আটকে রাখে। শিশিরও আজকাল নতুন মার খুব অনুগত। তা বলে বামাকে সে কিছু মাত্র অমর্য্যাদা করে না। তাকে আগেকার মতই শ্রদ্ধা করে, সময় পেলেই বা দেখা হলেই বামার কাছে হাজির হয়, নয়তো আব্দার করে আগেকার মত তার কাছে গিয়ে বসে গল্প করে—বামার কিন্তু তাতে তৃপ্তি নাই। সে শিশিরকে সম্পূর্ণ-রূপে আপনার করে নিতে চায়। বাস্তবিকই শিশিরের উপর তার কেমন একটা আন্তরিক টান,—যার জন্য সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারে। সে যে তাকে আঁতুড়ে থেকে মানুষ করেছে, এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না—অমিয়বাবু ত নয়ই।

অনেক দিন থেকে বামা একবার অমিয়বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করবার জন্য চেষ্টা করছিল, কিন্তু কিছুতেই সে সুযোগ হয়ে উঠেনি। দু এক মিনিটের জন্য যদি কোন দিন অমিয়বাবুর সঙ্গে বামার দেখা-সাক্ষাৎ হত, অমনি কেউ না কেউ সামনে এসে পড়তো, আর কোনও কথা হত না। একমাত্র নিস্তার ছাড়া আর সকল পরিচারিকাই এখন অনঙ্গর হাতের মধ্যে এসে পড়েছে। যারা দু'বছর আগেও বামাকে ঠিক বাড়ীর মনিবের মতোই ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো, সম্পূর্ণ হুকুমের অধীন ছিল, এখন একে একে

তারা সবাই বামাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে। কেউ কেউ মুখের উপর চোটপাট জবাব দেয়। বামা এই সব দেখে শুনে ইদানীং আর কাকেও কোনও কাজ করতে বলতো না,—নিজের মান বাঁচিয়ে চলতো। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনে মনে মনে সে এতদূর বিরক্ত হয়ে পড়েছিল, যে, তার ভাব দেখে মনে হত, যেন সে সুযোগ পেলেই সকলকে নখে টিপে মেরে ফেলে। তার চেহারাও দিন দিন শুষ্ক ও নীরস হয়ে পড়ছিল। দেহের সমস্ত লাবণ্য ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে গিয়ে, তার অন্তরে-বাহিরে যা কিছু তেজ বা দীপ্তি, সবটাই যেন তার চোখ দুটোতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। হঠাৎ দেখলে মনে হত—তার চোখদুটো দিবারাত্রি যেন জলজল করেছে। সেই অস্বাভাবিক জ্বালাময়ী উজ্জল দৃষ্টির তুলনা কেবল একমাত্র ক্ষুধিত ব্যাঘ্রীর সঙ্গেই দেওয়া যেতে পারে। অনঙ্গর সঙ্গে বেশ সরলভাবে কথা কইলেও, বা কথা কইবার সময় মুখে একটুখানি শুষ্ক হাসির আভাষ দেখা গেলেও, তার পিছনে সে যে রকম জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতো তা অপরে দেখলে বুঝতে পারতো, যে, বামা অনঙ্গকে কি দারুণ ঘৃণাই না করে, অথবা অনঙ্গর উপর তার কতখানি আক্রোশ। অনঙ্গ কতকটা যে বুঝতে পারতো না, তা নয়। তবে সে নিজেকে খুবই সাবধানে রাখতো। সাধ্যমত বামাকে ঘাঁটাতে চাইত না। অথচ ধীরে ধীরে সে বামার হাত থেকে একে একে সকল কর্ত্তৃত্ব কেড়ে নিয়ে তাকে কৌশলে এমন দূরে ঠেলে রেখেছিল, যে, একমাত্র রাঁধুনীর কাজ ছাড়া বামার আর কিছুই সংসারে করবার মত ছিল না। কাজে কাজেই তার সমস্ত নিস্ফল আক্রোশটা দারুণ হিংসায় রূপান্তরিত হয়ে তাকে রাক্ষসীর আকার দিয়েছিল।

সেদিন শিবরাত্রি। অনঙ্গমঞ্জরী আর বামাঠাকুরুণ উভয়েই উপবাস করে আছে। এই শিবরাত্রি উপলক্ষে আগে আগে—যখন অনঙ্গ এ বাড়ীতে আসেনি—বামার হুকুমে কত রকম ব্যবস্থাই এখানে হয়েছে। রাত্রিতে চারপ্রহর ব্যাপী পূজা, সারাদিনরাত্রি ধরে—পুরোহিত ঠাকুরের মুখে শিবমাহাত্ম্য, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির ব্যাখ্যা শোনা, পরদিন সকালে ব্রাহ্মণ ভোজন উপলক্ষে নানারূপ আহারাদি প্রস্তুত করা, এই সব তখন একা বামার আদেশেই হত আর অমিয় বাবু তার জন্য আলাদা টাকা বামার হাতে দিতেন। এবার কিন্তু সকল ব্যবস্থাই উল্টে গেছে। বৈকাল বেলায় অনঙ্গ বামার হাতে দুটি টাকা দিয়ে বল্লে—"এই নাওগো, বাবু তোমার শিবরাত্রির খরচের জন্য দিতে বলেছেন।"

বামা একবার শুধু অনঙ্গর মুখের দিকে চেয়ে, তার পর কোনও দ্বিরুক্তি না করে টাকা দুটি আস্তে আস্তে আঁচলে বেঁধে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। আর ফিরেও তাকালো না।

সন্ধ্যার সময় বিরাজী এসে বামাকে জিজ্ঞাসা করলে—"মাঠাকরুণ শিবের বাড়ী পুজো দিতে যাবে, তুমিও সঙ্গে যাবে কি?"

গ্রামের উপকণ্ঠে বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দির আছে, শিবরাত্রির দিন সেখানে বিস্তর লোক সমাগম হয়। অনঙ্গ, ঝি আর দ্বারবান সঙ্গে করে আজ সেখানে পুজো দিতে যাবে বলে, আগে হতে অমিয়বাবুর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রেখেছিল। সেখানে রামনিধি তর্কচূড়ামণি আর তাঁর স্ত্রী উভয়ে উপস্থিত থেকে স্ত্রীলোক ও পুরুষ যাত্রীদের সুবিধার জন্য সকল রকম তত্ত্বাবধান করেন। বিশেষতঃ অমিয়বাবুর স্ত্রী যে সেখানে নিজে পুজো দিতে যাবেন, এ সংবাদও পূর্ব্বাহ্নে পাঠান হয়েছিল।

বামা সমস্ত কথা বিরাজীর মুখে শুনে এক কথায় জবাব দিলে—"না, আমার শরীর ভাল নয়, আমি যাব না।" তার পর রওনা হবার সময় অনঙ্গ নিজেও একবার অনুরোধ করলে। তাতেও বামা স্বীকৃত হ'ল না, জানালে তার শরীর বড়ই দুর্ব্বল, উপোস করে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে, নইলে সে যেত। তখন অনঙ্গ বামাকে বাড়ী-ঘর আগলাতে বলে, ঝি-চাকর সঙ্গে করে পুজো দিতে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—"তাহ'লে আমি বাবু তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবো না তা বলে রাখলুম। তুমি যখন রইলে, তখন উনি আর শিশির যখন খেতে বসবেন, লুচি কখানা ভেজে দিও, ময়দা মাখা রইল, তরকারী আর বেশী করতে হবে না, আলু, পটল ভেজে দিলেই চলবে, আর বাটিতে ক্ষীর করা আছে। আজ গোমস্তাও খাবে না, সে উপোস করেছে।"

বামা সব কথাই শুনলে বটে, কিন্তু হাঁ কি না কোনই জবাব দিলে না। পাশ ফিরে শুয়ে রইল। নিস্তার দুপুর বেলা থেকে বাড়ী নেই। সে তার বোন্‌ঝিকে দেখতে গেছে। সেও রাত্রে ফিরবে না। কাজেই অনঙ্গ চলে যাবার পর, বাড়ীটা একরকম ফাঁকা হয়ে গেল। গোবিন্দর মা বলে আর একজন ঝি, সেও অনেক করে ধরে, অনঙ্গর সঙ্গে শিব-মন্দিরে পুজো দেখতে গেছে। বার-বাড়ীতে মাষ্টার মশাই তখন শিশিরকে পড়াচ্ছেন। কাছারীতে দু'একজন লোক বসে গল্প-গুজব করছে। অমিয়বাবু উপরের ঘরে একখানা আরাম-কেদারায় শুয়ে গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়ে চোখ বুজে আরাম কর্চ্ছেন। দূরে টেবিলের উপর থেকে সবুজ চিম্‌নির ভিতর দিয়ে খুব অল্প স্নিগ্ধ আলো এসে ঘরটাকে যেন ঠিক ঘুমন্ত রাজকন্যার স্বপ্নপুরীর মতোই

দেখাচ্ছিল। সেই নিরালার মধ্যে একমাত্র ঘড়ীর টিক্ টিক্ আওয়াজই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল। অমিয়বাবু ঘুমন্ত কি জাগন্ত—তা' বোঝা যাচ্ছিল না। সেই সময় অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে বামা উপরে এসে অমিয় বাবুর ঘরে ঢুকে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে তাতে খিল এঁটে দিলে। সেই শব্দে অমিয়বাবুর তন্দ্রাটা ভেঙ্গে গেল। তিনি একটু চম্‌কে এদিক ওদিক্ চেয়ে দেখতে লাগলেন। বামা ততক্ষণে আরাম-কেদারাখানা ঘুরে অমিয়বাবুর সামনে এসে বসে পড়লো, তার পর কোনও কথা না কয়ে, আঁচল থেকে টাকা দুটো বার করে তাঁর পায়ের কাছে রেখে, মেঝের উপর মাথাটা ঢিব্‌ ঢিব্‌ করে খুঁড়তে সুরু করে দিলে।

অমিয়বাবু প্রথমটা ভ্যাবাচ্যাগা মেরে গিয়ে, খানিকটা স্তব্ধ হয়ে থেকে তাড়াতাড়ি উঠে বামাকে ধরে ফেলে বল্লেন,—"এ কি বামা! এমন করছো কেন?—শুন্‌লুম আজ ত উপোস করে আছ, তার উপর এ সব কি?"

বামা বল্লে,—"আজ আমি এইখানে হত্যা হব, আর লাঞ্ছনা সইতে পারি না। হয় আজ এর একটা বিহিত করুন, নয় তো আপনার স্ত্রী-হত্যার পাতক হবে।"

অমিয়বাবু ভয় পেয়ে গেলেন। বামার এ রকম উগ্র মূর্ত্তি তিনি কখনও দেখেন নি। অনঙ্গ বাড়ীতে এসে পর্য্যন্ত কে জানে কেন তিনি বামাকে যতদূর সম্ভব দূরে রেখে তাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু একদিন যে এমন সময় আসবে—বামা তার সমস্ত আক্রোশ মিটাতে একদিন যে এইরূপ মুখোমুখী হয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াবে, এ কথাটা প্রতিক্ষণেই তাঁর মনে উদয় হলেও, তিনি প্রাণপণ

যত্নে, সেটাকে চেপে রেখে আসছিলেন। অমিয়বাবুর সঙ্গে তার যে কতটা পরিচয়, একথা এখন একমাত্র নিস্তার ছাড়া এ বাড়ীর আর কেউ জানে না। অথচ উভয়েই আপনাপন স্বার্থের খাতিরে, এই সুদীর্ঘ বারো-তেরোটা বছর ধরে বিভিন্ন উপায়ে পরস্পরের মধ্যে এই অতি নিগূঢ় সম্বন্ধটা সর্ব্বসাধারণের নিকট হতে অপ্রকাশ রেখে চলে এসেছেন। এ রহস্যের ইতিবৃত্ত যে কি এবং কোথায়,—কত দূরে—অথবা কত দিনের, আর সকল কথা গোপন রাখবার জন্য প্রধানতঃ কার বেশী স্বার্থ, তার বিচার করবার সময় এখনও আসেনি। অমিয়বাবুও সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। আজ হঠাৎ বামার এই রকম ঝড়ের মত আবির্ভাবে, তাঁর মুখখানা একেবারে শুষ্ক ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি প্রথম থেকেই আপনাকে অপরাধীর আসনে বসিয়ে বামাকে জিজ্ঞাসা কর্লেন—"তুমি যে এতটা উত্তেজিত হবে, তা তো আমি কল্পনাও করিনি। আজ কেন তুমি নিজেকে এতটা ভুলে যাচ্ছ ? আমাকে শাস্তি দিয়ে তোমার লাভ কি ?"

—"কিছুমাত্র নয়। লাভের মধ্যে আমারই শাসন চতুর্গুণ হয়ে চারিদিক থেকে আমায় বিদ্ধ করবে। সে শাসনের সূত্রপাত হয়েছে তিন বছর আগে, যেদিন আপনি আপনার সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভাসিয়ে দিয়ে, নকুড় আচায্যির মেয়েকে আবার এই সংসারে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কেন আপনি আমার উপর নতুন করে এই অবিচার করলেন ?—আমি আপনার কাছে কি দোষ করেছিলুম, যার জন্যে, আজ আমি সকলের চোখে ঘৃণ্য ?"

—"ভুল করেছি বামা—মস্ত ভুল করে ফেলেছি। নকুড় আচায্যি

আর তার স্ত্রীর কৌশল-জাল আমি বুঝতে পারিনি। একটা মোকর্দ্দমার তদারক করতে গিয়ে এক ঘণ্টা মাত্র তাদের বাড়ীতে বসেছিলুম, তার মধ্যে তারা আমায় যেন যাদু করে ফেলেছিল।"

—"ও কথা বলবেন না। যারা কেবলমাত্র নারীর যৌবনটাকেই নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ বলে মনে করে, তারাই পরের ঘাড়ে দোষ চাপায়। মানুষকে অনেক কিছু বলে বোঝান যায়, কিন্তু দেবতাকে বোঝান যায় না। সত্য গোপন করা মহা পাপ। আপনার আর আমার মধ্যে অনেকখানি আসল সত্য ছিল, এটা মনে রাখবেন।—সে সকল সত্য গোপন না করলেও চল্‌তো। শিশিরের মা সতী-সাধ্বী,—যথার্থ সতীর মতোই নির্ম্মল অন্তঃকরণ নিয়ে সে মরেছে। আপনার দুর্ব্বল চিত্ত দেখে সে যতই কেন না ব্যথা পাক—দু'দিনেই সে তা সামলে নিয়েছিল; একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে আমায় ঘৃণা করেনি।"

—"না, তা সে করে'ন।"

—"কেন করেনি তা জানেন?—সে নিজে বুদ্ধিমতী আর উদার ছিল বলে; তার নিজের মধ্যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি খুব প্রবল ছিল বলে, অপরের দোষ-ত্রুটি মার্জ্জনা করবার তার শক্তি ছিল। আর একটা কথা,—সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল, যে, আপনার-আমার মিলনের মধ্যে কোনও পাপ ছিল না, কলঙ্ক ছিল না। সাত বছরের মেয়ের বে' দিয়ে যদি আট বছরে সেই মেয়ে বিধবা হয়, অনায়াসে তার বিবাহ দেওয়া চলে; এক সমাজ তাতে বাধা দিলেও অপর সমাজ তাতে প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত নয়।"

—"এত কথা কেন তুমি তুলছো বাবা?"

—"কেন তুলছি বুঝতে পারছেন না ?—তার মানে আমি আপনার রক্ষিতা নই ;—আমি আপনার বিবাহিতা স্ত্রী। শিশিরের মাকে আপনি হিন্দুমতে বে' করে আপনাদের গ্রামে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কক্স-বাজারে প্রথম যখন আপনি নাজিরী করতেন, সেখানে এ কথার বিন্দুবিসর্গও আপনি প্রকাশ করেন-নি। ব্রাহ্ম-সমাজের মন্দিরে যখন আপনি যাওয়া-আসা করতে লাগলেন, যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আপনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হলেন, সে সময় আমার মামা হরিশ গাঙ্গুলী আপনাকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন ;—আর ঘুণাক্ষরেও তিনি বা সমাজের আর কেউ আপনার কথায় অবিশ্বাস করেন নি। আমার মামা সরল অন্তঃকরণে আপনার হাতে আমায় সমর্পণ করেছিলেন। তারপর ফিরে বছরেই তিনি মারা গেলেন,—আর আপনিও ক্রমে ক্রমে মুর্শিদাবাদ, বহরমপুরে, তারপর রাণাঘাটে বদলী হলেন। দেখতে দেখতে আপনার আঙুল ফুলে কলাগাছ হল, জমীদারী কিনতে আরম্ভ করলেন। এই চন্নপুরের বাড়ীতে যখন আপনি এসে বাস করলেন, তখন আমি বুঝতে পারলুম, যে, আপনার আরও একজন স্ত্রী আছে। আর সেই স্ত্রী বাতে পঙ্গু।"

অমিয়বাবু নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন আর নিঃসহায় বোধ করছিলেন। তাড়াতাড়ি বামার মুখে হাতখানা চাপা দিয়ে বল্লেন—"চুপ কর—চুপ কর বামা, কেউ কোথা হতে শুনতে পাবে। সে কথা ত অনেকদিন মিটে গেছে। যুগান্তর হয়ে গেছে, আজ আবার সে পুরান কাহিনী—"

বামা জোর করে অমিয়বাবুর হাতখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দূরে সরে

গিয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—"কাটা ঘায়ে আর কেন নুনের ছিটে দেন? আপনার কথায় আপনার মুখ চেয়ে আমি আজ তের বছর চুপ করে আছি। আর যে পারি না। রাণাঘাটে থাকতে থাকতেই, তারপর আবার চন্ননপুরে এসেও আপনি আবার হিন্দু সাজলেন,—হিন্দু স্ত্রী নবীনকালীকে ঘরের গৃহিণী সাজিয়ে আপনি বেশ এখানকার আসর জমিয়ে নিলেন। আমার অপরাধ কি? কারণ, আমি ব্রাহ্ম। আপনারা স্ত্রী-পুরুষে ঘরের মধ্যে আমার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েই আমার সর্ব্বনাশ করেছিলেন। তখন যদি আপনারা আমায় অগ্রাহ্য করতেন বা লাঞ্ছিত করতেন, তাহলে আমি সহায়-সম্পত্তিহীনা নারী হয়েও তার প্রতিকার করতে পারতুম। তা না করে তখন আমায় যাদুমন্ত্রে আপনারা ভুলিয়ে দিয়েছিলেন, যার ফলে, গ্রামশুদ্ধ লোক আজও আমায় কেবলমাত্র রাঁধুনী বলেই জানে। নকুড় আচায্যির একফোঁটা মেয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসে, আজ সর্ব্বেসর্ব্বা, স্বামীর স্ত্রী, আর আমি? আমার স্থান কোথায়?"

—"চুপ কর বামা, প্রকৃতিস্থ হও! আমি এইবার এর প্রতিকার করবো। আমি মনে মনে অনেক ব্যবস্থা ঠাউরে রেখেছি। সাত দিন খালি আমায় সময় দাও,—দয়া করে সাতটী দিন বামা!"

—"কি আপনি করবেন?"

—"আমি কোলকাতায় বাড়ী ভাড়া করে শিশিরকে রাখবো। ছ' মাস পরে তার পরীক্ষা, এখানে না থেকে সেথায় থাকলে তার পড়াশুনা ভাল হবে। তার মাষ্টার মশাই-ও সঙ্গে থাকবে। আর একজন চাকরও পাঠাবো।"

বামা একটু বিদ্রূপের স্বরে বল্লে—"আর বামা রাঁধুনী, তাকে মা'-মরা ছেলে মানুষ করেছে বলে তার সঙ্গে যাবে, কেমন? চমৎকার! কি সুন্দর বুদ্ধি! একেই বলে জমিদারী মাথা। না, আর অতটা অনুগ্রহ করে কাজ নেই। যথেষ্ট হয়েছে। আমি মনস্থ করেছি, কাশী যাব—আপনি তার ব্যবস্থা করে দিন।"

—"কাশী যাবে বামা—শিশিরকে ছেড়ে তুমি কাশী যাবে? যেতে পারবে?"

—"কেন পারবো না? শিশির আমার—" এইটুকু বলেই বামা ঢোঁক গিলে একটু চুপ করে থেকে আবার বল্লে—"সে আপনার ধর্ম্ম-পত্নীর গর্ভের সন্তান, আপনার দ্বিতীয় স্ত্রী বর্ত্তমান, তিনি তাকে দেখবেন।" শেষের এই কথা কটার উপর বামা একটু জোর দিয়েই বল্লে। তারপর অমিয়বাবুর নিকটস্থ হয়ে অল্প বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলতে লাগলো,—"আমার পরম সৌভাগ্য যে, সকলেই জানে, আমার পেটের ছেলে নেই। তাই যেমন, তেমন করে লোকের কাছে মান রেখে চলেছি। নইলে? উঃ আমি কতবড় ভুল করে ফেলেছি।—যে মুহূর্ত্তে আমি জানতে পেরেছিলুম, যে আপনার অপর একজন স্ত্রী আছে, সেই মুহূর্ত্তেই কেন আমি নিজেকে প্রচার করিনি। আপনি আপনার হিন্দু সমাজে হাস্যাস্পদ হবেন বলে, প্রায়শ্চিত্ত করবেন বলে, আমি কেন আমার কথা গোপন করতে গিয়েছিলুম! আমার সমাজে আমি ত অনায়াসে সব কথা লিখে জানাতে পারতুম!"

"তখন তুমি ভালই করেছিলে বামা। নবীনকালী প্রথম দিন হতেই

তোমার বড় বোনের মত মান্ত করেছে। যতদিন সে বেঁচে ছিল, তোমার উপরেই সে সকল বিষয়ে নির্ভর করেছিল।"

—"আমার পক্ষে সেই কাল হয়েছিল। তার মুখ দেখে, আর তার ব্যারামে অসহায় অবস্থা দেখে, আমি আমার সব কথাই ভুলে গিছলুম। আমি রাঁধুনী সেজে তাকে রাজরাণী করে রেখেছিলুম। কিন্তু এক দিনের তরে অস্বস্তি বোধ করিনি। ঝি, চাকর, পাড়াপড়শী সকলকার কাছেই আমি দীনহীন কাঙালীর মত, মুখ্যুর মত সেজে থাকতুম। সকলেই জান্‌তো, আমার স্বামী পাগল, নিরুদ্দেশে, আমি রাঁধুনীগিরি করে পেট চালাই।"

—"আর তোমায় তা সেজে থাকতে হবে না বামা। কোলকেতার বাসায় তুমি তোমার নবীনকালীর ছেলেকে নিয়ে সেখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে থাকবে—তার ব্যবস্থা আমি করে দেব।"

—"নাঃ—আমি এখন তা পারবো না, তা বলে রাখছি। আর আমি এখানে লুকোচুরী খেলতে পারবো না। আপনার সে স্ত্রী নবীন-কালী আমায় জান্‌তো, আমি কে ;—কিন্তু আপনার নবযুবতী স্ত্রী অনঙ্গ-মঞ্জরী তা জানে না। বিশেষ করে, তার সেই ডান রাক্ষুসী মা! সে আমায় সন্দেহের চোখে দেখে। আমি অজ্ঞাত-পরিচয় হয়ে এ সংসর্গে আর থাকতে পারবো না। আপনি কাশী যাবার বন্দোবস্ত করে দিন। আর দয়া করে মাসে মাসে কিছু খরচ আপনি সেখানে পাঠাবেন, তা-হলেই আমার হবে,—সেটা ত ধর্ম্মতঃ আপনি দিতে বাধ্য ?"

—"সেখানে তোমায় দেখবে কে ?"

—"জগদীশ্বর। তাছাড়া নিস্তারকেও সঙ্গে নেব। এখন সে ছাড়া

এ বাড়ীতে আমার কেউ নেই। একমাত্র সেই-ই সব জানে। সে যা' হবে তা হবে—আমি একলাও কাশীতে থাক্‌তে পারবো—কোনও ভয় নেই। আমায় এখন শুধু বিদায় দিন,—আপনার দু'টি পায়ে পড়ি—আমায় বিদায় করে দিন, আর আমি এখানে 'বামুন মা' সেজে থাকৃতে পারবো না। এ সাজে অরুচি হয়ে গেছে।" এই পর্য্যন্ত বলে বামা হাঁপাতে লাগলো।

অমিয়বাবুর মুখ দিয়ে কোন কথা বার হল না। তিনি মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে মাটীর দিকে চেয়ে বসে রইলেন। এই ভাবে প্রায় পাঁচ মিনিট কাল অতিবাহিত হল। বামা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। অমিয়-বাবুর কাছে অনেকক্ষণ কোনও উত্তর না পেয়ে, সে আবার আতিষ্ঠ হয়ে উঠলো, বল্লে—"চুপ ক'রে রইলেন যে ?"

অমিয়বাবু চট্ করে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—"কিন্তু আমি ত তোমায় দূরে রেখে থাকৃতে পারবো না বামা ?"

বামার ঠোঁটের উপর দিয়ে অল্প একটু হাসির লহর খেলে গেল, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য ; অমিয়বাবু তা' দেখ্‌তেও পান্‌নি, তিনি মাথা নীচু করেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

অমিয়বাবু আবার বল্লেন,—এবার বামার চোখের দিকে চোখ তুলেই বল্লেন—"শুনলে, তুমি যেতে চাইলেও, আমি ত তোমায় দূরে রেখে থাকৃতে পারবো না ?"

বামা চট্ করে উত্তর দিলে—"মরা নদীতে আবার বান্ ডাকলো কেন ? চিত্তবৃত্তি ত অনেকদিনই নিবৃত্তি হয়েছে, আর কেন প্রবৃত্তিকে খুঁচিয়ে তোলা ?"

তখন অমিয়বাবু আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়ে বামার হাতখানা চেপে ধরে খুব নম্রভাবে বল্লেন—"আজ যাও শৈলজা, উপোস করে আছ, আজ শোওগে,—আজ রাত্রিটা আমায় ভাবতে দাও—কাল আমি তোমার কথার উত্তর দেব।"

বামা জিজ্ঞাসা করলে,—"কখন উত্তর দেবেন? কখন আমি আপনার সাক্ষাৎ পাব? আজ তারা সব বাড়ী নেই, কিন্তু—" তখনও বামার হাতখানা অমিয়বাবুর মুঠোর মধ্যেই ছিল, এইবার সে হাতখানা মুক্ত করে নিয়ে বল্লে—"কিন্তু কাল আর এমন সুযোগ হবে না।"

অমিয়বাবু বল্লেন—"হ্যাঁ, আমি সে ব্যবস্থা করবো। আজ আমায় মাপ কর—আর ভাবতে পারছি না"—এই বলে তিনি দু'হাতে আপনার দু'টো রগ টিপে ধ'রে একখানা চেয়ারে বসে' পড়লেন। তখন অমিয়বাবুর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি চোখ বুজে মাথাটা হেলিয়ে পড়ে রইলেন।

বামা আর কোনও কথা না ক'য়ে আস্তে আস্তে দরজা খুলে তাঁর মুখের দিকে একবার চেয়ে মুহূর্ত্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে, তার পর বেরিয়ে গেল।

সেই সময় অমিয়বাবু আর একবার দাঁড়িয়ে উঠে, দরজার কাছে অগ্রসর হয়ে বল্লেন—"আর একটা কথার জবাব দিয়ে যাও বামা, এ টাকা দুটো তুমি এখানে রাখ্‌লে কেন, এ কার টাকা?"

বামা তখন অনেকটা চলে গেছে—সেইখান থেকেই ঘাড়টা ফিরিয়ে বল্লে—"আপনার টাকা, আপনার বিবাহিতা স্ত্রী, আজ আপনার নাম করে আমার শিবরাত্রির খরচ দিয়ে গেছেন।"

অমিয়বাবু স্তব্ধ হয়ে গিয়ে ফিরে চেয়ারে বসে পড়লেন। তাঁর মুখ হতে শুধু বেরুল—"আমি দিইছি!"

বামা সে কথা শোন্‌বার আগেই চলে গিয়েছিল। সমস্ত দেহটা তখন তার টলমল করছিল। যখন সে টল্‌তে টল্‌তে নীচে নেমে গিয়ে ঘরের কাছাকাছি পৌছাল, তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টা। শিশির সবেমাত্র পড়া সেরে বাড়ীর ভিতর আসছিল, দালানে পা দিয়েই সে দেখ্‌ল, বামা পড়ে যেতে যেতে দেওয়ালটা ধরে আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। শিশির তাড়াতাড়ি আপনার বইগুলো মেঝেয় ফেলে দৌড়ে গিয়ে বামাকে ধরে ফেলেই বল্লে,—"কেন বামুন মা, এ রকম করছো কেন? এখনই যে পড়ে যাচ্ছিলে? শরীর এত খারাপ, তবু শিবরাত্রি করা,—তুমি যেন কি!"

বামাও যেন শিশিরের আশ্রয় পেয়ে বেঁচে গেল এমনি ভাবে তাকে জড়িয়ে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বল্লে—"না বাবা, পড়ে ত যাইনি, মাথাটা কেমন ঘুরছিল।"

—"চল—বিছানায় শোবে চল,—আমি ধরে নিয়ে যাচ্ছি, বামুন মা"—

—"বামুন মা না বলে' আমায় একবার মা' বলে ডাক না খোকন-মণি—আমি যে তোমার মুখের 'মা' শোনবার জন্যই আজও বেঁচে আছি।"

—"মা-ই তো তুমি আমার। চল—শোবে চল—"

—"সত্যি—সত্যি খোকনমণি? তুমি আমায় মা বলেই জান? এবার থেকে তাহলে আমাকে কেবল মা' বলেই' ডাকবে?"

এই বল্‌তে বল্‌তে বামা শিশিরকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আপ-নার ঘরে ঢুকে পড়লো। ঠিক্ সেই সময় বারবাড়ীতে পাল্কীর বেহারাদের কলরব শোনা গেল।

তারা অনঙ্গমঞ্জরীকে নিয়ে তখন ঘরে ফির্‌ছে।

* * * * *

এক সপ্তাহ পরেই বাড়ীতে প্রচার হয়ে গেল যে, শিশির, বামা এবং তার সংস্কৃত গৃহশিক্ষক বাঞ্ছারাম শিরোমণির তত্ত্বাবধানে কোল্‌কেতার বাসায় থেকে পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হবে। অনঙ্গমঞ্জরী এই ব্যবস্থাটা শুনেই অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেল; কেন না, পূর্ব্বে এ কথার বিন্দুবিসর্গও কারো কাছ থেকে সে শোনেনি,—অথবা তার সঙ্গে অমিয়বাবুও কোনও পরামর্শ করেননি। এতে তার আত্ম-মর্য্যাদায় বড়ই আঘাত লাগলো। এখন সে বাড়ীর গিন্নী,—সর্ব্বেসর্ব্বা,—সে ভাবতেই পারছিল না, যে, তার সঙ্গে পরামর্শ না করে, তার স্বামী কোনও কাজ করতে পারেন। সে স্বামীর সঙ্গে একেবারে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিলে। যাই হোক, অমিয়-বাবুও তখনকার মত সে সব দিকে কাণ না দিয়েই, চট্‌পট্ সকল বন্দোবস্ত করে ফেল্লেন।

অনঙ্গমঞ্জরী শিশিরকে আন্তরিক ভালবাসতো।

১১

অমিয়বাবুর জমীদারীর আয় যতই হোক্ না কেন, শিশিরকে তিনি কোলকেতায় বেশ বড়লোকের ছেলের মতই রাখলেন।

হেদোর ধারে যে বাড়ীটা নেওয়া হয়েছিল, সেখানা দোতলা। নীচে তলাটার সুমুখের ঠিক সদর রাস্তার উপর মোটর গাড়ী রাখবার জন্যে গোটাতিনেক গ্যারেজ ছিল,—বাড়ীওলা সেগুলো অপর লোকদের ভাড়া দিতেন, যাদের মোটর ছিল, কিন্তু রাখবার স্থান ছিল না। আর তারই ভিতর দিকে সারি সারি তিনটে শোবার ঘর, আর একখানা রান্নাঘর ছিল। ঘরগুলো বিশেষ ভাল যে, তা নয়। কোলকেতায় অধিকাংশ ভাড়াটে বাড়ীর নীচেতলা যেমন হয়, তেমনি—স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার। শিশির-দের নীচেতলার সঙ্গে বড় একটা সংস্রব ছিল না, কেবল উপরে যাবার সিঁড়ীতে উঠবার-নামবার জন্যে যা নীচেটায় পদার্পণ করতে হত। তারা ভাড়া নিয়েছিল,—শুধু সমস্ত দোতলাটা। উপরের ঘরগুলো খুবই ভাল, যথেষ্ট আলো আর বাতাস সেখানে পাওয়া যেত। বাড়ীটা হেদোর উত্তর গায়ে, বিডন ষ্ট্রীটের ওপর। গ্রীষ্মকালে বারান্দায় বসলে শরীর জুড়িয়ে যেত, দক্ষিণে বাতাস দীঘির জলের শৈত্যটুকু ছেঁকে নিয়ে যেন উত্তর দিকের বাড়ী গুলোতে পেঁছে দিত। নীচেকার যে ঘর তিনটের কথা বলছি, তার একটাতে কেবল অমিয়বাবুর একজন চাকর রাত্রে শুয়ে

থাকতো। আর কোন ভদ্রলোক এলে, তাইতে বসানো হত' সেজন্য এক প্রস্থ বিছানাও ছিল। বাকী আর দুটো ঘর আগে হতেই চাবি বন্ধ ছিল। বাড়ীওলা বলেছিল, কে একজন বাবু—আসামের কোন্ একটা চা-বাগানে কাজ করেন, তাঁর স্ত্রী আর একটি মেয়ে, সেই দুটো ঘরে থাকেন। প্রায় দু'তিন বছর তাঁরা আছেন। বাবুও মধ্যে মধ্যে এসে দশ পনর দিন কাটিয়ে যেতেন। তাঁর পরিবারেরাও দু'এক্টা ক্ষেপ সেখানে গিয়েছিলো। গত মাসে হঠাৎ খবর এলো যে, চা-বাগানে বাবুর ভারি ব্যারাম হয়েছে, স্ত্রীকে আর মেয়েকে তিনি দেখতে চাচ্ছেন। টেলিগ্রাম পেয়েই তারা সেখানে চলে গেছে। ঘরদোর যেমন অবস্থায় ছিল, তেমনি পড়ে আছে—শুধু চাবিটা দিয়ে গেছে মাত্র। এক মাস হয়ে গেল, এখনও তাদের কোন খবর পাওয়া যায়নি। বাবুটি বেঁচে আছেন কি না, তাও আমি জানিনা।

অমিয়বাবু সপ্তাহ তিনেক কোলকেতায় থেকে, শিশিরের একজামিনের টাকাকড়ি জমা দিয়ে, আর সব বন্দোবস্ত করে আবার শীঘ্রই আসব বলে দেশে ফিরেছিলেন। এসব খবর সংগ্রহ করেছিল বামা ঠাকরুণ, আর নিস্তার। বাড়ীওলার এক ঝি মাঝে মাঝে আসতো—তারই কাছ থেকে এই সব কথা তারা শুনেছিল। দুচারখানা বাড়ীর পরই বাড়ীওলার নিজের বাড়ী।

বামা শিশিরকে নিয়ে বেশ নিশ্চিন্তে ছিল বটে, কোনও ঝঞ্ঝাট তার ছিল না, একলাই বাড়ীর কর্ত্রী, কিন্তু সময় তার কাটতে চাইতো না। শিশির আপনার পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতো, তার পরীক্ষার আর বেশী দিন নেই।

বাঁশী

বাঞ্ছারাম শিরোমণি দেশের লোক হলেও, আর তাঁর পরিচর্য্যার সমস্ত ভার বামারই উপর থাক্‌লেও, তাঁর সঙ্গে এ পর্য্যন্ত বেশ খোলাখুলি ভাবে বামা কথা কইতে পারেনি। তবে লুকিয়েও সে থাক্‌তো না, কিম্বা মাথায় সাত হাত ঘোমটাও দিত না,—মোটের উপর বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে বামা কথা কইত না। আর শিরোমণি মশায় চন্দনপুরে খুব অল্পদিনই এসেছিলেন। কাশীতেই তিনি ছিলেন—আট দশ বছর, কাজেই বামার পরিচয় তাঁর বিশেষ জানা-শোনা ছিল না। গ্রামের আর আর সকলে যেমন বামাকে রাঁধুনী বলেই চিরকাল জেনে এসেছে, আর তাই নিয়েই চিরদিন আলোচনা করে এসেছে, শিরোমণি মশায়ের সে সব শোনা ছিল না, আর ততটা খেয়ালও তাঁর ছিল না। বামাকে তিনি বেশ সমীহ করেই কথা বলতেন।

শিশিরের পরীক্ষার প্রথম দিন সকালবেলায়, একখানা ভাড়াটে গাড়ীর উপর মোট ঘাট চাপিয়ে, নীচেতলার সেই ভাড়াটে স্ত্রীলোক দুটি এসে হাজির হ'ল।

তারা মা ও মেয়ে।

মার বয়স আন্দাজ ত্রিশ, আর মেয়ের বয়স বছর তের কি বড় জোর চৌদ্দ। মেয়েটির এখনও বে' হয়নি। কিন্তু খুব চট্‌পটে—কাজের লোক, আর বেশ বুদ্ধিমতী বলে বোধ হয়। একজন চাপরাসী গোছের লোক গাড়ীর ছাদ থেকে জিনিসপত্র নামাতে লাগলো।

মেয়ে, মার কাছে ঘরের চাবি চাইতে, মা একগোছা চাবি মেয়ের হাতে দিয়ে আঁচল পেতে দালানের একপাশে শুয়ে পড়লো। তার দু' চোখ দিয়ে তখন ঝর ঝর করে জল পড়ছিল। তাকে আর কোনও

কথা জিজ্ঞাসা না করে মেয়েটী চাপরাসীর সাহায্যে সমস্ত জিনিসপত্র একটা ঘরে রাখিয়ে, গাড়োয়ানের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সেই চাপরাসীকে বল্লে---"তুমি না থাকলে মাকে নিয়ে আমি কখনই তেজপুর থেকে এতটা পথ আসতে পারতুম না। আজ তুমি কোলকেতায় থাকবে ত?"

চাপরাসী জবাব দিলে—"না দিদিবাবু, আজ সন্ধ্যার গাড়ীতেই আমায় ফিরে যেতে হবে—বড়সাহেবের হুকুম। আমি এখন, আমার এক ভাই বৌবাজারে থাকে, তার বাসাতেই যাচ্ছি, সেখানেই খাওয়া-দাওয়া করবো।"

মেয়েটী তখন একটা হাতবাক্স খুলে তা থেকে একটি টাকা বার করে তার হাতে দিতে গেল। সে জিব কেটে বল্লে—"না দিদিবাবু—ও আমি নেব না।"

মেয়েটী বল্লে--"সে কি কথা—কেন তুমি নেবে না, আমরা তোমায় কিছুই দিতে পারিনি।"

—"তা হোক—আমি সে আশাও রাখিনি, আমি যে তোমাদের নির্ঝঞ্ঝাটে কোলকেতায় পৌঁছে দিতে পেরেছি, এই ঢের। বকসিস্ আমার চাই না। বড়সাহেব টিকিটের টাকা আর খরচা আমায় দিয়েছে।"

মেয়েটীর মা তখন চোখের জল মুছতে মুছতে বল্লে—"বেঁচে থাকো বাছা—কি বলে আর আমি আশীর্ব্বাদ করবো, আমার আর কিছুই নেই। তিনি আমার সব নিয়ে চলে গেছেন—রেখে গেছেন শুধু জীবনভোর কাঁদতে"—এই পর্য্যন্ত বলেই, গলার স্বর বন্ধ হ'য়ে এল, তার মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরুলো না।

চাপরাসী বল্লে—"কি আর বলবো মা, বাবু যে এত শীগ্‌গীর এমন করে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি।" এই বলে সে যাবার জন্যে পিছন ফিরে দরজার কাছে গিয়ে মেয়েটিকে আবার ইসারা করে কাছে ডাকুলে। সে দরজার কাছে যেতেই সে তার হাত দুটো ধরে বল্লে—"দিদিবাবু, আমি চল্লুম, আর বোধ হয় তোমাদের সঙ্গে কখন দেখা হবে না। তোমার বাপের কাছে আমি আট বছর কাজ করেছি, তাঁর অনেক নেমক্ আমি খেয়েছি। আমি গরীব লোক, শোধ দেবার কিছু নেই। কি দিয়ে যে তোমাদের উপকার করবো, তাও জানি না। যতদিন বাঁচবো, আমার বুকের ভিতর এই খোঁচাটাই বিঁধবে, যে, এক-দিন দু ঘণ্টার জন্যে আমি নড়েছিলুম বলে, শালা তোমাদের ঘরে ঢুক্‌তে সাহস করেছিল।"

মেয়েটি বল্লে—"ভগবান ত তাকে যথেষ্ট সাজাই দেছেন, কালীপদ, —সে কথা আর না তোলাই ভাল।"

—"হ্যাঁ, আমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলুম, তাই,—নইলে,—উঃ! এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে! কিন্তু যা চোট্ শালার মাথায় দিছ্‌লুম—"

—"ও কথা একেবারে ভুলে যাও কালীপদ।—বড় সাহেবকে আমা-দের সেলাম দিও, বলো যে, তাঁর দয়াতেই আমাদের ইজ্জৎ বজায় আছে আর পাপীও সমুচিত শাস্তি পেয়েছে। আমরা বাঙালী ঘরের মেয়ে, আমার মা একজন সামান্য কেরাণীর স্ত্রী,—সেই বিদেশে, আর সেই রকম বিপন্ন অবস্থায়, একমাত্র তাঁর দয়া ছাড়া কোন মতেই আমরা সে রাক্ষসের হাত থেকে রক্ষা পেতুম না। বাঙালীর মেয়েদের আত্মরক্ষা

করবার কিছুই ত সম্বল নেই, কালীপদ,—পুরুষরা তাদের বন্দী করেই রেখেছে, আর ত কিছুই শেখায়নি।"

চাপরাসী চলে গেল।

মেয়েটি ফিরে এসে মার কাছেই গালে হাত দিয়ে বসে পড়ে বল্লে —"মা! এইবার ত উঠতে হবে, কলতলায় কাপড়চোপড়গুলো কেচে নাও—পাঁটরীর ভিতর মিছরি আছে একটু সরবৎ করে দিই; কাল থেকে ত কিছুই মুখে দাওনি?"

মা বল্লে—"তুই আগে কাপড় কেচে নে সাবি, আমি এখনই উঠতে পাচ্ছি না।"

সেই সময় শিশির আর তার পিছনে বামা, উপর থেকে নেমে আসছিল, শিশির তখন পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। বামা বলছিল—"ট্রামে খুব সাবধান হয়ে উঠবে বাবা, খুব মাথা ঠাণ্ডা করে সব লিখবে,— শিরোমণি মশায় বাজার গেছেন, একটার সময় সেথায় যাবেন'খন', আমি তাঁর হাতেই জলখাবার পাঠিয়ে দেব।"

নীচে নেমেই স্ত্রীলোক দুটীকে দেখে, শিশির একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তার মনে হল, এরা আবার কারা?

শিশিরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মেয়েটী চোখটা নামিয়ে নিয়ে পাঁটরী থেকে কাপড় বার করতে লাগলো। শিশিরও উঠান পার হয়ে চলে গেল। বামা সদর দোর পর্য্যন্ত তার সঙ্গে গিয়ে, তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলে।

—**—

১২

বামা সেইদিনই এই নীচেকার ভাড়াটে স্ত্রীলোক দু'টির সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলে। তাদের মুখে তাদের করুণ কাহিনী শুনে, তার অন্তর গলে গেল। এবং তখনই তাদের আহারাদির ব্যবস্থা করবার জন্যে নিস্তারকে ডেকে সব বুঝিয়ে দিলে। সে একটা তোলা উনানে আগুন দিয়েই আগে বাজারে ছুটে গেল—কিছু ফলমূল আনবার জন্যে।

উনান ধরতে যেটুকু সময় গেল, তার মধ্যেই বামা একটি একটি করে তাদের সকল কথাই জেনে নিলে।

মার নাম নিস্তারিনী—মেয়ের নাম সাবিত্রী। তাঁরা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। নিস্তারিনী জগদীশচন্দ্র ভাদুড়ীর পত্নী। একমাত্র সাবিত্রী ছাড়া আর সন্তানাদি হয়নি। জগদীশ প্রথমে কোলকেতার মেসে থেকে একটা কোম্পানীর অফিসে খুব অল্প বেতনে কাজ করতেন। তারপর একটু উন্নতি হলেই এই ঘরদু'খানি ভাড়া করে স্ত্রী আর কন্যাকে এখানে নিয়ে আসেন। বছরখানেক পরেই হেড অফিস থেকে তাঁকে তেজপুরের বাগানে বদ্‌লী করা হয়। মাহিনাদি হঠাৎ বেড়ে যাওয়াতে, অত দূর-দেশে যেতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে স্ত্রী-কন্যাকে বাড়াওয়ালার তত্ত্বাবধানে রেখে প্রথমেই সেখানে চলে যান। তারপর ছমাস পরে সেখানকার সঙ্গে ভালরূপ পরিচয় হলে, তিনি এসে সকলকে তেজপুরে

নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোলকেতার বাসা ছাড়েননি, বরাবর ভাড়া জুগিয়ে এসেছিলেন। মাসকতক তেজপুরে থাকতেই কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে জ্বরে ধরলো—এবং সেই জ্বর পাছে শেষে আসামী কালাজ্বরে পরিণত হয়, এই ভয়ে, জগদীশবাবু আবার পরিবারদের কোলকেতায় ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন। দিনকতক চিকিৎসা-তদ্বির করিয়ে, স্ত্রীকে আরাম করে রেখে, তারপর কর্ম্মস্থলে ফিরে যান। সেই থেকে আর তিনি নিস্তারিণী আর সাবিত্রীকে তেজপুরে নিয়ে যাননি। সময় সময় নিজেই এসে দশ পনের দিন কোলকেতায় কাটিয়ে যেতেন। একটা সুবিধাও তাঁর ছিল,—মধ্যে মধ্যে কর্ম্মোপলক্ষে হেড্ অফিসে জগদীশবাবুকে আসতে হত। নারকেলডাঙ্গায় জগদীশবাবুর সম্পর্কে এক ভগ্নী থাকতেন, কিন্তু সেথায় তিনি পরিবারদের রাখেন নি, আর নিজেও বড় একটা যেতেন না। ভগ্নীপতি তিসির দালালী করে' বেশ মোটা টাকা উপার্জ্জন করতেন। জগদীশবাবু গরীব কেরাণী—কাজেই সেখানে তিনি যথাযোগ্য সম্মান পেতেন না, আর তাঁর স্বভাবটা ছিল শিরদাড়া রকমের। ধনী কুটুম্বের তোষামোদ করতে তিনি পারতেন না। নিস্তারিণী দেবীও বেশ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে থেকে মেয়েটিকে মনের মত করে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি অল্পস্বল্প লেখাপড়া জানতেন—সেলাই, বুনন্ প্রভৃতিও জানা ছিল। আর তাঁর রুচি বেশ পরিষ্কার ও মার্জ্জিত ছিল।

গত মাসে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় খবর আসে যে, জগদীশবাবুর বড় বাড়াবাড়ি অসুখ, যদি দেখবার ইচ্ছা থাকে শীঘ্র চলে এস।' অফিসের বন্ধু বান্ধবেরা 'তার' করেছিল। বাড়ীওলাই তাঁদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসেন। সেথা পৌঁছে, কয়েক ঘণ্টা মাত্র স্বামীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা

হয়েছিল। স্বামী মারা গেলে পর, সেখানকার আরও পাঁচজন শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে নিস্তারিণীকে আরও কিছুদিন সেখানে থাকতে হয়েছিল। স্বামীর দেনা-পাওনাও কিছু ছিল, আর বড় সাহেবকে ধরে কিছু সাহায্যের চেষ্টাও তাঁরা করেছিলেন। সর্ব্বসমেত মাস খানেক মা ও মেয়ে সেখানে ছিলেন। বাগানের ভিতরেই জগদীশবাবুর যে কুটীর ছিল, তাইতেই তাঁরা থাকতেন।

বাগানের ভিতর বলতে কেউ যেন মনে না করেন, যে একখানি সাধারণ আম-কাঁটালের বাগান,—সচরাচর যেমন দেখা যায়, এও তাই। চা-বাগানের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নেই, তাঁদের তা ধারণাই হবে না। এক-একটা চা-বাগান অন্যূন দুই তিন মাইল ব্যাপী হয়ে থাকে। কোনটা আবার তার চেয়েও বেশী। তারি মধ্যে স্থানে স্থানে কুটীর আছে, আর দিকে দিকে কুলিবস্তী আছে। জগদীশবাবুর কুটীর সেই রকম এক প্রান্তে ছিল—কাছাকাছি বেশী লোকজন থাকত না; তবে চেঁচিয়ে ডাকলে হাঁসপাতালের লোকেরা শুনতে পেত— কেন না, সেই অঞ্চলে ছিল হাঁসপাতাল, আর দু'চারজন রোগী বা দু' একজন চাকর হামেসাই সেখানে থাকতো। নিস্তারিণী আর তার মেয়েকে দেখবার শোনবার জন্য, পুরোনো চাপরাসী তাঁদের বাসাতে থাকতো। অপরাপর চাকররা অথবা ডাক্তার কি কম্পাউণ্ডার প্রত্যহ সকালে ও বিকালে এসে খবরাখবর নিয়ে যেতেন। একটা মাসের মধ্যে মাকে ও মেয়েকে নিগ্রহ ভোগ করতেও বড় কম হয়নি। সময়ান্তরে সে কথা প্রকাশ হবে।

মোটের উপর দু'চার দিনের মধ্যেই বামার সঙ্গে নিস্তারিণী দেবীর খুবই আত্মীয়তা হল। এমন কি বামা আপনা হতেই বলে দিলে,

আলাদা রান্নাবান্না করতে আমি এখন দেব না। তোমরা বাছা যে ধাক্কা খেয়েছ—দিনকতক সামলাও—তারপর নিজেদের ব্যবস্থা করবে তখন।

সাবিত্রী অল্পদিনের মধ্যেই খুব বুঝে পড়ে নিলে। সে-ই সব যোগাড় দিত, আর বামা রাঁধতো। নিস্তারিণী বড় একটা কিছু করতো না, আর সাবিত্রীও মাকে কিছু করতে দিত না।

যে ক'দিন শিশিরের পরীক্ষা ছিল, সে ক'দিন সে আপনার পড়ার ঘর আর 'দ্বারভাঙা বিলডিং' ছাড়া কোনও কিছুতেই মন দেয় নি। তবে ইদানীং সে দেখতে পেত, তার অনেক কাজ ওই মেয়েটি করে দিয়ে যায়। বামার কাছে সে মেয়েটির সব বৃত্তান্ত শুনেছিল, কিন্তু আপনা হতে একদিনও সে তার সঙ্গে কথা কইবার অবসর পায়নি। কেবল দেখতো, মেয়েটি খুব ধীর ও শান্ত, খুব সংযতভাবে থাকে, আর মুখ বুজে আপনার কাজ করে যায়। তার মা কোন কিছুতেই নেই—একপাশে বসে বা শুয়ে থাকেন, প্রায় সকল সময়ই তাঁর চোখে জল দেখতে পাওয়া যেত। সর্ব্বদাই ম্লান মুখে, উদাস নেত্রে একদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যেন কার চিন্তায় বিভোর হয়ে কালযাপন করছেন।

এক্‌জামিন হয়ে যাবার দিনকতক পরে একদিন বামা বল্লে,—"হ্যাঁ রে খোকন, তুই কি রকম ছেলে বল তো? তোর রকম-সকম দেখে আমার হাসিই পায়।"

অবাক হয়ে শিশির বল্লে—"কেন আমি কি করেছি?"

—"এতদিন খেটে-খুটে পরীক্ষেটা দিলি, এইবার তো মানুষে একটু হাঁফ ছেড়ে কথাবার্ত্তা কয়, দুটো আমোদ-আহ্লাদ করে, তা নয়—সেই

ঘরের কোণটি ছাড়া, আর কি কোথাও ঠাঁই নেই? একটু বেড়িয়েও কি লোকে আসে না?"

—"ও! তাই বল, আমার যা ভাবনা হয়েছিল। তোমার কথা শুনে আমি মনে করছিলুন, না জানি কি দোষই আমি করিছি!"

—"দোষ আবার করবি কি রে? আমি তোকে একটু বেড়াতে-চেড়াতে বলি। এই যে এমন কোলকেতা সহর—কত দেখবার-শোনবার জিনিস চারদিকে রয়েছে, তা কিছুই দেখবি না?"

—"আচ্ছা, আজ থেকে বেড়াতে যাব। পথে না ভিড় "

—"তারপর ওই যে তোর সমবয়সী একটা মেয়ে এত দিন দেখা রয়েছে—তোর কত কাজ করে দিচ্ছে, বই গুছিয়ে রাখছে, জামা কাপড় বার করে বোতাম পরিয়ে ঠিকঠাক করে রাখছে, তার সঙ্গে আজও একটা কথা কইতে তোর অবকাশ হল না।"

—"কথা ক'বার ত তেমন দরকার হয়নি, নইলে কইতুম।"

—"দরকার আবার হবে কি রে? এক বয়সী খেলুনীর মত, কত ভাব-সাব হ'বার কথা। তোর যেন সবই উল্টো ছিরী।"

—"বেশ যা হোক। আমার আর খেলুনী কে কবে ছিল, যে খেলুনীর সঙ্গে ব্যাভার করতে শিখবো? চন্দনপুরের বাড়ীতে কেউ কখনও এসেছে, না তোমরা কারো সঙ্গে মিশতে দিয়েছ? ধরতে গেলে তুমি ছাড়া কথা ক'বার কেউ মানুষই ছিল না—কেবল তোমাকেই জানতুম। ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়ে, তবে তো পাঁচজন ছেলের সঙ্গে জানা-শোনা হয়েছিল? তা আমি বড় লোকের ছেলে বলে সহজে কেউ

আমার দিকে ঘেঁসতো না। আর আমিও সাধারণের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতাম।"

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সাবিত্রী বামাকে বল্লে—"মাসীমা, রাস্তায় শিশির বাবুকে কে ডাকছে।"

শিশির হো হো করে হেসে উঠে বল্লে—"এই দেখ, সমবয়সী খলুনীরা বুঝি আমায় শিশির—'বাবু' বলে ? তা হ'লেই আমাকেও বলতে হবে—"আপনি—মশাই—আজ্ঞে—আসুন" —বলেই সে সাবিত্রীর মুখের দিকে চাইলে।

সাবিত্রীর মুখটা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। সে তাড়াতাড়ি চলে যাবার জন্যে পিছন ফিরতেই, বামা তার হাতটা ধরে ফেলে বল্লে—"শিশির ত ঠিক কথাই বলেছে। সত্যিই ত তোমরা ভাইবোনের মতন কথাবার্ত্তা কইবে,—এক বয়সী তোমরা—এ কি ? অমন করে কি আড়ষ্ট হয়ে থাকতে আছে মা ?"

সাবিত্রী সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বামার বুকে মুখটা লুকিয়ে আস্তে আস্তে বল্লে—"বাইরে অনেকক্ষণ কে ডাকছে।"

শিশির তাড়াতাড়ি রাস্তার দিকের বারান্দায় বেরিয়ে রেলিংএর উপর থেকে মুখটা বাড়িয়ে দেখেই, ফিরে এসে বল্লে—"মা, আমার একজন বন্ধু এসেছে—এখানকার বন্ধু,—একসঙ্গে এক্‌জামিন দিয়েছি।"

বামাকে আজকাল শিশির শুধু 'মা' বলেই ডাকতো।

বামা বল্লে—"বেশ তো, তা যা না, উপরে ডেকে আন্ না ?"

—"আচ্ছা" বলেই শিশির নীচে নেমে গেল। তার পর বামা সাবিত্রীকে বল্লে—"আজ থেকে কিন্তু তোমরা দুজনে কথাবার্ত্তা কইবে

বলে রাখলুম। কেমন, ভাব হল ত? চল দিকি কে শিশিরের বন্ধু দেখিগে। একটু চা আর জলখাবার তৈরী করতে হবে। উনানে আগুন আছে ত?"

সাবিত্রী বল্লে—"আছে—চা'এর জল চড়িয়ে দেব?"

বামা বল্লে—"হ্যাঁ, আর দুটি ময়দাও মাখগে, আমি যাচ্ছি। খান-কতক লুচি ভেজে দেব'খন।"

সাবিত্রী সিঁড়িতে জুতার শব্দ হ'তেই সে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। সাবিত্রী চলে যেতেই একটী ছোক্‌রাকে সঙ্গে করে শিশির সেইখানে এসে বামাকে বল্লে—"মা, এর নাম নলিনী—নলিনী গুপ্ত, আমার বন্ধু। নলিনী,—এই আমার মা। এঁর কথাই তোমায় বলেছিলাম।"

নলিনী বামাকে প্রণাম করলে। বামা দাড়ী ধরে' চুমো খেয়ে বল্লে—"এস বাবা, তুমিও আমার ছেলে, রোজ রোজ এসো।"

বামার বুকের মধ্যে তখন আনন্দের তুফান তোলপাড় করে উঠেছিল। শিশির তাহলে উপরোধে 'মা' বলে না,—অপরের কাছেও মা বলে পরিচয় দেয়। তার পর নিজেকে সংযত করে নিয়ে বল্লে—"যাও বাবা, তোমরা পড়বার ঘরে বসে গল্প করগে, আমায় না জানিয়ে কিন্তু যেতে পাবে না।'

নলিনী বল্লে—"যে আজ্ঞে। আমি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাক্‌বো। হ্যাঁ হে, তোমার সেই পণ্ডিত মশাই—শিরোমণি মশাই কোথায়?"

শিশিরের হয়ে বামাই জবাব দিলে—"দু' এক দিনের জন্যে তিনি

চন্দনপুরে গেছেন বাবা, শীগগীরই আসবেন। সেখান থেকে অনেক-দিন কোনও খবর আসেনি বলে তিনি সেখানে গেছেন।"

এই বলেই বামা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলে গেল। আর শিশির নলিনীকে নিয়ে তার পড়বার ঘরে গিয়ে বসলো।

১৩

কোলকেতা থেকে বাড়ী ফিরে, অমিয়বাবু যখন অন্দরে ঢুকলেন, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সমস্ত বাড়ীখানার মধ্যে বিরাজী আর শম্ভুর মা ছাড়া যেন আর কেউ নেই, এমনি মনে হল। তিনি উপরে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে দেখলেন, চারিদিকেই অগোছাল, আর সব এলো-মেলো হয়ে পড়ে আছে। খাটের উপর তাঁর নিজের বিছানাটা ওল্টান রয়েছে, তাতে একরাশ ধুলো জমে আছে, যেন কতদিন সে সবে হাত পড়েনি। এই সব দেখে তিনি ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছেন, এমন সময়ে বুধুয়া চাকর ঘরে বাতি দিতে এল।

তাকে ডেকে অমিয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"হ্যাঁ রে বুধুয়া, এরা সব কোথায়—এখনও কাপড় কাচা হয়নি না কি ?"

বুধুয়া খানিকটা ফ্যালফেলিয়ে বাবুর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে, বল্লে —"বহুমার বাৎ পুচছে হুজুর ?"

—"হ্যাঁ রে—সে কোথায় ?"

—"বহুমা ত ইখানে নোই আছে। ও ত আজ দশরোজ হিঁয়াসে চলা গেইল্ বা।"

—"আরে মলো, চলা গেইল বা কি বল্ ? কোথায় গেছে ?"

—"হুই বাপকা কোঠিমে হুজুর।"

—"বাপের বাড়ী ? অমিয়বাবু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—কে নিতে এসেছিল ?"

—"বাপ মা দোনো একাট্ঠা আয়েথি হুজুর। ঢিঁয়া দো রোজ ঠায়েবকে তব বহুমাকে লে কর্ চলা গিয়া। উও বিরাজী সব কুছ জানতা—উওভি সাথমে গিয়েথি। হাম্ উসি কো বোলায় দেতে—"

অমিয়বাবু একটু শুষ্ক ও নীরস কণ্ঠে বল্লেন—"না, ডেকে দিতে হবে না. তুই এখন যা।" বুধুয়া চলে গেলে তিনি একখানা হাতপাখা নিয়ে, আরাম-কেদারায় শুয়ে পড়ে আপনা-আপনি বাতাস খেতে লাগলেন। অনন্তর হঠাৎ এই রকম তাঁর বিনা অনুমতিতে বাপের বাড়ী চলে যাবার কারণটা তিনি মনের মধ্যে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। একটু ভেবেই তাঁর মনে হল—এটা আমার ওপর আক্রোশ ছাড়া আর কিছুই নয়। —অভিমান ঠিক বলতে পারা যায় না। তাহলে আমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত বাড়ীতেই সে থাকতো। অন্ততঃ আমার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ নেবার চেষ্টা করতো। কিন্তু এই ঔদ্ধত্য আমার কর্তৃত্বের, স্বামীত্বের অবমাননা করা। আচ্ছা যাক। এই পর্য্যন্ত ভেবেই তিনি মনটাকে অন্য দিকে ফেরাতে চেষ্টা করলেন।

দরজার গোড়ায় ঠাকুর এসে জিজ্ঞাসা করলে—"বাবুর জন্যে কি লুচির ব্যবস্থা করবো ?"

অমিয়বাবু বল্লেন—"না, চারটি ভাত খাব, বড় গরম পড়েছে।"

—"যে আজ্ঞে" বলে ঠাকুর সেখান থেকে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই, তাকে ডেকে অমিয়বাবু বল্লেন—"নাইবার ঘরে জল দিতে বলে দিও ত ঠাকুর, আমি গা হাত গুলো ধুয়ে ফেলবো।" বলেই একটু চুপ

করে থেকে আবার বল্লেন—"হ্যাঁ ভাল কথা, শোনো, ওরা—আমার শ্বশুর আর শাশুড়ী কদ্দিন এখানে ছিলেন?"

—"আজ্ঞে দিন দুই হবে।"

—"তাঁরা কি তাঁদের মেয়েকে নিতেই এসেছিলেন?"

—"তা তো বলতে পারি না বাবু। একদিন এই বেলা তিনটে কি চারটে হবে, তাঁরা দুম করে এসে পড়লেন। গিন্নী মা।"

—"কে গিন্নীমা?"

—"আজ্ঞে আমাদের গিন্নীমা,—তাঁদের গাড়ী এসে থাম্‌তেই, ওপর থেকে নেমে এলেন। তাঁরা বাড়ীতে এসেই বল্লেন—আপনার শাশুড়ী হুজুর, তাঁর মেয়েকে বল্লেন—কি রে কি হয়েছে, চিঠি দিছিস্‌ কেন?"

অমিয়বাবু একটু চেঁচিয়ে বল্লেন—"যাও আর বলতে হবে না। যাও—যাও এখান থেকে—"

ঠাকুর অমিয়বাবুর গলার আওয়াজে হ্যাবাচ্যাকা মেরে গিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল। সে বুঝতে পারলে না, যে, তাকে নিজেই সব কথা জিজ্ঞাসা করে আবার এমন ধমক্‌ দেবার কারণ কি। সে নেমে এসে বিরাজীকে ডেকে বাবুর নাইবার জল দিতে বল্লে।

খানিক পরে উপর থেকে অমিয়বাবু হেঁকে বল্লেন—"ওরে কে আছিস্‌, বাইরে থেকে গোপেশ্বরকে একবার ডেকে দেত।" তার পর গোপেশ্বর এসে প্রণাম করে দাঁড়াতেই, তার দিকে চেয়ে অমিয়বাবু বল্লেন—"কি হে, তোমার যে টিকিটি পর্য্যন্ত দেখবার যো নেই। তিন হপ্তা পরে বাড়ীতে এসে এতক্ষণ ধরে বসে রইলুম—"

গোপেশ্বর মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বল্লে—"আজ্ঞে এই ত আমি আদালত থেকে ফিরছি—এখনও ত হাত-পা ধুইনি—"

—"কেন—আদালতে কি জন্তে গেছলে?"

—"আজ্ঞে নটবর হাজরার নামের ডিক্রীটা জারী করবার দিন ত বেশী বাকী নেই, তাই—"

—"দিন বাকী নেই—তা এতদিন নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলে না কি?"

—"আজ্ঞে আমি আনচান করছি—আপনি না এলে আমি নিজের হাতে করতে ত পারি না। তাই সময়টা জান্তে গিছলুম। তা এখনও পাঁচদিন আছে, উকিলবাবু বল্লে।"

—যাক্ ও কথা। এখন একটা কথার জবাব দাও দিকি।"

গোপেশ্বর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞসা করলে—"কি কথা বাবু?" সে অমিয়-বাবুর আজকের ভাব দেখে কেমনতর ঘেবড়ে গিছলো।

বুধুয়া সেই সময় তামাক সেজে গড়গড়ায় চাপিয়ে, কল্কেয় ফুঁ দিতে দিতে ঘরে ঢুকছিল, তাকে দেখে অমিয়বাবু বল্লেন—"কে তোকে এখন তামাক আন্‌তে বল্লে?—যা এইখানে রেখে যা। তার পর শোন দিকি গোপেশ্বর"—

—"আজ্ঞে করুন বাবু—"

—"বল্‌তে পার, এই যে আমার বাড়ীটা, যাতে তোমরা এই এত-গুলো লোক রয়েছ—আমার মাইনে খাচ্ছ, তাতে তিনশো প'য়ষট্টি দিনই ক আমাকেই আগলে বসে থাকতে হবে? আমার কি এই বাড়ী থেকে কোথাও নড়বার একার নেই? দশ দিন আমি এখানে না থাকলে চোর-

ডাকাতে যদি বাড়ীর সর্ব্বস্ব লুটে নে যায়—তা থেকে রক্ষা করবার তোমাদের কি কিছু মুরোদ নেই ?"

গোপেশ্বর অতিরিক্ত মাত্রায় বিস্মিত হয়ে বাবুর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—"কি জন্তে এ সব কথা বলছেন বাবু—আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না ! চোর-ডাকাত কোথায় এল ?"

—"আমি যে দিনে কোলকেতা যাই—তোমার উপর আমার বাড়ীর সমস্ত চার্জ্জ দিয়ে গিয়েছিলুম। তুমি গোমস্তা নও, ম্যানেজারের মতন আমার আমমোক্তার নামা নিয়ে সব কাজ করছো—কিন্তু—"

—"আমার কোনই ত ক্রটি হয়নি বাবু।"

—"আমার অনুপস্থিতিতে বাড়ীর গিন্নী যে চলে গেল, তুমি আমাকে সে খবর দিয়েছিলে ?"

—"তিনি বাপের বাড়ী গেছেন বাবু।"

—"সে যেখানেই যাক, সে কথা হচ্চে না, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছি—তুমি প্রায় প্রত্যহই একখানা করে চিঠি আমায় দিতে, কিন্তু এ খবরটা দিছলে কি ?"

—"না বাবু, তা দিইনি। আমার উপর যা ভার দেওয়া আছে, বিষয়-সম্পত্তির কথাই—যা আপনাকে জানানো উচিত, সেই সবই লিখেছি। কিন্তু বাবু, গিন্নীমার সম্পর্কে তিনি কবে বাপের বাড়ী গেলেন কি এলেন—সে কথায় আমার কথা কওয়া কি করে হতে পারে বাবু ? আমি আপনাদের হুকুমের চাকর।"

অমিয়বাবু বিরক্তির সঙ্গে বল্লেন—"তা বলে খবরটা পর্য্যন্ত আমাকে

দেবে না? আমি বাড়ীতে নেই, ধর, তার যদি একটা কঠিন ব্যারামই হঠাৎ হত, তাহলে কি করতে?"

—"তখনই আপনাকে টেলিগ্রাম করে জানাতুম, আর চিকিচ্ছের সব বন্দোবস্ত করে ফেলতুম, সে কি কথা হুজুর!"

—"আমার বিনা অনুমতিতে এ বাড়ী থেকে একটা বেরাল-কুকুর কি একগাছা কুটো পর্য্যন্ত এবার থেকে নড়বে না জেনে রেখ। আমি যখন এখানে থাকবো না তখন, যতক্ষণ না, তুমি আমার মত আনাবে, ততক্ষণ কেউ কোথাও যেতে পাবে না—এই কথাটা মনে করে রেখে দিও—"

—"গিন্নীমার বেলাও সেই হুকুম?"

—"হ্যাঁ, সকলের বেলা। তোমার গিন্নীমা কি পীর না কি?" এই বলে অমিয়বাবু গড়গড়ার নলটি মুখে তুলে নিলেন।

গোপেশ্বর খানিক উসখুস করে শেষে জানালে,—"এখন তবে যেতে পারি কি?"

অমিয়বাবু সে কথা যেন শুনতেই পাননি এমনি ভাবে চুপ করে গড়গড়া টানতে লাগলেন। তার পর হঠাৎ গোপেশ্বরের দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—"যেদিন এরা যায়, তোমায় কিছু বলে গেছলো—আমায় খবর দিতে বা আর কিছু?"

গোপেশ্বর বল্লে—"না বাবু, তেমন কোন কথা বলে পাঠাননি। সকালবেলা বিরাজ এসে আমায় জিজ্ঞাসা করলে, গিন্নীমা শ' দুই টাকা চান্ এখনই দিতে পারবো কি না। তা আমার কাছে তখন দুশো টাকাই ছিল, পঞ্চাশ টাকা রেখে, দেড়শো বাড়ীর ভিতর পাঠিয়ে দিলুম।"

—"কার হাত দিয়ে পাঠালে ?"

—"বিরাজের হাত দিয়েই।"

—"কোনও রসিদ রেখেছো।"

—"হ্যাঁ, গিন্নীমা সই করে দেছেন।"

—"আচ্ছা, এখন তুমি যেতে পার।" এই বলে অমিয়বাবু চোখ বুজে গড়গড়া টানতে লাগলেন।

গোপেশ্বর বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। সে প্রায় পনর বছর এখানে চাকরী করছে, কিন্তু অমিয়বাবুকে এ রকম চঞ্চল হতে সে কখনও দেখেনি। এমন কি, তাঁর প্রথমা স্ত্রী যেদিন মারা গিয়েছিল, সেদিনও এতটা চাঞ্চল্য ছিল না—মেজাজও এতটা রুক্ষ হয়নি। এই রকম ভাবতে ভাবতে গোপেশ্বর সদরবাড়ীতে চলে গেল। গোপেশ্বর চলে যাবার খানিক পরে, ঠাকুর এসে বাবুকে জানালে—"নাবার জল অনেকক্ষণ দেওয়া হয়েছে, রান্নাও প্রস্তুত।"

—"আচ্ছা, চল" বলে অমিয়বাবু কাপড়চোপড় ছাড়তে পাশের ঘরে ঢুকলেন।

———

১৩

প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করেই অমিয়বাবু শম্ভুর মাকে ডেকে প্রস্তুত হবার আদেশ দিলেন, বল্লেন—"আমি চিঠি লিখছি, তোমাকে সেই চিঠি নিয়ে এখনই লোকনাথপুরে গিয়ে ওদের আন্‌তে হবে। আস্তাবলে ঘোড়া জোতা হচ্ছে—কুন্দন সিং আর তুমি যাবে।"

শম্ভুর মা' তখনই কাপড় চোপড় ছেড়ে তৈরী হয়ে এল।

সদরবাড়ীতে গিয়ে গাড়ীতে ওঠবার সময় অমিয়বাবু তাকে বলে দিলেন—"দেখো, চিঠি পেয়ে যদি তারা কোন ওজর আপত্তি করে, তাহলে তখনই গাড়ী ফেরাতে বলবে—যেন সেখানে এক ঘণ্টার বেশী দেরী না হয়।" দরোয়ান কোচমানের প্রতিও আদেশ দিয়ে, তিনি কাছারীতে বসে নিশ্চিন্ত মনে জমাদারীর কাজকর্ম দেখতে লাগলেন।

নকুড় আচায্যির বাড়ী যখন গাড়ী গিয়ে পেঁছিল, তখন অনঙ্গ সবে মাত্র স্নান করে উঠে ভিজে কাপড়েই উঠোনে দাঁড়িয়ে মাথার চুল পুঁছ-ছিল। শম্ভুর মা এসে দাঁড়াতেই অনঙ্গ বল্লে—"কি গো শম্ভুর মা—হঠাৎ কি মনে করে?"

শম্ভুর মার অনেক বয়স হয়েছে, কাজে কাজেই কানে একটু কম শোনে, আর বোধ হয় সেই জন্যই একটু বেশী কথা কওয়া তার রোগ, সে বল্লে—"আর কি বলবো বৌমা—বাবু কাল এসে ইস্তক একবার

আগুনে পড়ছে আর একবার জলে পড়ছে। কার বাপের সাধ্যি কাছকে ঘেঁসে। এই নাও 'নেখোন' নাও—কাপড় চোপড় প'রে তৈরি হও. গাড়ী এয়েছে।"

অনঙ্গ ভিজে হাতেই চিঠিখানা নিয়ে পড়লে—তাতে মাত্র দু'ছত্র লেখা আছে—অনঙ্গর উদ্দেশেই লেখা।

—"পত্র প্রাপ্তি মাত্রেই তুমি চন্দনপুরের বাড়ীতে চলে আসবে. আমার বিনা আদেশে পিত্রালয়ে যাওয়া কোনও মতে তোমার উচিত হয় নি।"

—"কি লা অনি! কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস্?" বলতে বলতে সিদ্ধেশ্বরী ঘরের ভিতর থেকে সেখানে এসে হাজির হ'ল। তারপর শম্ভুর মাকে দেখেই বল্লে—"তুমি জামায়ের বাড়ী থাক না?"

—"হিঁ গো মা, আমি সেখান থেই আসছি।"

অনঙ্গ বল্লে—"কোলকেতা থেকে কাল এসে আমার যাবার জন্ত চিঠি দেছেন—" এই বলে সে চিঠিখানা মার হাতে দিয়ে কাপড় ছাড়তে ঘরের ভিতর চলে গেল। সিদ্ধেশ্বরী চিঠিটা পড়েই বল্লে—"ওমা, নেক্‌বার ছিরি দেখ। 'এস' বল্লেই কি অমনি আসা যায় না কি? বলো, কর্ত্তা ঘরে নেই—"তিনি আসুন—"

শম্ভুর মা জিজ্ঞাসা করলে—"তিনি কোথায় গেছে?"

—"কি জানি বাছা, কোথায় তাগাদা-পত্তরে গেছে।"

—"এখনই আসবেন ত?"

—"তা কেমন করে বলবো?"

—"তা' তিনি যখনই কেন এসুক না, এক ঘণ্টার বেশী আমি থাকব

না বাছা—তা বলে দিচ্ছি। ও বৌমা, কাপড় চোপড় পরা হল ? —"

অনঙ্গ বাইরে এসে বল্লে—"চেঁচিও না, চুপ কর! উঠে এসে বসো। আর কে এসেছে ?"

—"আবার কে আসবে—ওই কুঁদো দরোয়ানটা এয়েছে, আর গাড়োয়ান মিন্সে। তাদের কাকেও নয় গো বৌমা—আমারেই ডেকে বাবু বল্লে—'যাও তো শম্ভুর মা, আমি 'নেকোন' দিচ্ছি, ওনাদের নে এস। এক ঘণ্টার বেশী থাকবে না—অমনি গাড়ী ঘুইরে নে আসবে, —নইলে কি আমার সাধ বৌমা, যে, না দু'দণ্ড বসি—না দুটো কথা কই —একটু ছেবৃমো কাটাই ?"

সিদ্ধেশ্বরী বল্লে—"তা' বেশ করেছ। এখন বসো, চান্ টান্ কর, খাও দাও, যেতেই যদি হয়, ওবেলা যেও।"

অনঙ্গ ডাকলে—"মা"—

মেয়ের দিকে চেয়ে সিদ্ধেশ্বরী দেখলে, অনঙ্গ ইসারা করে কথা কইতে বারণ করছে। তাই দেখে সিদ্ধেশ্বরী মেয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কি লো, কি বলছিস্ ?"

অনঙ্গ বল্লে—"আমি এক্ষুনি যাব।"

সিদ্ধেশ্বরী বল্লে—"সে আবার কি কথা ?"

—"চিঠিখানা পড়ে বুঝলে না—তিনি কি রকম রেগে গেছেন !"

—"তা হলেই বা, তা বলে একবেলা দেরী করলে কি আর এমন দোষ হবে ?"

মা আর মেয়ের কথা শম্ভুর মা শুনতে পায় নি। সে আবার বলতে

লাগলো—"কত দেরী হবে গো বৌমা? এক ঘণ্টা হয়ে গেল যে—"

সিদ্ধেশ্বরী বল্লে—"মাগী কালা না কি? অত চেঁচিয়ে কথা কয় কেন?"

অনঙ্গ বল্লে—"ও ওই রকমই। কিন্তু খুব ভাল মানুষ। যাক্—তুমি প্যাঁড়াটা গুছিয়ে দেবে চল।"

মুখটা ভার করে সিদ্ধেশ্বরী বল্লে—"এতটাই যদি ভয়, তবে চিনি নিকে আস্‌তে গেছলি কেন? সেখানে থাক্‌লেই ত হত? আজ যদি তুই না যাস্ তাহলে দুদিন পরে জামাই নিজে আস্‌বে, তা দেখে নিস্—তখন জানবি তোর মা ঠিক্ কথা বলেছিল কি না।"

অনঙ্গ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সিদ্ধেশ্বরী বলতে লাগলো—"ও সব রাগ টাগ আমি জানি। এক কথায় সব ঠাণ্ডা জল হয়ে যাবে। কিন্তু তুই যদি আজ ভয় পাস্, তাহলে সব ভেস্তে যাবে—তোর এখানে চলে আসার কোন ফলই হবে না। আর সেই মাগীকেও জব্দ করা হবে না, তা বলে রাখলুম।"

অনঙ্গ একটু যেন সজাগ হয়ে উঠলো—বল্লে—"সে তো এখানে নেই?"

—"আজ যেন নেই,—কিন্তু আসতে কতক্ষণ? আর কোলকেতায় ত রয়েছে।"

—"সে যদি কোলকেতায় থাকে মা, আমার তাতে ক্ষতি কি?"

—"জামাই যখন তখন সেখানে যাবে। ছেলে পর্য্যন্ত রইল তার কাছে, ক্ষতি আর কি। শলা পরামর্শ দিয়ে ত সঙ্গে করে নিয়ে গেছলো,—"

—"আটকে রাখতে ত পারে নি ?"

—"সেই জন্তেই ত বলছি। তুই এই সময় একটু শক্ত হলে, দেখবি ওই জামাই তোকে ফেলে আর যেতেই চাইবে না।"

—"আমি তোমার কথা ভাল বুঝতে পারছি না মা। আমার মনে হচ্ছে, আমায় নিতে পাঠিয়েছে, আমি যদি না যাই—"

—"নিজে তখন তোকে নিতে আসবে।"

—"আর যদি রেগে গিয়ে মোটে না আসে ? একেবারে ত্যাগ করে ?"

—"কক্ষনো না। অমনি ত্যাগ করবে ? তাহলে তোকে বে'ই করতো না। এই আমার কথা লিখে রেখে দে। ত্যাগ করবার ধাত আলাদা।"

অনঙ্গ অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তার মধ্যে শম্ভুর মা আবার একবার তাড়া দিয়ে বল্লে—"ঘরের মধ্যে তোমরা কি করছো গো ? কতক্ষণ দেরী হবে ?"

সিদ্ধেশ্বরী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লে—"কেন চেঁচাও বাছা—লোকে শুনলে কি বলবে ? এবেলাটা থাক, খাও-দাও, উনি ঘরে আসুন, তাঁকে না জানিয়ে কি মেয়ে পাঠাতে পারি ?"

শম্ভুর মা দমে গেল। সে ভয়ে ভয়ে বল্লে—"না মা ঠাকরুণ, আমি আমার বাবুর হুকুম অমান্যি করতে পারব না। হয় না হয়, তুমি দরোয়ানকে ডেকে জিজ্ঞাসা করো, বাবু বলে দেছে,—যদি কোন ওজর আপত্তি করে, তখনই গাড়ী ঘুইরে নে আসবে। যেন এক ঘণ্টার বেশী দেরী না হয়। হয় না হয় তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করো।"

সিদ্ধেশ্বরী বেশ মোলায়েম কণ্ঠে পরিষ্কার ভাষায় বল্লে—"সে তো ঠিক্ কথা বাছা, তুমি কি মিছে কথা বল্ছো, না তোমায় আমরা অবিশ্বাস করছি? তবে কি জান, এই ঠিক্ দুকুর বেলা গেরস্ত বাড়ী থেকে কি মেয়ে পাঠাতে পারে, না পাঠাতে আছে? অকল্যাণ হবে যে। একান্তই যদি তুমি না থাকতে পার, কি আর বলবো বাছা—"

শম্ভুর মা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, বল্লে—"বৌমা কি এখন তা হলে যাবে না?"

গলার স্বরটি আরও একটু নরম করে সিদ্ধেশ্বরী উত্তর দিলে—"যাবে বৈ কি, সে কি কথা! তার ঘর, তার বাড়ী, সেখানে যাবে না ত যাবে কোথায়? তুমি জামাইকে একটু বুঝিয়ে ব'ল তো, তিনি যেন ঠাণ্ডা হয়ে কথাটি বোঝেন।"

—"তাহলে কি বলবো?"

—"বলবে—তাঁর জিনিস তিনি নে যাবেন, এর আর বেশী কথা কি। তবে একটু দিনক্ষণ দেখে নে যাওয়াই উচিত, নইলে গেরস্তর অমঙ্গল হয়। তোমারও ত অনেক বয়েস হয়েছে, তোমায় আর বোঝাব কি?"

শম্ভুর মা শেষ পর্য্যন্ত শুনে বল্লে—"অত কথা বাবুর সামনে দাঁইড়ে আমি বল্তে পারবো নি বাছা, তিনি রেগে টং হয়ে আছে, কাল থেকে। আমি শুধু বলবো, তারা পাঠালে নি।" এই বল্তে বল্তে গজ্ গজ্ করতে করতে শম্ভুর মা চলে গেল।

সে যাবার পর অনঙ্গ বল্লে—"কাজটা কি ভাল হল মা?"

সিদ্ধেশ্বরী বল্লে—"তুই পরে বুঝবি। দেখিস্ তখন আমার কথা।"

*   *   *   *   *

চন্দনপুরের কাছারী-ঘরে তখন বৃন্দাবন নস্কর অমিয়বাবুকে বলছিল —"তাহলে আমরা ক'ঘর প্রজাই মারা যাব হুজুর। গত সনে বর্ষায় নদীর জল ঢুকে সারা মাঠখানা ডুবে গেছলো, একটি ফসল কেউ চোখে দেখতে পায় নি। এবারেও যদি তাই হয়, তাহলে পেটেই বা খাব কি —আর আপনাকেই বা দেব কি?"

অমিয়বাবু বল্লে—"অন্যায় আবদার বাবু, তোমাদের। একটি পাকা বাঁধ দিতে খরচা কত জান কি?"

—"তা আমরা কেমন করে জানবো হুজুর? আপনারাই বাপ-মা, আমরা সন্তান, আমাদের রক্ষে ত করতে হবে? ফি সনে অঘ্রানের শেষ পর্য্যন্ত জমী যদি পড়েই রইল, তবে চাষ আবাদ হয় কোত্থেকে? আর নয় তো রেহাই দিন, ডাঙার জমি আমাদের দিয়ে, নাবাল জমি আর কারেও বিলি করুন।"

গোপেশ্বর বল্লে—"তা হয় না! পাঁচ বছরের জন্যে নিয়ে এই ত সবে দুটো বছর আবাদ করেছ। তোমরা ছেড়ে দিলে এখনই কে তা নিতে আসছে বাবু? আর ডাঙার জমিই বা পাব কোথা—অপরে তা ছাড়তে রাজী হবে কেন?"

বৃন্দাবন নস্কর বল্লে—"তাহলে গলায় ছুরী দিন না, গোমস্তা মশাই? খাজনাও রেহাই করবেন না, মোটা টাকা ছেলামীও নিয়েছেন,—তার পর বাঁধও দেবেন না, এ কেমনতর হল? আচ্ছা তবে এক কাজ করুন—"

অমিয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কি বলতে চাও বল?"

বৃন্দাবন বল্লে—"কবুলতি পাল্টে, ওটা আমাদের দশ বছরের করে নিন—কিন্তু ছেলামী আর একটা পয়সাও দেব না; কিছু টাকার সাহায্য কাছারীর থেকে করুন, আমরা বেগার যতটা পারি দিয়ে, যাহোক তাহোক একটা কাঁচা বাঁধ দিয়ে নিই। তাতে আমাদের বরাতে যা হয়, তা হোক্।"

গোপেশ্বর বল্লে—"তা কি হয়? ছেলামী যদি মকুব করতে হয় তাহলে আবার ঘর থেকে টাকা দেব কেন? এক তো মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে চাচ্ছ।"

অমিয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কতটা বাঁধ দিতে হবে হ্যাঁ বৃন্দাবন?"

—"আজ্ঞে তা অনেকটা হুজুর—পোটাক পথ হবে। হুজুর যদি এক দিন যান, নিজের চোখে আমাদের অবস্থাটা দেখে আসেন। আমরা হুজুরের অনেক দিনের প্রজা, ও জমিটা হালে নিয়েছি বটে, আরও জমি রাখি।"

একটু ভেবে নিয়ে অমিয় বাবু বল্লেন—"আচ্ছা আমি এখন কথা দিতে পারি না, একটু ভেবে দেখবো—"

বৃন্দাবন তখন হাত যোড় করে বল্লে—'বেশী দেরী করলে চলবে না হুজুর!"

—ঠিক সেই সময় সদর দরজায় গাড়ী এসে থামলো। অমিয় বাবু মুখটা বাড়িয়ে দেখলেন, শুধু শম্ভুর মা গাড়ীর ভিতর হতে নামলো।

বাইরে কে একজন জিজ্ঞাসা করলে—"শম্ভুর মা চেঁচিয়ে জবাব দিলে—"আসবে নি তা' কি করবো। বেলা বারোটা পর্য্যন্ত বসিয়ে রেখে, বলে—দিন দেখি—ক্ষ্যান দেখি। বাপরে বাপ!"—

—গোপেশ্বর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে বল্লে—"যাও, বাড়ীর ভেতর যাও শম্ভুর মা। কাছারীর সামনে চেঁচিও না।"

অমিয়বাবু ঘাড় হেঁট করে একখানা তমসুক দেখছিলেন।

বৃন্দাবন নস্কর একটু অগ্রসর হয়ে, সাহস করে বল্লে—"তাহলে এ গরীবদের কি হবে হুজুর—?"

তমসুকের ওপর থেকে চোখ তুলে অমিয়বাবু বল্লেন—"কিসের কি হবে?"

—"ওই বাঁধটার—বর্ষা এসে পড়বে—"

—"বর্ষা এসে পড়বে ত আমার কি? আঃ কি জ্বালা! একশোবার ঘ্যানোর ঘ্যানোর! গোপেশ্বর—গোপেশ্বর!"

—"আজ্ঞে" বলেই তাড়াতাড়ি গোপেশ্বর এসে ঘরে ঢুকলো!

—"এই হারামজাদা পাজী ব্যাটাদের বিদেয় করে দাও না। আমাকেই যদি সব আর্জ্জী শুনতে হবে, তাহলে তুমি কি ঘোড়ার ঘাস কাটতে আছ?"

বৃন্দাবন নস্কর আর তার দলবল অবাক হয়ে অমিয়বাবুর দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল। অমিয়বাবুও উঠে কাছারী থেকে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেলেন।

গোপেশ্বর তাদের বল্লে—"যাও—যাও, এখন যাও, আমি কাল তোমাদের ওখানে যাব'খন। যা হয় একটা করবো। কিন্তু—আমারও কিছু চাই।" এই কথাটা একটু চাপা গলায় বলে ইসারা করে দেখিয়ে দিলে।

১৫

বাঞ্ছারাম শিরোমণি সাত আট দিনের মধ্যেই ফিরবো বলে যখন অতিরিক্ত দেরী করতে লাগলেন, তখন কোলকেতার সকলে বড়ই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লো। অবশেষে শিশিরের নামে তিনি একখানি চিঠি লিখে জানালেন যে, "হঠাৎ একটা সাংসারিক ঘটনায় বাধ্য হয়ে আমায় দিনকতক চন্দনপুরে থাকতে হয়েছে। কিন্তু তার জন্য তোমার কোনও চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই। যত শীঘ্র সম্ভব এখানকার কাজ সেরে, আমি কোলকেতায় ফিরছি। তোমার পরীক্ষা হয়ে গেছে—নূতন ব্যবস্থা হতে এখনও দেরী আছে। পাশ তুমি হবেই। তুমি নিজেও দিনকতক একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচ, অনেক খেটেছ। তবে আমি যে আগে হতেই তোমায় মুগ্ধবোধখানা ধরিয়েছি, সেটার বেলা অবহেলা করো না—প্রত্যহ একটু আধটু নাড়াচাড়া করো, আমার একান্ত ইচ্ছা, আই-এতে তুমি সংস্কৃত নাও,—তোমায় তৈরী করে দেবার জন্ম আমি দায়ী রইলাম।"

বামা চিঠিটা শুনে জিজ্ঞাসা করলে—"হ্যাঁ রে শিশির, তা এত কথা ত লিখেছেন, কিন্তু যে জন্যে সেখানে গেলেন, তার কথা কিছু লেখেন নি?"

শিশির উল্টে-পাল্টে চিঠিখানা দেখে বল্লে—"হ্যাঁ হ্যাঁ—এই যে—পিছনে লেখা আছে—"

—"কি বাবা, কি লেখা আছে? উনি—তোমার বাবার যে আস্‌বার কথা ছিল, আসেন নি কেন?"

—"সেই কথাই লিখেছেন—'তোমার বাবা চন্দনপুরে এসে মোটে চার দিন ছিলেন। তার পর হঠাৎ বিশেষ দরকার আছে বলে কোন্ দেশে চলে গেছেন—এখনও ফিরে আসেন নি। গোমস্তা সম্ভবতঃ তাঁর ঠিকানা জানে; কারণ টাকা পাঠাতে বলে গেছেন। কিন্তু সে কাকেও বলতে চায় না; আমি অনেক করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাতে বল্লে, বাবুর নিষেধ আছে।"

বামা একটু বিচলিত ও বিস্মিত হয়ে বল্লে—"সে কি রে! তিন মাস হয়ে গেল যে! নতুন বৌ তাহলে কোথা?"

—"তা আমি কি করে জানবো? সে কথা ত শিরোমণি মশায় লেখেননি।"

—"তুই বাবা তাহলে শিরোমণি মশাইকে এখনই খবরটার জন্যে চিঠি লিখে দে। তিনি দেশে এসেছেন কি না, আর নতুন বৌ এখন কোথা।"

শিশির তখনই চিঠি লিখে চাকরকে দিয়ে ডাকে পাঠিয়ে দিলে। বামার কোন কথায় শিশির দ্বিরুক্তি করে না। সে তাকে ঠিক মায়ের মতোই ভক্তি করে, আর বামাও আপন সন্তানের মতো শিশিরকে স্নেহ-যত্ন করে। চন্দনপুরে থাকতে অনঙ্গ ইদানীং কতক পরিমাণে শিশিরকে বামার নিকট হতে কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছিল, আর প্রায় কৃতকার্য্যও

হয়েছিল, কিন্তু কোলকেতায় এসে সে সব আবার ঠিক হয়ে গেছে। শিশির আগেকার সেই কচি ছেলেটার মতোই বামার অঙ্কশায়িত হয়ে পড়েছে।

দিন কেটে যেতে লাগলো। আজকাল সাবিত্রীর সঙ্গে শিশিরের খুবই মেলামেশা হয়েছে। যখন তখন তারা দুটীতে গল্প করে—নানারকম রহস্য করে, আবার সময়ে সময়ে দুটীতে খুব তর্কও চলে, তা থেকে ঝগড়া ঝাঁটির সৃষ্টি হয়। অনেক সময় বামাকেই মধ্যস্থ হয়ে তাদের ঝগড়া মেটাতে হয়। সাবিত্রীর মা কিছুতেই নেই। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে এখন পর্য্যন্ত তাঁর শোকাবেগ কিছুমাত্র মন্দীভূত হয়নি। সারা দিন-রাত্রির ভিতর দুটী কি চারটি কথা কন্। কোনও গতিকে একবেলা একমুঠো আহার করেন মাত্র, তাও বামার আর সাবিত্রীর একান্ত চেষ্টায়। প্রথম দিন থেকেই বামা এই স্ত্রীলোকটিকে আপনার ভগ্নীর মতোই ভালবেসে কোলে টেনে নিয়েছে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও যত্নের ক্রটী করেনি, এখনও পর্য্যন্ত আলাদা উনান জ্বালতে দেয়নি।

শিশিরের বন্ধু নলিনী নিত্যই আসে—একরকম বাড়ীরই ছেলের মতো হয়ে গেছে। সাবিত্রী তার কাছেও লজ্জা করে না, বেশ সরল-ভাবে কথাবার্ত্তা কয়। তারা তিনজনে একত্র হলে তাদের মধ্যে অনেক বড় বড় বিষয়ের আলোচনা হয়। কোন কোন দিন বামা আর নিস্তারিণী দেবীও তাদের সে আলোচনায় যোগ দেয়। নলিনী, সাবিত্রী বা সাবিত্রীর মা বামাকে শিশিরের গর্ভধারিণী বলেই জানে। সেই রকম মান্য-ভক্তি করে।

শিশিরের পাশের খবর বার হবার কিছুদিন পরেই বাঞ্ছারাম শিরো-

মণি তল্পি-তল্পা নিয়ে দেশ থেকে এলেন। এই ক'মাস বামা বা শিশির দেশের কোন খবরই পায়নি। অমিয়বাবু দেশে ফিরেছেন, নূতন বৌ অনঙ্গ চন্দনপুরের বাড়ীতে এসেছে। শিরোমণি মশায়ের মারফৎ অমিয়-বাবু শিশিরের কলেজে ভর্ত্তি হবার আর বই টই কেন্‌বার সমস্ত টাকা পাঠিয়েছেন। সেই সঙ্গে একখানা চিঠিও দিয়েছেন। তাতে জানিয়ে-ছেন—"আমি কয়েক মাস দেশে ছিলাম না, সম্প্রতি ফিরেছি; তোমা-দের কোলকেতার বাসার যাবতীয় খরচা মাসে মাসে নিয়মিত পাঠাবার জন্য আমি গোপেশ্বরের উপর ভার দিয়ে গিয়েছিলাম; এসে শুন্‌লাম, সে তা পাঠাতে ত্রুটি করেনি। আমার কড়া হুকুম আছে যে, বাসা-খরচ ছাড়া প্রতি মাসে তুমি পাঁচ টাকা, আর বামা দশ টাকা করে হাত-খরচা পাবে। এ ছাড়া যখন যা অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে, গোপেশ্বরকে লিখলেই সে দ্বিরুক্তি না করে তোমাদের পাঠাবে। এ সকল বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য, আমাকে এখন কিছুকাল মফঃস্বলে মফঃস্বলে ঘুরতে হবে। নূতন সেটেল্‌মেণ্ট আরম্ভ হয়েছে। জমীদারীর অনেক নূতন কাজ বেড়েছে বলে, আর আমাকেও এখন চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াতে হবে বলে, আমি টাকাকড়ি পাঠাবার ভার গোপেশ্বরকে দিয়েছি, যাতে কোন বিষয়ে তোমাদের অভাব না হয়। তোমাদের ওখানে যাবার খুব ইচ্ছা থাক্‌লেও, উপস্থিত আমি যেতে পারলাম না। আমি না থাক্‌লে জরীপের সময় বিশেষ ক্ষতি হবে। বামাকে এ কথাটী ভাল করে বুঝিয়ে দিও। তুমি ভাল হয়ে পাশ হয়েছ শুনে আমি বড়ই সুখী হয়েছি। কলেজে ভর্ত্তি হয়ে খুব মন দিয়ে লেখাপড়া শেখ, নিজের উন্নতি কর, আর আমারও মুখো-জ্জ্বল কর। কলেজের সকল খরচা আমি বাঞ্ছারাম ঠাকুরের হাতে

পাঠালাম। তিনি—শিরোমণি মশায় সব দেখবেন শুনবেন, বন্দোবস্ত করবেন। যাবৎ আমি না যেতে পারি,—অবশ্য সে যে কতদিন তা' আমি এখন ঠিক্ করে বলতে পাচ্ছি না,—শিরোমণি মশায়ই তোমাদের রক্ষক হয়ে থাক্‌বেন, এমন কথা আছে। কলেজের পড়াশুনার বিষয় আমি সব জানি না, তুমি ওঁর সঙ্গেই পরামর্শ করে কাজ করবে,—উনি তোমার শিক্ষক এবং রক্ষক, এটী মনে করে রাখবে। আর যদি অন্য শিক্ষক নিযুক্ত করতে হয়, তৎক্ষণাৎ তা করবে, লিখলেই মাসে মাসে তাঁর মাহিনা পাঠান হবে।"

তার পর পুনশ্চ দিয়ে লেখা আছে—"বামাকে এই চিঠি পড়তে দিও, আর তাকে ভাবতে বারণ করো।"

চিঠিখানার আদ্যোপান্ত পড়ে বামা কিন্তু তার ভাবার্থ ঠিক্ ঠিক্ নিতে পার্লে না। তার বেশ মনে হল, কোথায় যেন এর একটা কিছু গলদ রয়ে গেছে, আর মনের আসল ভাবটা অমিয়বাবু চাপা দেবার জন্য রীতিমত চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে শিশিরের কাছে কোন কথা ভাঙলে না, বরং বল্লে—"তাই ত বাবা, এ সময় কি তিনি কোলকেতায় এসে থাক্‌তে পারেন? আমি শুনেছি এই জমি জরীপ হবার সময় অনেক জমিদারের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, আর বিস্তর টাকা এই সময় ব্যয় করতে হয়।"

শিশির কোন কথাই কইলে না। তখনকার মত সে নীরবে সেখান হতে চলে গেল। বাপের কোলকেতায় এতদিন একবারও না আসবার কারণ তাঁর পত্রে বিশদভাবে বর্ণিত হলেও, আর না আসার সাপক্ষে সহস্র যুক্তি দেখালেও, তার অন্তরের মধ্যে একটা ক্ষুব্ধ অভিমান থেকে

থেকে পীড়া দিচ্ছিল। কেবল মনে হচ্ছিল—এমনই বা কি কাজ যে, এক-দিনের জন্যে বাবা আস্তে পার্লেন না? বাস্তবিকই যদি তাঁর আসার একান্ত উপায় না থাকে, অনায়াসে আমাকে সেখানে যাবার জন্যও ত তিনি বলতে পারতেন। জমিদারীর কাজটা কি এতই বড়—আর ক্ষতি কি এতই হত, যে আপনার সন্তানকে পর্য্যন্ত তিনি না দেখে থাকতে পারেন? আমিও সহজে কোন চিঠি দেব না, এমন তাঁকে ভাবিয়ে তুলবো যে, পথ পাবেন না।

সেদিনটা একটু উন্মনা হয়েই বামার আর শিশিরের কেটে গেল।

পরদিন শিশির তার বন্ধু নলিনীর সঙ্গে গিয়ে স্কটিস চার্চ্চ্ কলেজে ভর্ত্তি হয়ে এল। তারই তিন চার দিন পরে, শিরোমণি মশাই বামা আর নলিনীর সঙ্গে পরামর্শ করে কলেজেরই একজন ইংরেজীর অধ্যাপক সুশীলকান্ত বসুকে শিশিরের গৃহ-শিক্ষক রূপে নিযুক্ত করলেন। তিনি সন্ধ্যার পর এসে দুঘণ্টা পড়াবেন, এই বন্দোবস্ত হ'ল। বাঞ্ছারাম ঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী শিশির সংস্কৃত, লজিক আর অঙ্ক নিলে। সে আবার পড়ায় মনোযোগ দিলে।

১৬

আমা আগে আগে যেমন, শিশির মোটে ঘর থেকে বেরুতে চাইত না কিংবা কারো সঙ্গে মিশতো না বলে দোষ দিত,—এমন কি প্রত্যহ বিকালে একরকম জোর করেই তাকে বেড়াতে পাঠাতো,—এতদিন থাকবার ফলেই হোক্ বা বন্ধুবান্ধবের ক্রমাগত চেষ্টার ফলেই হোক্ শিশির এখন অনেক বদ্‌লে গেছে।

এখন সে পাঁচ জনের সঙ্গে মিশতে পারে, বলতে কইতেও পারে। তার আরও একটা কারণ আছে। অধ্যাপক সুশীলবাবু বয়সে প্রবীণ না হলেও, শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞানে ঢের প্রবীণ। ছাত্রেরা তাঁকে খুব পছন্দ করতো—ভালবাসতো। আর তিনিও ছাত্রদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতেন, তাদের সঙ্গে ঠিক তাদের মতন হতে পারতেন। ক্লাসের মধ্যে নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া ছাড়া বাহিরেও ছাত্রদের সঙ্গে নানা স্থানে ঘুরতেন ও সুযোগ পেলেই তাদের নানারূপ সৎশিক্ষা দিতেন। সুশীলবাবু নিজে ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট বক্তা। সেইজন্য যেখানে যখন কোনও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বক্তৃতা হত, তিনি সেখানে যেতেন; আর যে সকল ছাত্র সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে থাকতো, তাদেরও নিয়ে যেতেন। ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতি, অর্থসমস্যা, সমাজপদ্ধতির সম্বন্ধে তিনি খুব আলোচনা করতেন,—সময়ে সময়ে আন্দোলনে যোগ দিতেন, বা প্রয়োজন হলে, তীব্র প্রতি-

বাদও করতেন। এই সকল কারণে তাদের কলেজের কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছাত্র তাঁর ক্রমশঃ অন্ধ ভক্ত হয়ে পড়েছিল। তিনিও আনন্দে সেই ছাত্র-কয়টিকে আপনার সহযোগী করে নিয়ে, নিজের মনের মতন করে তাদের গড়ে তুলেছিলেন। তাদের সেই দলের মধ্যে শিশির ও নলিনী অন্যতম।

সেদিন রবিবার। সুশীলবাবু নিয়ম করেছিলেন—সপ্তাহের মধ্যে ওই একটি দিন সন্ধ্যার সময়, হয় শিশিরদের বাড়ী, নয় অপর কোন ছাত্রের বাড়ী বসে তাঁরা পাঁচরকম আলোচনায় কাটাবেন; সে সময়টা কলেজের নিয়মিত পাঠ বন্ধ থাকবে।

তিনি বলতেন, একটা দিন এ-রকম সময় বার করে না নিলে, ছাত্র-দের সাধারণ বিষয়ে কোনও জ্ঞানই হবে না। কেবলমাত্র পাঠ্য পুস্তক নিয়ে থাকলে চল্‌বে না। ওরই সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচরকম শিক্ষা করা দরকার। দেশের আব্‌হাওয়াটা জেনে রাখা দরকার, নইলে মানুষ গড়া হতে পারে না। এইজন্য প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পর তাঁদের বেশ একটি ছোটখাট সভা বসতো। সেখানে আরও দু'চারজন ছাত্র বা অপর কলেজের কোনও কোনও বন্ধু অধ্যাপক এসে জুটতো।

আজ মজলিস্‌টা বসেছে শিশিরের পড়বার ঘরে। শিরোমণি মশায়ও ছিলেন তাদের মধ্যে একজন অগ্রণী। তিনি এ সকল আলোচনা খুব ভাল বাসতেন বলে তাদের সমিতিতে যোগ দিতেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষ হলেও তিনি গতানুগতিক ভাবে দেহ এলিয়ে দিয়ে পড়ে থাকতে চাইতেন না,—সমাজতত্ত্ব নিয়ে তিনি খুব তর্ক তুলতেন, আর দোষগুণের সমালোচনা করতেন।

তাঁদের বৈঠকে অনেক তত্ত্বের কথাই উঠতো। যেদিন শিশিরের ঘরে আলোচনা হত, সেদিন পাশের ঘরে সাবিত্রী, বামা, আর কোন কোন দিন নিস্তারিণী দেবীও উপস্থিত থেকে আলোচনা শুনতেন। সে দিন সেই সকল বাদানুবাদ খুব জমতো। আজ সুশীলবাবু বলছিলেন —"দেখ বাবু, দেশের যদি foundation. তৈরী থাকতো, তাহলে ওরকম উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারলে অনেক বড় বড় কাজ হয়ে যেত! দেশের বারো আনা লোক দেশের কোন খবরই রাখে না। সেই থোড় বড়ী খাড়া আর খাড়া বড়ী থোড় নিয়েই আছে। তাদের অবস্থা তারা যতদিন না ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে, ততদিন কিছুই হতে পারে না। সহর হতে দূরে পল্লীর মধ্যে যারা বাস করে, তারাই হল দেশের প্রাণ—ঘুমন্ত শক্তি। কে তাদের রাষ্ট্রনীতি. অর্থনীতি বর্ত্তমান সমস্যা বুঝাতে যাচ্ছে বল? লিখতে পড়তেও কেউ জানে না যে, খবরের কাগজ নিজেরা পড়বে। আবার এমন সব গ্রাম আছে, যে, কাগজও তার ত্রিসীমানায় যায় না, বুঝলে?"

শিশির জিজ্ঞাসা করলে—"কেন, যাঁরা দেশের নেতা তাঁরা যাবেন, তাঁরা তাদের বুঝাবেন?"

—"ওইটাই তোমরা ভুল বুঝেছ। নেতা তোমাকেও হতে হবে. আমাকেও হতে হবে, তবে দেশ গড়ে উঠবে। আপামর সাধারণ সকলকে বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিয়ে দিতে হবে। সে কাজটা কি দু'পাঁচজনের কাজ? তোমাদের প্রত্যেককেই এক একটা কাজের ভার নিতে হবে,—খানিকটা করে' field বেছে নিয়ে তাতে কাজ করতে হবে। আমি কি চাই জান? Every village should possess more stalwart and hardy

young men with a little bit of education than a pack of weakeyed dyspeptic graduates.

নলিনী বল্লে—"তা হলে কি Sir, বেশী লেখাপড়া শেখার দরকার নেই?"

—"আরে না না,—মনে কোরো না তা' বলে আমি উচ্চশিক্ষার বিরোধী। উচ্চশিক্ষার বিস্তৃতি দেশে হওয়া খুবই দরকার। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে তা নয়। সেইটে সাধারণের মধ্যে প্রচার করতে হবে।"

শিরোমণি মশায় বল্লেন—"হ্যাঁ, সুশীলবাবু, একথা আপনার খুব মানি। ভিটে বিক্রী করেও ছেলেকে Graduate করবার নেশা সকল বাপ-মার মধ্যে বেজায় সংক্রামক হয়ে পড়েছে। আর সেই সব ছেলেগুলোর ভিতর অকারণ এত অভিমানের সৃষ্টি হয়ে পড়েছে যে, ছোট খাট কাজকে তারা ঘৃণা করে।"

সুশীলবাবু—"সেই কথাই বলছি শিরোমণি মশাই। যাঁদের অবস্থা খুবই স্বচ্ছল তাঁরা উচ্চশিক্ষা নিন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সেটা ঠিক কি? খানিকটা লেখাপড়া শিখে নিয়ে যাতে দেশ-বিদেশের আবহাওয়া সমঝে চলতে পারে, অবস্থা বুঝিয়ে দিলে বুঝতে পারে, এমনি শিক্ষাই অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলের পক্ষে দরকার। আর তার সঙ্গে সঙ্গে গরীব দুঃখী—যারা কুলী মজুরের কাজ করে, কারখানায় খেটে খায়, তাদের অন্ততঃ বর্ণপরিচয়টা থাকা চাই। এমন জ্ঞান থাকা চাই যে, তারা বাঙলা খবরের কাগজ পড়ে যাতে কতক কতক ধারণা করে নিতে পারে।"

শিশির মনোযোগ দিয়ে সুশীলবাবুর কথাগুলো শুনছিল। তিনি চুপ করতে জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা Sir, ওই সব লোককে কেমন করে শেখান যাবে?"

সুশীলবাবু বল্লেন—"তাদের পিছনে লেগে থাকতে হবে, তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের সুখদুঃখের অংশীদার হয়ে কাজকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে তাদের শেখাতে হবে, তাদের ছেলেমেয়েদের ভিতর অতি অল্প বয়স থেকেই জ্ঞানের আলো জ্বেলে দিতে হবে। সে কি আর এক দিনের এক ঘণ্টার বক্তৃতার কাজ? হৈচৈ জটলা হল—তারাও এলো, বসলে, শুনলে, বাবুদের হাত-পা নাড়া দেখলে,—কিন্তু পনের আনা তিন পাই লোক বক্তৃতার সার মর্ম্ম বুঝতেই পার্ল্লে না।"

নলিনী হেসে উঠলো।

সুশীলবাবু বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"হাসলে যে নলিনী?"

নলিনী একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে—"আজ্ঞে না, ভাবছিলুম—ওসব কাজ করতে যাবে কে! আর কুলী-মজুরেরা লেখাপড়া শিখতে গেলে কারখানায় তারা খাটবে কখন।"

সুশীলবাবু বল্লেন—"তোমার মাথায় তা আসবে না হে। তারপর তুমি একজন মস্তবড় ব্যবসাদারের ছেলে, তোমার বাপের বড় বড় কারখানা আছে।—আচ্ছা, কত মজুরদার লোক তোমাদের কারখানায় খাটে?"

নলিনী—"প্রায় চারশো হবে।"

সুশীলবাবু নলিনীকে আর কিছু বল্লেন না। খানিকটা চুপ করে থেকে তারপর অপর সব ছাত্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন—"এই সকল

কাজে ব্রতী হবার জন্যেই আমি বল্‌ছিলাম hardy young menএর দরকার, বুঝলে ? এ সব কাজের young menদেরই ভার নিতে হবে। শিরোমণি মশায় কি বলেন ?"

বাঞ্ছারাম—"অনেক কাজ বাকী সুশীলবাবু—অনেক কাজ করবার আছে। তবে সৌভাগ্য যে, অল্প অল্প করে কর্ম্মের স্পৃহা বাড়তে দেখা যাচ্ছে।—আচ্ছা, আমাদের সমাজগুলোর মধ্যেই কত গণ্ডগোল রয়েছে বলুন দিকি ?"

সুশীলবাবু হাত জোড় করে বল্লেন—"মাপ করবেন শিরোমণি মশাই, ওসব ব্যাস-বশিষ্ঠ-পরাশরের কথায় আমি নেই।"

বাঞ্ছারাম—"আজ্ঞে না—না, ওটা আপনার ভুল ধারণা। এই দেখুন ! তাঁদের কথা মেনেই কি সমাজ চলছে না কি ? শুধু গণ্ডারের ছালখানা ঢেকে রেখে যার যা খুসী তাই করে যাচ্ছে। জানে—কঠিন আবরণ বিদ্ধ করতে সহজে কেউ পারবে না। হিন্দুধর্ম্মের আবরণটা যে খুব পুরানো আর খাঁটি, সে কথা অস্বীকার করবার ত যো নেই ?"

সুশীলবাবু—"না, তা নেই। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মই কি দায়ী—আপনার হাতে-পায়ে শিকল বেঁধে এক পাশে ফেলে রাখবার জন্য ? ছত্রিশ গণ্ডা জাতির সৃষ্টি করে, ব্রাহ্মণদের মধ্যেও চৌদ্দহাজার থাক্‌ করে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, দ্বেষ-হিংসার বৃদ্ধি করে, দুর্ব্বল শক্তিহীন ছন্নছাড়া হয়ে থাকতে কি হিন্দুধর্ম্মই শিক্ষা দিছলো মশাই ? হিন্দুধর্ম্মই কি বলেছিল যে, পাঁজী ছাড়া আর শাস্ত্র নেই, লোকাচার মেনে চলা ছাড়া কর্ত্তব্য নেই—তা লোকাচার মান্‌তে গিয়ে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের উপর যতই অত্যাচার হোক্‌—যতই নিষ্ঠুরতা হোক ?"

শিরোমণি মশায় দাঁড়িয়ে উঠে সানন্দে করতালি দিয়ে বল্লেন—"কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব সুশীলবাবু, তা ঠিক বলতে পারছি না। তবে না কি আপনি সমাজের কথা ভাবেন না—তার উপায় চিন্তা করেন না?"

সুশীলবাবু—"বসুন শিরোমণি মশায়। গলদ যে কোন্‌খানে, সে কথা অনেকেই জানেন—আমার মত অনেকেই ভাবেন। কিন্তু আমরা, সেই কথায় যাকে বলে 'বাঁশ বনে ডোম কানা'—বুঝলেন? ঝাড়ের কোন বাঁশটা কাটবো, তা ঠিক করতে পারি না।"

বাঞ্ছারাম—"লক্ষ যখন পড়েছে তখন গলদ ক্রমশঃ যাবে বৈ কি।"

সুশীলবাবু—"ভরসার মধ্যে আপনারা, বুঝলেন শিরোমণি মশায়? আপনারা অগ্রণী হলেই সবার সাহস বাড়বে। আপনি একটু আগে গণ্ডারের চামড়া বলে তুলনা দিচ্ছিলেন না? কিন্তু কালের মাহাত্ম্যে আপনাদের ওই নামাবলীর সূক্ষ্ম আবরণই এত কঠিন হয়ে পড়েছে যে, তা দুর্ভেদ্য!"

বাঞ্ছারাম—"তা হতে পারে, কিন্তু আমার মতনও খুঁজলে মেলে।"

সুশীলবাবু—"বলেছি ত—আপনাদের মধ্যে থেকে অগ্রণী হলে বা আমাদের সাহস দিলে সব হতে পারে।—কি উঠ্‌ছো না কি নলিনী?"

নলিনী বল্লে—"আজ্ঞে হঁা, সাড়ে নটা বেজে গেছে!"

সুশীলবাবু—"এ্যাঁ বল কি—এত রাত হয়েছে?"

বাঞ্ছারাম—"তা আর হবে না? আজ যে অনেক বিষয়ের আলোচনা হল।"

—"চল্লুম শিশির, প্রণাম শিরোমণি মশায়," বলে তখন সুশীলবাবু

অগ্রসর হলেন। তাঁর পিছনে পিছনে অপর সকল সভ্যেরাও একে একে যে যার বাড়ী চলে গেল।

—

১৭

শান্তিপুরে ও তার আশে পাশে অমিয়বাবুর সব চেয়ে বেশী জমিদারী ছিল। তার মধ্যে চাষবাসের জমিই বিস্তর। ঠিকে কবুলতির উপর সেই সব জমি প্রজাদের নানারূপ মেয়াদী বিলি ছিল। সে অঞ্চলে জরীপ হচ্ছিল বলে অমিয়বাবু আগে থাকতে এসে শান্তিপুরের কাছারী বাড়ীতে বসলেন। সঙ্গে ছিল অনঙ্গমঞ্জরী, তার মা সিদ্ধেশ্বরী, একজন ঝি, নব নিযুক্ত খানসামা আর একজন দরোয়ান।

পূর্ব্বে খবর দেওয়া হয়েছিল বলে, সেখানকার গোমস্তা কাছারী-বাড়ীর ভিতরটা ঝেড়ে ঝুড়ে, বনজঙ্গল কাটিয়ে, প্রয়োজন মত মেরামত করিয়ে বেশ বাসোপযোগী করে রেখেছিল। কাজেই পরিবারাদি নিয়ে থাকবার পক্ষে কোনই অসুবিধা হয় নি। . আর তা ছাড়া লোকবল যথেষ্ট। তাঁর নিজের দু চারজন নগ্‌দী পাইক তো ছিলই, তার উপর জমিদার স্বয়ং পরিবার নিয়ে দিনকতক থাকবেন, একথা প্রচার হতেই প্রজাদের মধ্যেও অনেকে নানাভাবে আপ্যায়িত করতে আসতো।

চন্দনপুরের বাড়ীর বা কাছারীর সব ভার একা গোপেশ্বরের উপরে দিয়ে অমিয়বাবু নিশ্চিন্ত মনে ঘুরছিলেন।

গঙ্গার ধারে দোতলা কাছারী-বাড়ী। বাড়ীটা ছোটখাট হলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারিদিকে অনেকখানি জমি থাকাতে, তাতে

গোমস্তা শাকসজীর বাগান করেছিল। বাড়ীর পিছন দিকে দোতলার বারান্দায় বসলে গঙ্গার নির্ম্মল বায়ু উপভোগ করা যেত।

অমিয়বাবুরা দ্বিতলেই থাকতেন। নীচে সদর বাড়ীতে কাছারী বসতো। আর চাকর, দরোয়ান, নগদী, পাইক এরা সব থাকতো।

গোমস্তার বাড়ী নিকটেই—সে শান্তিপুরের লোক।

সূর্য্যাস্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তখনও ওপারে শেষবেলার একটু চিকচিকে আলো আছে। ওপারে বনের ঝোপগুলো যেন ক্রমশঃ এগিয়ে এসে একটু একটু করে গঙ্গার উপরে একখানা কাল-রঙের কাপড় বিছিয়ে দিয়ে এপারের মানুষের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটাচ্ছিল। সেই আলো-আঁধারের মাঝখানে দু একখানা ছোট ছোট নৌকা যেন ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অল্প আলো-কের গণ্ডী ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের অসীম অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, —চিহ্ন রেখে যাচ্ছিল শুধু জলের উপর এক শীর্ণ রেখা,—কিন্তু পিছন ফিরতে না ফিরতেই লহরের উপর লহর এসে সেই রেখাগুলি তখনই মিলিয়ে দিয়ে অবিশ্রান্ত অনাহত স্বরে যেন বলছিলো—চল্ চল্ চল্—সব ছল্ ছল্ ছল্!

বারান্দার উপর একখানা মস্‌লন্দের মাদুরের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে অমিয়বাবু গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়ে আরাম উপ-ভোগ করছিলেন। তাঁর ঠিক সামনে অনঙ্গমঞ্জরী বসে বসে একজোড়া কার্পেটের জুতার উপর পশমের ফুল তুলছিল। অমিয়বাবুর অনুরোধেই জুতা বোনা হচ্ছিল।

সন্ধ্যার আবছায়ায় বোনার পক্ষে অসুবিধা হওয়াতে, অনঙ্গ তার সর-ঞ্জাম গুছিয়ে ফেলে বল্লে—"ওগো শুনছো?"

অমিয়বাবু শুনতে পেলেন না। অনঙ্গ চেয়ে দেখলে—তাঁর হাত থেকে নলটা খসে পড়েছে। তখন সে আর একটু গা ঘেঁসে ডাকলে—"শুনছ? বেশ লোক ত, সন্ধ্যা হল যে। এইবার আমি উঠি?"

অমিয়বাবু চেয়ে দেখলেন, বল্লেন—"চল্লে যে?"

—"বাঃ! আমি কাপড় চোপড় কাচবো না?"

—"এখনও গা ধোয়া হয়নি?"

অনঙ্গ হাসলে। হেসে বল্লে—"আচ্ছা লোক ত তুমি। তুমি সেই থেকে আটকে রেখেছ, গা ধুলুম কখন?"

দরজার পাশ থেকে সিদ্ধেশ্বরী ডাকলে—"অনুরাণি, সন্ধ্যা হয়ে গেল যে মা।"

একটু মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে অনঙ্গ বল্লে—"ছি ছি, মা কি ভাববে বল দিকি?—যাই গা ধুয়ে আসি—"

—"কাজেই। মায়ে-ঝিয়ে যখন দল বেঁধেছ—"

—"রাগ করলে? তবে যাব না। গা ত আমি বেলা চারটের সময় একবার ধুয়েছি।"

—"তবে আবার যেতে চাইছিলে কেন?"

—"ভাবছিলুম—আর একবার ধুই।"

—"না না, নতুন জায়গা, বেশী জল ঘেঁট না, অসুখ বিসুখ করবে আবার।"

—"আমার অমন তোমার মতন অসুখ করে না। এখানটা ব্যথা, ওখানটা কন্ কন্, দাঁতের গোঁড়া ফোলা। কেমন জব্দ, আমার ফেলে কাশী পালাবে, না?"

—"গিছলুন ত। অসুখ না হলে ফিরে আসতুম না কি?"

—"আমায় কষ্ট দিছলে বলেই ত অসুখ করেছিল সেখানে। দেখলে ত কেমন মজা? আমায় তুমি নিতে পাঠালে, মা বল্লে—'এ বেলা খাওয়া দাওয়া কর ও বেলা যাবে।' ওই শশুর মা পোড়ারমুখী সেই ত যত নষ্টের গোড়া।"

—"আমার ভারী রাগ হয়ে গিছলো।"

—"তোমার আর কি, রাগ হলেই হোল! একবার ভাবলে না, বিচার করলে না, একেবারে কাশী চলে যাওয়া হোল। সেখানে কেন গিছলে? সন্ন্যাসী হতে?"

—"দূর! সন্ন্যাসী হতে গেলুম কেন? দিনকতক বেড়াতে গিছলুম।"

অনঙ্গ বল্লে—"তার বেলা আমায় নিয়ে যাওয়া হল না।"

অমিয়বাবু বল্লেন—"তুমি এলে নিশ্চয়ই নিয়ে যেতুম।"

—"হ্যাঁ, তা বৈ কী, তা আর জানি না, তা হলে সেই কথা ব'লেই নিতে পাঠাতে।"

অমিয়বাবু চুপ করে রইলেন। গড়গড়ার নলটা তুলে নিয়ে দু'চার বার টেনে দেখলেন, আগুন নিবে গেছে। ডাকলেন—"হরা, এক কল্‌কে তামাক দে যা।"

অনঙ্গ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—"চা'এর জল গরম করে আনি—আজ চা খাবে না?"

অমিয়বাবু বল্লেন—"এইবার খাব।"

—"তবে জল গরম করে আনি?"

—"কোথা আবার গরম করতে যাবে? যে ষ্টোভ্‌টা সঙ্গে এনেছি, সেইটেই দাও না, জ্বেলে দিই,—এইখানেই বসে চা কর।"

হরা খানসামা এক হাতে আলো আর এক হাতে কল্‌কে নিয়ে ঢুকলো। তার আসাতে অনঙ্গ একটু দূরে বারান্দার রেলিংএর কাছে দাঁড়ালো। হাতের কল্‌কেটা গড়গড়ার মাথায় বসিয়ে দিয়ে, হরা লণ্ঠনটা বারান্দার মাঝখানের কড়িকাঠে একটা লোহার শিক্ ঝুলছিলো, তাতে টাঙিয়ে দিলে। বারান্দায় সর্বদা হাওয়া বলে লণ্ঠন জ্বালানো হোত।

ষ্টোভ্‌ জ্বেলেই চা'র জল বসানো হল।

অনঙ্গর দিকে চেয়ে অমিয়বাবু বল্লেন—"আহ্নিকটা সেরে ফেলি, জোগাড় করে দাও।"

অনঙ্গ তাড়াতাড়ি একখানা আসন পেতে, নীচে থেকে কোষাকুশী, পঞ্চপাত্র, গঙ্গাজল সব এনে দিলে।

চা'র জল ষ্টোভে ফুটতে লাগলো। অমিয়বাবু সন্ধ্যাহ্নিক সেরে নিলেন। অনঙ্গ চা তৈরী করতে বসলো। সেই সময় সিদ্ধেশ্বরী একখানা রেকাবী করে জলখাবার অমিয়বাবুর কাছে রেখে তখনই চলে গেল।

অমিয়বাবু বল্লেন—"এক পেয়ালা করলে যে, তুমি খাবে না?"

অনঙ্গ চা'টা সাম্‌নে ধরে দিয়ে বল্লে,—"না, রোজ রোজ খেতে হবে বুঝি? আমার অভ্যাস নেই, সহ্য হয় না।"

—"তবে থাক্,—কাল সকালে খেও।" বলে অমিয়বাবু চায়ের পেয়ালাতে চুমুক দিলেন।

একটু পরে অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে—"হ্যাঁ গা, আমরা এখানে কদ্দিন আছি ?"

—"এখানে—শান্তিপুরে ? বছর দেড়েক হবে বোধ হয়।"

—"তার আগে—ওই যে কি বলে, রাণাঘাটে ?"

—"সেখানে ত মোটে এক মাস ছিলুম। একটা মামলার শুনানি হচ্ছিল সেখানে, তাই থাকৃতে হয়েছিল।"

—"তা হোক। সেথায় তবু আশে পাশে গেরোস্তবাড়ী ছিল, মেয়েরা যাওয়া আসা করতো। কিন্তু এখানে, মা গো মা—যেন 'তেপান্তরের' মাঠ। এদিকে বসো ত শুধু গঙ্গা—থৈ থৈ জল—আর ওদিকে যাও ত কেবল মাঠ ধূ ধূ করছে।"

—"রাণাঘাটে কাছারী ত নেই আমার,—যখন আসি, বাড়ী ভাড়া করি।—তা আমার যে উকিল, সে নিজের পাড়ার মধ্যে বাড়ী ঠিক্ করে রাখে। এখানে আমার কাছারী কি না ?"

—"তা হলেই বা। পাড়ার ভিতর, গাঁয়ের ভিতর কি কাছারী-বাড়ী করতে নেই ?"

—"পূর্ব্বাপর আছে কি না। তালুকও যেমন কিনেছিলুম, সেই সঙ্গে কাছারী-বাড়ীটা নিছলুম। কেন, এখানে তোমার মন টেঁকছে না ?"

—"না—মোটেই না। একটা লোক নেই,—জন নেই। এখান থকে শীগ্‌গীর চলে চল।"

—"এই তো জমির মাপ সুরু হয়েছে। এখনও মাসখানেক লাগবে। ...তার পরই তোমায় মুর্শিদাবাদ ঘুরিয়ে নিয়ে যাব। সেখানে কেমন ন বাবের বাড়ী বাগান সব দেখবে।"

অমিয়বাবুর জলখাবার খাওয়া শেষ হল। তাঁর হাতে জল দিয়ে হাত মুছতে তোয়ালে দিয়ে, অনঙ্গ নীচে থেকে পান এনে বসে ছেঁচ্তে লাগলো। অশীতিপর বৃদ্ধ না হলেও, অমিয়বাবুকে বৃদ্ধ বলা যায়। ইতিমধ্যে হরা এক কল্‌কে তামাক দিয়ে গেল। যাবার সময় বল্লে,—"দেশের বড় গোমস্তা এসেছে বাবু।"

অমিয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কখন এল রে?"

হরা জবাব দিলে—"এই আধ ঘণ্টাটাক্ হবে। একখানা ঘোঁড়গাড়ী করে এসে নাম্‌লো।"

—"সঙ্গে কেউ এসেছে না কি?" বলেই অমিয়বাবু হরার মুখের দিকে চাইলেন।

—"না। দু'বস্তা হবে খাতাপত্র এসেছে।"

—"ও!—আচ্ছা, তুই যা। তার খাবার-শোবার ব্যবস্থা করে দিগে। বলিস্—সকালে দেখা হবে।"

হরা চলে যাবার পর অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে—"সে কেন এল গা—তুমি আস্‌তে লিখেছিলে?"

—"হ্যাঁ। কতকগুলো জরুরী কাগজপত্র সঙ্গে আনিনি, দরকার পড়েছে—তাই আনতে লিখেছিলুম।"

অনঙ্গ এ-কথা সে-কথার পর জিজ্ঞাসা করলে—"কোলকেতার খবর কিছু পাওনি?"

—"না। কেন?"

—"শুধু জিজ্ঞাসা করছি। শিশির কেমন আছে, কি করছে?"

ও প্রসঙ্গটা যেন চাপা দিতে পারলেই বাঁচেন, এমনি ভাবে অমিয়-

বাবু বল্লেন—"পড়াশুনা করছে—মার ছেলে মার কাছে আছে, তোমার অত ভাবনা কিসের?"

অনঙ্গ একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"মার ছেলে মার কাছে আছে কি রকম? মা তো আমি, আমি তার খোঁজ করবো না?"

অমিয়বাবু গড়গড়ার নলটা দাঁতে চেপে একটু জড়িত কণ্ঠে জবাব দিলেন—"আরে না না! বাবাকে সে মার মতনই দেখে কি না, তাই। তার পর নলটা নামিয়ে বল্লেন—"ধরতে গেলে তুমিই তো মা, ঠিক কথাই তো---আমি বলছিলুম কি জান? সে লেখাপড়া করছে, এখন কি আর যখন তখন চিঠি লেখবার তার সময় আছে—না পারি?"

কথাটা অনঙ্গর তেমন ভাল লাগলো না, একটু অভিমান হল,—বল্লে—"আমি সৎমা কি না, তাই এমন ছাড়া ছাড়া জবাব দিচ্ছ। রাঁধুনীর হেপাজাতে রেখেছ, তবু আমি খবরটা জানতে চাচ্ছি, সেটাও তোমার ভাল লাগলো না?"

অমিয়বাবু বল্লেন—"এই দেখো! খবর অনেক দিন পাইনি বলেই বলেছি। আচ্ছা, শীগগীর আমি তার খবর আনিয়ে দিচ্ছি, তুমি ভেব না, নিরস্ত হও। কি আশ্চর্য্য! তুমি যে তাকে ছেলের মতই ভালবাস, তা কি আমি জানি না?'

—"জানলে আমার কাছছাড়া করতে না। আমার একটা মত পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা না করে তাকে কোলকেতায় রেখে আসতে না। সবাই ভাবে,—সতীন-পো, তার আর দরদ কিসের?"

অমিয়বাবু সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন—"না—না, তা নয়,—এ কথা আমি দিব্যি করে বলতে পারি। সে সতীন-পো বলে আমি তাকে কোল-

কেতায় রাখিনি,—তাকে লেখাপড়া শেখাতে হবে ত ? ম্যাট্রিক পাশ করে আর তো চন্দনপুরের স্কুলে পড়া চলবে না ? এতদিনে সে আই-এ পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে।"

অনঙ্গ বল্লে—"তা আমি জানি। কিন্তু কোলকেতায় পড়লে কি একবারও বাড়ী আসতে নেই—চিঠি দিতে নেই ?"

তখনকার মত অমিয়বাবু আর কোন কথা কইলেন না। আপন-মনে গড়গড়া টান্‌তে লাগলেন।

অনঙ্গ চা'য়ের বাটী ষ্টোভ্ সমস্ত গুছুতে লাগলো।

অনেক

গোপেশ্বরকে তার থা

জমিদারী সম্পর্কে যা

বেলা দশটা বেজে গেল। সকে

—"আজই ত রওনা হচ্ছ গোপেশ্বর ?

সে হাত জোড় করে উত্তর দিলে—"আ

—"আজ্ঞে আর কি করবো, যেতে সেখানে

রের কাছারীতে তুমিও না থাকলে কি চলে ? একে আ

আটকে।"

—"হুজুরকে এখানে আর কদ্দিন থাকতে হবে ?"

—"ঠিক বলতে ত পারছি না, মাসখানেক ত বটেই। তার

শুনছি আবার বহরমপুরের সীমানা জরীপ হবে।"

গোপেশ্বর একটু ভেবে মাথাটা চুলকে বল্লে—"তা হলে ত সেখানেও থাকতে হবে আপনাকে ? তবে সেথায় আপনার বেশী কাজ নেই, দশ পনের দিনেই মিটবে।"

—"তা বটে। তবে ভাবছি ও দিকের মিটলে, একবার এদের সব মুর্শিদাবাদটা ঘুরিয়ে আনবো, ওই নবাবের বাড়ী-ফাড়িগুলো, বাগান

সম্পত্তি বেচেছিল, আপনি কিনেছিলেন। ঈশ্বরীডাঙার আট আনা রকমই আপনার—ওইটাই তার জ্যাঠার বিষয়। বাকী আট আনা ত ক্ষেত্র রায় তার বাপের কাছ থেকে পেয়েছেই।"

—"এখন সে বল্‌তে চায়, যে, তার মামা অভিভাবক ছিল,—সে তখন ছেলেমানুষ—কিছু জান্‌তো না, বুঝতো না। জমিদারের নায়েব আর তার মামা ষড়যন্ত্র করে ভাগ্‌নেকে ঠকাবার জন্যে ওই দু'জন জ্যাঠা'য়ের টিপ সই নিয়ে দরখাস্ত করিয়ে সম্পত্তি বেহাত্তি করেছিল। আমার কেনাটা বলতে চায় আগাগোড়া মিথ্যা—যেন মুখ্‌খু মেয়েমানুষ পেয়ে ঠকিয়ে নিচ্ছি আর কি।"

—"তা' বলুক্ গে। কিনে ইস্তক আপনি টুকরো টুকরো করে ঠিকে পাটায় সব বিলি করে আসছেন—সব কবুলতী আছে, খাজনার কবজ আছে। সেই সব দেখিয়ে, চৌহুদ্দি দেখিয়ে আপনি সীমানা কায়েমী করে নিন্। সে তার সর্ত্ত প্রমাণ করুক আদালতে গিয়ে। তার জ্যাঠাই দু'জন কোথায়?"

—"একটা ত মরে গেছে। আর ছোটটা শুন্‌ছি কাশীতে ছিল। সম্প্রতি ক্ষেত্র রায়ের মেয়ের বে' উপলক্ষে এসেছিল, ফিরে যায়নি, এখানেই আছে।"

গোপেশ্বর খানিক গুম্ হয়ে বসে থেকে তার পর বলে—"তাহলে সেই ছুটকীটা,—ঠিক্ হয়েছে। তাকে হাত করে ক্ষেত্র রায় কথাটা তুলতে সাহস করেছে। মাগী বড় ঝানু। বড়টা হাবাগোবা গোছের ছিল। কিন্তু এই মাগী বিক্রী কোবলায় টিপ সই দেবার সময়ও একশো টাকা বেশী নিছলো—মনে আছে বাবু?"

অমিয়বাবু বল্লেন—মনে আছে বৈ কি। তা দিয়েও টিপটা ঠিক দিয়েছিল কি?”

গোপেশ্বর একটা ঢোঁক গিলে, চোখটা বুজে মাথায় খানিকটা হাত বুলিয়ে বল্লে—“আজ্ঞে হ্যাঁ, তা দিছলো, তবে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল, আঙুলটা এক রকম টেনে চেপে ধরেই টিপটা নেওয়া হয়েছিল।”

অমিয়বাবু বল্লেন—“তবে আবার কি? পরের আঙুলের ছাপ ত আর নয় হে? তাও সাবেক আমলে ঢের হয়ে গেছে। নাজিরী করতুম আমি। পুরোনো জমিদারী সেরেস্তায় খুঁজে দেখলে অনেক কীর্ত্তি বেরিয়ে পড়ে।”

গোপেশ্বর মাথাটা দুলিয়ে একটু হেসে তখন বল্লে—“আজ্ঞে, তখন এতটা আইনেরও কড়াকড়ি ছিল না। পঞ্চাশ বছর আগে অনেক জমীদার সম্পত্তি বাড়াবার জন্যে দিনকে রাত করে গেছে। রাতারাতি অমন গরীব পড়শীর একশো বিঘে জমি ঘিরে নিয়ে তার পর প্রমাণ করে দিত যে, সেটা খাসের। যাক্ সে কথা—ক্ষেত্র রায় জরীপ আট্‌কাতে পারবে না। মদনপুরের অমন জলকরটা উড়িয়ে দেওয়া গেল, কি করতে পারলে বোসেরা?”

—“ছেড়ে দাও ও সব কথা। নিজে ত আছি—দেখা যাবে। হ্যাঁ, কোলকেতায় টাকা পাঠিয়েছ?”

গোপেশ্বর উঠে পড়েছিল, আবার বসে পড়ে বল্লে—“না—এবারে আর পাঠাতে হয়নি, খোকাবাবুর হাতেই দিয়ে দিছি।”

অমিয়বাবু কথাটা ভাল বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন—“খোকাবাবুর হাতে দিলে কি রকম? শিশির বাড়ী এসেছিল না কি?”

গোপেশ্বর বল্লে—"আজ্ঞে হ্যাঁ। এক শনিবার দু'চারজন বন্ধু আর কলেজের মাষ্টার নিয়ে সেথায় এসেছিলেন। আমায় সে কি পীড়াপীড়ি বাবু,—বলে, 'বাবার ঠিকানা দাও' আমি গিয়ে দেখা করবো'।"

গোপেশ্বরের কথায় অমিয়বাবু একটু চঞ্চল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"তার বন্ধুদের সমুখেই পীড়াপীড়ি করলে ?"

গোপেশ্বর জিভ কেটে বল্লে—"আজ্ঞে না—না সে কি কথা ! তাঁরা তখন বাগানের চারিদিকে বেড়াচ্ছিলেন।"

—"ও, তুমি আমার ঠিকানা দিয়েছ ?"

—"না বাবু, আপানর হুকুম কি আমি অমান্যি করতে পারি ? বল্লুম—তিনি ত এক যায়গায় নেই যে ঠিক করে বলবো,—এবার একটা পাকা রকম খবর পেলে বরং আপনাকে জানাব। তাতে খোকাবাবু বল্লেন—দেখো গোপেশ্বরদা, ভুল' না, দেওয়া চাই আমায়। জান, কত দিন হয়ে গেল, বাবা একদিনের জন্য কোলকেতায় যাননি ? ম্যাট্রিকের আগে গিয়ে সেই বাসা ঠিক করে দিয়েছিলেন, আর আজও আমায় একবার দেখতে পর্য্যন্ত বাবার ইচ্ছা হল না। এতই কি কাজ ? হুকুম করলে আমি গিয়েও ত দেখা কর্ত্তুম।"

অমিয়বাবু একটু বিচলিত হলেন। কিন্তু কতকটা যেন কৈফিয়তের মত বলে গেলেন—"তা এ কথা সে বলতে পারে বটে। তবে কি জান গোপেশ্বর, এই বয়সটাতে ছেলেদের পড়া-শোনায় মন দেওয়া ছাড়া, আর কোন দিকে টানতে নেই। আমার কাছে এদেশ-ওদেশ ঘুরতে সময় নষ্ট হবে কত, খরচের কথা না হয় নাই ধরলুম। এবার দেশে ফিরেই আমি দিন কতক তাকে চন্নদনপুরেই আনবো।"

তার পর খানিকক্ষণ চুপ করে বসে কাগজ-পত্র ঘাঁটতে লাগলেন,—কথা যেন আর তাঁর যোগাচ্ছিল না। শেষে একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞাসা করলেন—"তাদের বেশ যত্ন টত্ন করেছিলে ত! কোন কষ্ট পেতে হয়নি?"

—"আজ্ঞে সেকি কথা! রাজার সংসার, তাতে রাজপুত্র এসেছেন নিজের ঘরে, কষ্ট হবে আমি থাক্‌তে? তিন দিন তাঁরা ছিলেন—"

—"তিন দিন—"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। পরদিন আরও চার পাঁচজন এসেছিলেন। খোকা-বাবু আগেই আমায় বলেছিলেন। আর এসেই হুকুম দিছলেন, লোকজন নিয়ে শিবের বাড়ীর চত্বরে পরিষ্কার ক'রে যায়গা করে রাখতে। বল্লেন—'গোপেশ্বরদা, আমরা সব গ্রামের চাষীবাসী নিয়ে একটা সভা ক'রবো সেখানে।' তা বাবু অত বড়টী হয়েছেন, আর অতটা লেকাপড়া শিখে-ছেন, এখনও কিন্তু মেজাজটি তেমনি ঠিক আছে। পাঁচজনের কাছে 'গোপেশ্বরদা' বলে মান্যও আমার বাড়ান।"

গোপেশ্বরের শেষের দিকের কথাগুলো অমিয়বাবুর কাণে সব গেল কি না বল্‌তে পারা যায় না। তিনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করলেন—"গ্রামের লোকজন চাষীবাসীদের জড় ক'রে কিসের সভা হয়েছিল হ্যা গোপেশ্বর?"

গোপেশ্বর বল্লে—"আমি বাবু সবটা শুন্‌তে পাইনি। নানান্ ঝঞ্ঝাটে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। সন্ধ্যার আগেটায় একবার গেছলুম বটে—তখন কলেজের সেই মাষ্টারবাবু চশমা চোখে দাঁড়িয়ে কি সব বলছিল—বলে পেটের খোরাকের জন্যে ধান না বুনে, কেবল বিদেশীদের পেট ভরাবার

জন্যে সব জমিতে পাটের আবাদ করছো বটে, কিন্তু মর্বে শেষে। এখনও বলছি বিলিতী জিনিস কেনা ছেড়ে দাও—নিজেরা তাঁত চালাও, আর মেয়েদের চরকা কাটতে দাও।—"

খপ্ করে অমিয়বাবু বলে উঠ্লেন—"থাক্ হে থাক্, আর বলতে হবে না। সব বুঝতে পেরেছি। কোলকেতায় থেকে তাহলে খোকাবাবুর তোমাদের পিঁপুল পেকেছে, বটে? আচ্ছা—তিনি কি বল্লেন?"

বাবুর মুখের দিকে চেয়ে গোপেশ্বর একটু থতমত খেয়ে বল্লে—"তিনি এক ধারেই বসে ছিলেন, মুখে রা-টি করতে শুনিনি, তা মিথ্যা বলবো না।" আর বেশী কথা সে বলতে পারলে না, চুপ হয়ে গেল।

অমিয়বাবুর মুখটা তখন লাল হয়ে উঠেছিল। অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"যারা এসেছিল—মায় শিশির পর্য্যন্ত, সব আগাগোড়া খদ্দরের পোষাক পরা, নয়? সেই খদ্দরের চাদরখানি পর্য্যন্ত গায়ে দেবার একরকম কায়দা, সব চারিদিকে ঝল ঝল করচে, আস্তিনাটা জামার আধ হাত, কেমন—না?"

গোপেশ্বর ভয়ে ভয়েই একরকম উত্তর দিলে—"আজ্ঞে তা যা বলেছেন। কিন্তু বেশ মানায় বাবু—"

ধমক দিয়ে অমিয়বাবু বল্লেন—"তুমি চুপ কর।" তার পর উঠে দরজার কাছে গিয়ে হাঁক্লেন—"হরা, তামাক দে যা,—ব্যাটার তিন ঘণ্টা দেখা নেই, যেন মরেছে।" আবার ফিরে এসে নিজের যায়গায় বসে গোপেশ্বরের দিকে ফিরে বল্লেন—"আচ্ছা, এইবার তুমি যেতে পার।"

গোপেশ্বর দাঁড়িয়ে খানিকটা ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞাসা করলে—"তা হলে আজই চারটের গাড়ীতে যাব কি?"

অমিয়বাবু বল্লেন—"না। আজ রাত্রে তোমার জন্যে আমি একটা হুকুমনামা লিখে রাখবো,—সেটা নিয়ে তবে চন্নপুরে যাবে।"

—"হুকুমনামা বাবু!—" বিস্মিত হয়ে গোপেশ্বর অমিয়বাবুর মুখের দিকে চাইলে।

—"হ্যাঁ। আমি যাবৎ না দেশে ফিরি, প্রয়োজন মত সেটা ব্যবহার করবে। তোমার উপর হুকুম থাকবে, যে, এবার থেকে শিশির বা অপর যে কেউ হোক্, যারা খদ্দর এঁটে লোক ক্ষেপিয়ে বেড়ায়, তারা চন্নন-পুরের ত্রিসীমানায় আসবে না। তুমি বারণ করে দেবে, যদি মুখের কথা না শোনে, সেই লেখাটা সকলকে দেখিয়ে বাড়ীর ফটক বন্ধ করে দেবে—একেবারে আশ্রয় দেবে না। আমার অন্যান্য জমিদারীতেও ওই মর্মে আমি হুকুমনামা পাঠাবো। তুমি শিশিরকেও আগে জানিও—"

গোপেশ্বর অমিয়বাবুর কথার মর্ম বুঝলে। তার ঠোঁট দুটো পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ হল, চোখটা বুজে এল—সে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। অমিয়বাবুও তখন দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরক্ষণেই বেরিয়ে যাবার জন্যে দরজায় কাছ পর্য্যন্ত গিয়েই, গোপেশ্বর থমকে দাঁড়িয়ে কি যেন একটু ভেবে নিয়ে আবার ফিরে অমিয়বাবুর নিকটে এল। তখন কিন্তু তার মুখে চোখে একটা মিনতির চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। সে ডাকলে—"বাবু—"

তাকে একেবারেই কোন কথা বলতে না দিয়ে, অপেক্ষাকৃত কর্কশ কণ্ঠে অমিয়বাবু বল্লেন—"যাও বিরক্ত করো না, শিশিরের হয়ে তোমায় কোন কথা বলতে হবে না।" বলেই অমিয়বাবু মুখটা ফিরিয়ে নিলেন।

গোপেশ্বর তখন যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সে চলে যেতেই, অপর দিক থেকে অনঙ্গ ঘরে ঢুকে বল্লে—"বাবা, কাজ আর মেটে না! মিন্সেটাকে এতক্ষন ধরে ঘরের মধ্যে আট্‌কে রাখতে হয়? খাঁচার মত ছোট ছোট ঘরগুলো, প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে! এখানা একটু তবু বড়,—তা ঢোকবার যো নেই।"

অনঙ্গ ঘরে আসতেই অমিয়বাবুর মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হয়ে গিছলো। তিনি হেসে বল্লেন—"আর তো সে এখন আসছে না, কত তুমি বসবে বসো না।"

অনঙ্গ উত্তর দিলে—"তবেই হয়েছে। ঘড়ীর পানে চেয়ে দেখনা বারোটা বাজে ওদিকে। নাও ওঠ, না'বার ঘরে জল গরম করিয়ে রাখিয়েছি।"

অমিয়বাবু বল্লেন—"তুমি ত দেখছি নেয়ে নিয়েছ!"

—হ্যাঁ, আমি কোন কালে মার সঙ্গে আজ গঙ্গা নেয়ে এসেছি।"

—"আমিও সেরে নিচ্ছি গো, ভয় নেই।"

—"দেশের খবর সব ভাল? কোলকেতায় ওদের—শিশিরের—"

অমিয়বাবু বিরক্ত হয়ে বল্লেন—"সব ভাল, সব ভাল. তোমার শিশিরও বেশ ভাল আছেন, খুব বিদ্যা উপার্জ্জন করছেন। আর চিন্তা নেই—এইবার তিনি দেশ উদ্ধার করবেন।"

অনঙ্গ খানিকটা অবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে, বল্লে—"কি তুমি বলছো?"

অমিয়বাবু গড়গড়ার নলটা দাঁতে চেপে বল্লেন—"কোলকেতায় ক'বছর থেকে তার অনেক উন্নতি হয়েছে। এখন আর সে শিশিরটি নেই, বুঝলে?'

—"না বুঝতে পারলুম না। ওরকম চিবিয়ে কথা কইলে আমি তা'র মানে বুঝতে পারি না।"

—"আচ্ছা, তবে ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।" এই বলে হাতের নলটা ফেলে রেখে দাঁড়িয়ে উঠে অমিয়বাবু বল্লেন—লেখাপড়া কতদূর কি হচ্ছে তা আমি ঠিক জানি না; কিন্তু সে যে চূড়ান্ত ফাজিল্ হয়েছে তার খবর পেয়েছি। কতকগুলো উন্‌পাঁজুরের সঙ্গে মিশে, সভাসমিতি করে, দেশের লোককে বিদেশী জিনিস ত্যাগ করতে বলে বেড়াচ্ছেন। ইতি-মধ্যে চন্নপুরেও একদিন এসেছিলেন—"

আগ্রহের সহিত অনঙ্গ বল্লে—"চন্নপুরের বাড়ীতে সে এসেছিল?—আহা, আমাদের দেখা পেলে না!"

অনঙ্গর অতিরিক্ত আগ্রহ দেখে অমিয়বাবু চটে গিয়ে বল্লেন—"তোমার বা আমার সঙ্গে দেখা করতে সে আসেনি,—এসেছিল দলবল নিয়ে গ্রামের চাষীদের সব ক্ষ্যাপাতে—তাদের মাথাগুলোর মধ্যে নানা-রকম খেয়াল ঢুকিয়ে দিতে আর সঙ্গে সঙ্গে যাতে বাপের হাতে দড়ী পড়ে, আর এত কষ্টের জমিদারীটা বাজেয়াপ্ত হয়—তার ব্যবস্থা করতে. এইবার বুঝলে ত?"

অনঙ্গ তার চোখদুটো যতদূর সম্ভব ডাগর করে বল্লে—"তোমার কথার সব হেঁয়ালী বাবু আমি বুঝতে পারি না, তোমার হাতে সুখসমাধা দড়ীই বা পড়তে যাবে কেন, আর তোমার এত কষ্টের জমিদারীই বা বাজেয়াপ্ত হতে যাবে কেন?—কে সে সব করবে—শিশির?"

অমিয়বাবু বল্লেন—"তুমি অত্যন্ত বোকা আর ভাল মানুষ। অন্য সময় সে সব বুঝিয়ে ব'ল্‌বো। এখন চল স্নান সেরে নিই গে।

মাথাটা আগুন হয়ে গেছে।" এই বলে তিনি দরজার দিকে অগ্রসর হলেন।

অনঙ্গ পিছন থেকে জিজ্ঞাসা করলে—"যাই হোক—শিশির বেশ ভাল আছে ত ?"

দরজার বার থেকে মুখটা ভার করে অমিয়বাবু উত্তর দিলেন—"আছে।"

১৯

গুড্ ফ্রাইডের ছুটিতে শিশির আর তাদের সান্ধ্যসমিতির জনকয়েক সভ্য মিলে চন্দনপুরে গিয়েছিল। তারা সবই কলেজের ছাত্র। অধ্যাপক সুশীলবাবুও সঙ্গে ছিলেন। তাদের সমিতির মধ্যে পরামর্শ হয়েছিল যে, তারা প্রত্যেক ছুটিতে এক একটা গ্রামের মধ্যে গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করবে, আর দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু শিক্ষা দেবে। এবারে অল্পদিন ছুটি, তাই কাছাকাছি শিশিরদের গ্রামেই যাওয়া হয়েছিল। গোপেশ্বর কথাটা অতিরঞ্জিত করেই অমিয়বাবুর কাণে তুলেছিল, নইলে এমন কিছু জটলা তারা সেখানে করেনি। দু'চারজন মোড়ল গোছের লোককে ডাকিয়ে দেশী জিনিস ব্যবহার করতে অনুরোধ করেছিল মাত্র। বলেছিল—তোমরা সকলে কেনো না বলেই দেশী জিনিস চড়া দরে বিক্রী হয়,—নইলে খরচা পোষায় না। বেশী কাট্‌তি হলেই মহাজন দর কমাতে বাধ্য হবে। গোপেশ্বর আগাগোড়াই সেখানে ছিল,—সেই-ই-ওই সব লোককে ডেকে এনেছিল,—এমন কি সুশীলবাবু যখন উপদেশ দিচ্ছিলেন—গোপেশ্বরই সকলের চেয়ে বেশী ঘাড় নেড়েছিল। তারা শিশিরদের বাড়ীতে তিন দিনও থাকেনি, পাঁচ দিনও থাকেনি, শনিবার বৈকালে গিয়ে রবিবার দু'টোর ট্রেনে কোলকেতায় ফিরেছিল।

দেশে যাবার শিশিরের আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। গোপেশ্বরকে চিঠি লিখে লিখে সে হায়রাণ হয়েছিল বাপের খবরের জন্যে, কিন্তু গোপেশ্বর একখানা চিঠিরও উত্তর দেয়নি। আর টাকাও সব সময়ে ঠিক পাঠাতো না—তাতে অনেক সময় কোলকেতার বাসায় টানাটানি পড়ে যেত। এ সব কথার বিন্দুবিসর্গও সে অমিয়বাবুকে বলেনি।

বামা ইদানীং বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। সে অন্তরে অন্তরে বুঝতে পারছিল, অমিয়বাবুর এতকাল ধরে প্রবাসে থাকবার অর্থ কি। যে মুহূর্ত্তে বামার কাণে গিয়েছিল, যে, অনঙ্গ আর তার মা অমিয়বাবুর সঙ্গে গেছে, আর কোথায় তারা কেউ জানে না, সেই মুহূর্ত্তেই সে বুঝতে পেরে-ছিল যে, এই অজ্ঞাতবাসটা শুধু নির্ব্বিঘ্নে আর নিষ্কণ্টক হয়ে আনন্দ উপ-ভোগ করবার জন্যে। তখন বামার মনে একটা প্রশ্ন উঠলো—বিঘ্ন তাহলে কোথায় আর সুখের পথে কণ্টকই বা কে। মনের মধ্যে তখনই তার সে প্রশ্নের উত্তর মিলে গেল, আর বুকটার ভিতর কাঁটার মত খচখচ করে উঠলো। ভাবলে, আমিই না হয় বিঘ্ন, কিন্তু শিশির? সেও কি তার পথের কণ্টক? বামার মনটার ভিতর গুমরে গুমরে উঠতে লাগলো—সে কথা মনে হতেই। অমিয়বাবুর প্রকৃতির মধ্যে এই নিত্য নানা বৈচিত্র্য দেখে, আর নিজের সন্তানের উপরেও মমতা-হীনতার পরিচয় পেয়ে বামা আড়ষ্ট হয়ে গেল। তার সব চেয়ে বেশী কষ্ট হল এই ভেবে, যে, তার মনের সকল ভাব, অন্তরের সমস্ত ব্যথা শিশিরকেই লুকিয়ে চলতে হবে। লোকের চোখে সে পাচিকা, আর শিশিরের চোখে সে কেবল অভিভাবিকা, এর বেশী সে আর কিছুই নয়।

শিশির বাহিরে যা-ই ক'রে বেড়াক, বামার কাছে এখনও সে ঠিক

পাঁচ বছরের শিশু। এখনও তাকে ময়লা কাপড় ছেড়ে ফর্সা কাপড় পরতে বল্লে তবে সে পরে, জামার বোতামগুলো পরিয়ে না রাখলে অমনিই সে গায়ে দিয়ে যায়। এ সবই সে এতকাল নিজের হাতে করে এসেছে। এখন তবু একটা হাত নিস্তার পেয়েছে সাবিত্রীকে দিয়ে। ভগবানই তাকে জুটিয়ে দিয়েছেন। সে বামার কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিয়ে, এখন শিশিরের অনেক পরিচর্য্যা করে। এতে বামার কাজের যত আসান্ হোক্ না হোক্, একটুখানি শান্তি সে পেয়েছে যে, সব সময়ে শিশিরের সঙ্গে তাকে কথা কইতে হ'বে না।

মনের ভাব চেপে সে আর রাখতে পারছিল না। শিশিরের বাপের নিষ্ঠুরতার যে পরিমাণ কত, বামা তা মনে প্রাণে বুঝলেও, সন্তানের কাছে সে সব প্রকাশ করতে বামার জিভ্ অসাড় হ'য়ে যেত।

দিনটা পাঁচ কাজে ভুলে থাক্‌লেও, রাত্রে বামার শয্যাকণ্টকী হয়। কত বিনিদ্র রাত্রি তার কেটে যায়। সময়ে সময়ে মন তার উত্যক্ত হ'য়ে ওঠে—বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। মনে হয়, চিরদিনের মত কেনই বা আমি আত্মপরিচয় গোপন করবো? লোকের চোখে—সমাজের চোখে সমস্ত গুপ্তকাহিনী প্রকাশ ক'রে দিয়ে, যথার্থ যে দোষী তাকে শাস্তি দিয়ে চলে যাওয়া উচিত নয় কি—ধর্ম্ম নয় কি? একজন রীতিমত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে, এক অল্প বয়সের বিধবাকে দূরদেশে ব্রাহ্মমতে বিবাহ ক'রে, তার সঙ্গে একত্রে পাঁচ বছর সংসার করবার পর, সে যদি অন্য দেশে এসে অম্লান বদনে সমস্ত গোপন করে রেখে হিন্দুসমাজে মিশে যায়, তার সে কথা প্রচার করে দেওয়াই কর্ত্তব্য। উন্মত্ত মন বামার তখনই প্রতিজ্ঞা করে বসে যে, সকাল হলেই সে এর বিহিত করবেই করবে! কিন্তু শিশি-

রের মুখ মনে পড়ে গিয়ে আবার তাকে সঙ্কুচিত করে ফেলে! আর সে ভাবতে পারে না, সমস্ত দেহটা তখন বামার হিম হ'য়ে যায়;—বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত সেই অসাড় নিস্পন্দ দেহখানা সে শয্যার উপর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে। শিশির যেন তার সমস্ত অন্তরটা জুড়ে আছে, তার দেহের প্রতি লোমকূপের ভিতর দিয়ে যেন শিশিরের জন্য স্নেহধারা বর্ষণ হচ্ছে—মানুষ করা ছেলের উপর এত মমতা! শিশিরের উপর তার এই রকম অত্যধিক টান দেখে, অনঙ্গ একদিন শ্লেষ করে বলেছিল—'মার চেয়ে যার দরদ বেশী তাকেই বলে ডা'ন।'

যেদিন শিশির চন্দনপুরে যায়, তারই দিনকতক আগে থেকে সাবিত্রীর মার শরীর বড়ই খারাপ হয়েছিল।

অনেক দিন থেকেই ঘুসঘুসে জ্বর হ'ত, কিন্তু নিস্তারিণী কারো কাছে সে কথা প্রকাশ করেনি। দারুণ অবসাদে তার দেহ-মন আচ্ছন্ন ক'রে, তার দেহে অকাল-বার্দ্ধক্য এনেছিল। কেবল ঘটনাচক্রে পড়ে' বামার মত একজন মমতাময়ী বিচক্ষণ নারীর হাতে এসে পড়েছিল বলেই কোন গতিকে দিনটা তার কেটে যাচ্ছিল। নইলে সহায়সম্পত্তিহীনা বিধবার উপায় যে কি হত, তা ভগবানই জানেন। অভাবে আর দুশ্চিন্তায় নিস্তারিণীর দেহ জর্জ্জরিত। এখন সকল ভাবনাকে ছাপিয়ে উঠেছে সাবিত্রীর ভাবনা। তের পেরিয়ে মেয়ের বয়স চৌদ্দয় ঠেকেছে,—বিবাহ আর না দিলেই চলে না। অথচ এই বিধবার কন্যা—তাতে অভাবগ্রস্তা—আত্মীয়-স্বজন-পরিত্যক্তা, এ ক্ষেত্রে কেই বা পাত্রের সন্ধান করে। নিস্তারিণী বামার কাছে যখন তখনই দুঃখের কথা জানা'ত।

বামা আশ্বাস দিয়ে বলতো—আমি শিশিরকে বলেছি তা'র বন্ধু-

বান্ধবদের ভিতর পাত্রের সন্ধান করতে। কোন ভাবনা তোমার নেই বোন্। শিরোমণি মশাইও একটি বারেন্দ্রের ঘরের পাত্রের সন্ধান পেয়েছেন—ছেলেটি কোন্ আপিসে চাকুরী করে। একদিন সাবিত্রীকে তারা দেখতে আস্‌বে।

এই সব জল্পনা-কল্পনা করতে করতে আরও কয়েক মাস কেটে গেল। তারই মধ্যে দু'বার সাবিত্রীকে দেখতে আসার কথা ছিল, কিন্তু দিনের দিন কেউই এল না।

দুঃখ করে নিস্তারিণী বল্লে—"তুমিও যেমন দিদি! আমি অবীরা বিধবা, কোন সংস্থানই নেই, কিছু দিতে পারবো না শুনেই তারা পেছুলো। কি হবে দিদি, আমি বেঁচে থাকৃতে থাকৃতে, তোমরা পাঁচ-জন সহায় থাকৃতে থাকৃতে, মেয়েটার একটা গতি করতে পারলেও ত বুঝি।"

বামা সাহস দিয়ে বল্লে—"অত ভাবনাই বা কেন তোমার? কতই আর সাবিত্রীর বয়স, যে আর তাকে রাখা যায় না?"

নিস্তারিণী বল্লে—"চৌদ্দ বছর যে দিদি, আর কি বে' না দিলে চলবে? তাতে আমি গরীব দুঃখী, সমাজে আমাকেই বেশী হেনস্তা করবে—দুঃখীর নানান্ জ্বালা; পাঁচজনে পাঁচ কথা ক'বে—গঞ্জনা দেবার বেলা অনেক আপনার লোক আস্‌বে দিদি।"

বামা বল্লে—"আচ্ছা, আমি সন্ধান নিতে বলছি কেন তারা এল না। তা'বলে সত্যিই যদি গরীবের মেয়ে আর পাওনা থোওনা নেই ভেবে পেছিয়ে থাকে, তাহলে আমিও সে পাত্রে মেয়ে দিতে দেব না। সাবি-ত্রীর মত মেয়েই বা ক'টা মেলে বোন্?"

—"আজ যদি তিনি থাকতেন! অনেক করে লেখাপড়া শিখিয়ে ওই মেয়েকে মানুষ করছিলেন—" বলেই নিস্তারিণী কেঁদে ফেল্লে।

বামা বল্লে—"চুপ কর বোন্, কেঁদ না,—আমি যেমন করে হোক্ ভাল ছেলে খুঁজে বার করবো।"

দিনকতক পরে একদিন বিকালে নিস্তারিণীর খুব প্রবল জ্বর হ'ল। মুখটা শুষ্ক করে সাবিত্রী এসে বল্লে—"মাসীমা, মা'র আজ বড্ড জ্বর—একেবারে হুঁস্ নেই,—ডাক্‌লে সাড়া দিচ্ছে না, মুখ দিয়ে কেবল লাল পড়ছে। কেন মাসীমা এমন হ'ল?"

বামা তখন শিরোমণি মশা'য়ের জন্তে আলোচাল বেছে তুলে রাখছিল। তিনি প্রত্যহ স্বহস্তে পাক ক'রে খেতেন।—"চ' দিকি আমি দেখছি"—বলেই সঙ্গে সঙ্গে বামা গিয়ে নিস্তারিণীর গায়ে হাত দিয়েই বল্লে—"ইস্! গা' যে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে! শিশির বাড়ী নেই, তাই তো।"

সাবিত্রী তার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে বল্লে—"শিশিরদা' কবে আসবে মাসীমা? চন্ননপুর কি অনেক দূরে?"

বামা বল্লে—"আজ বিকালেই ত তাদের ফেরবার কথা। তাই ত, —এমন জ্বরটা হ'ল! যা' তো, একবার শিরোমণি মশাইকেই ডেকে আন্ দিকি—বোধ হয় সেই কোণের ঘরটায় বসে' তিনি কি পড়ছেন।"

সাবিত্রী তখনই তাঁকে ডেকে আন্‌লে। তিনি বামার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"আমায় কি দরকার মা?"

বামা বল্লে—"এঁর জ্বরটা আজ বড় বেশী বোধ হচ্ছে। শিশির ত এখনো এলনা।" বলেই সে তাঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

শিরোমণি মশাই বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নিস্তারিণীর নাড়ীটা পরীক্ষা করে চিন্তান্বিত হয়ে বল্লেন—"হুঁ্যা—জ্বরটা খুবই প্রবল বটে। আমি এখনি ডাক্তারকে ডেকে আনছি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন"—বলেই তিনি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সাবিত্রী বামার খুব কাছ ঘেঁসে ডাকলে—"মাসীমা!"

—"কি? ভয় কি মা, জ্বরটা বেশী হয়েছে, একটু কম্‌লেই কথা কবে'খন। একটু পাতলা ফর্সা ন্যাকড়া আর জল আন্‌ দিকি, তৎক্ষণ কপালে জলপটী দিই।"

শিরোমণি মশাই যখন ডাক্তার সঙ্গে করে বাড়ীতে ঢুকছেন, ঠিক সেই সময় শিশিরও এসে পৌছল। তাঁর মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনে কাপড় চোপড় না ছেড়েই একেবারে ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গেই নিস্তারিণীর ঘরে গিয়ে হাজির হল। তাকে দেখেই বামা জিজ্ঞাসা করলে—"এখনই এলে বাবা? খবর সব ভাল ত?"

একটা ছোট্ট রকম 'হুঁ' বলেই শিশির রোগিনীর বিছানায় বসে' পড়লো।

ডাক্তার রীতিমত পরীক্ষা করতে লাগলেন। পরীক্ষা শেষ হলে, জেরা করে করে ব্যারামের আগাগোড়া বৃত্তান্ত জেনে বুঝলেন, প্রায় দু'টি বছর ধরে এই জ্বর হচ্ছে, আর নিস্তারিণী বরাবরই চেপে রেখেছে।

সাবিত্রী বল্লে—তার মা ইদানী যখন তখন বল্‌তো যে, সমস্ত পা'দুটো মাঝে মাঝে ঝিন্‌ ঝিন্‌ করে, আর থেকে থেকে মনে হয়, যেন কোমর থেকে সবটা অসাড় হয়ে যায়।

তখন ডাক্তার আরও একবার পা'টাগুলো নেড়ে চেড়ে দেখে, বুকটা

পরীক্ষা করলেন। তার পর গম্ভীর ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শিশিরের বস্‌বার ঘরে গিয়ে একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

শিরোমণি মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—"বড় কি শক্ত ব্যারাম ডাক্তার বাবু?"

ডাক্তার বাবু বল্লেন—"আজ আমি ঠিক্ বল্‌তে পাচ্ছি না, কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, রোগটা বড়ই শক্ত। জ্বর কম্‌বে বটে কিন্তু—"

শিশির বল্লে—"লুকবেন না আমাদের কাছে, সব খুলে বলুন, নইলে তদ্বির হ'বে কি করে?"

ডাক্তার তখন বল্লেন—"It seems to be paralysis."

—"Paralysis!—বলেন কি?"

ডাক্তার বল্লেন—"Yes, no doubt of it and that for want of propor nourishment and excessive mental worries."

শিরোমণি মশাই বল্লেন—"শুন্‌লেন ত সবই? স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে এক রকম ইচ্ছা করেই প্রাণটা খোয়াতে বসেছেন। মুখের কথাও কখন একটার বেশী দুটো শুনিনি। তাহলে এখন উপায় কি ডাক্তার বাবু?"

—"প্রেস্‌ক্রপ্‌শন্ লিখে দিচ্ছি। জ্বর দু'দিনেই কমে যাবে. চিন্তা নেই। কিন্তু বিছানা থেকে ওঠ্‌বার শক্তি বোধ হয় আর হবে না। একটু তদ্বির করবেন—আর সাবধানে থাকবেন যেন এর উপর আবার পড়ে টড়ে না যান্।"

শিশির সকলকে রীতিমত সাবধান করে দিয়ে চট্‌পট্ ওষুধ আন্‌তে চলে গেল।

বামা আর সাবিত্রী সবই শুনলে। সাবিত্রীর বুকের ভিতর কেঁপে উঠলো। সে মা ছাড়া আর কিছুই জানে না। বামার কোলে মুখটা গুঁজে দিয়ে সে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

বামা চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বল্লে—"কাঁদিস্‌নি মা, ভগবানকে ডাক্। চিকিৎসা তদ্বিরের কোন ত্রুটি হতে দেব না।"

শিশির সারা রাত্রি ধরে নিজের হাতে ওষুধ খাওয়াতে লাগলো। সাবি-ত্রীকে মোটে কাছে ঘেঁসতে দিলে না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় মালিশ করবার জন্যে একটা ওষুধ ছিল। ডাক্তার বিশেষ করে বলে দিছলো, খুব সন্তর্পণে আস্তে আস্তে মালিশ করতে হবে, যেন দেহ একটুও না নড়ে। সেইজন্যে শিশির আর কারও হাতে বিশ্বাস করে সে ভার দেয়নি। মালিশটার বেলায় সাবিত্রী অনেক ওজর আপত্তি করাতে সে ঝেঁজে উঠে বল্লে—"এ কাজ তোমার দ্বারা হতেই পারে না, তুমি ছেলেমানুষ।"

সাবিত্রী রাগ করে বল্লে—"হ্যাঁ—আপনি মশাই ভারি বুড়ো মানুষ। তুমি জান—আমি মাকে একলা দেশ বিদেশে ঘুরিয়ে এনেছি।"

শিশির বল্লে—"তুমি ঘুরিয়ে এনেছ না মা তোমাকে ঘুরিয়ে এনেছে? একরত্তি মেয়ে—খালি কথার সুমুদ্দুর। যাও—ওইখানে ঘুমও গে,—যখন ওষুধ খাওবার সময় হবে, আমি তোমায় ডাকবো'খন।"

সাবিত্রী খানিক গজ গজ করে শেষকালে বসে বসে ঢুলতে লাগলো।

২০

ডাক্তারের সন্দেহই অবশেষে সাব্যস্ত হল। দু'সপ্তাহ চিকিৎসা করে সাবিত্রীর মার জ্বর বন্ধ হল বটে, কিন্তু কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত একেবারে অবশ হয়ে গেল। চিকিৎসা সমভাবে চলতে লাগলো, তদ্বিরেরও কিছু ত্রুটি হল না ; কিন্তু ফল কিছুই হল না। আর একজন বড় ডাক্তারকে এনে শিশির পরীক্ষা করালে। তিনিও বিশেষ কোন আশ্বাস দিতে পারলেন না, অধিকন্তু বলে গেলেন যে, ক্রমে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হবে—এখন থেকেই তার সূচনা বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে।

বড় ডাক্তার যখন এই সকল কথা বলছিলেন, তখন সাবিত্রীও সেখানে ছিল। এর পূর্ব্বে সাবিত্রীকে ডাক্তারদের মতামত শুনতে দেওয়া হত না। শিশির বা বাঞ্ছারাম যতটুকু বলতো ততটুকুই সে শুনতে পেতো। আজ তারা কেউ কোন কথা লুকবার চেষ্টা করলে না ; কারণ যেটা ধ্রুব সত্য, যা মানুষের সাধ্যাতীত, তা সাবিত্রীর এখন থেকেই শুনে রাখা ভাল ; তাহলে একটু একটু করে সে বরং প্রস্তুত হতে পারবে। যে কোন মুহূর্ত্তে নিস্তারিণীর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া লোপ হতে পারে এইটাই ডাক্তারদের অভিমত। সাবিত্রী সকল কথা শুনে নিশ্চল পাথরের মত বসে রইল।

ডাক্তারদের বিদায় করে দিয়ে শিশির ঘরে ঢুকে দেখলে—সাবিত্রী

তেমনি একভাবে বসে আছে—যেমনটি সে তাকে দেখে গিয়েছিল। তার স্থির নিশ্চল মূর্ত্তি দেখে শিশিরের বড় দয়া হল। এখন থেকে সে তাকে মাতৃহারা কল্পনা করে তার অসহায় অবস্থা ভেবে নিজের অন্তরেও ব্যথা অনুভব করলে। তার মর্ম্ম ভেদ করে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে ধীরে ধীরে বাহিরের বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা কইতে পারলে না, কথা কইবার কিছু ছিলও না। কিছুকাল এই ভাবে কেটে যাবার পর, গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে, শিশির সাবিত্রীর আরও নিকটে এসে তার একখানা হাত ধরে আস্তে আস্তে বল্লে—"কি করবো, সাবিত্রী, কোন উপায়ই ত করতে পারলাম না। চেষ্টার ত্রুটি ত হতে দিই নি, এখনও যতদূর সম্ভব তা করবো,—তোমার মাসীমারও সেই ইচ্ছা,—কিন্তু শুনলে ত, মানুষের সাধ্যাতীত!"

সাবিত্রীর মুখ দিয়ে কোন কথা বার হল না, কেবলমাত্র তার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সজল চোখ দুটি তুলে একবার শিশিরের মুখের দিকে চাইলে। তার সেই একান্ত নির্ভরশীল কাতর দৃষ্টিটুকুই যেন জানিয়ে দিলে—ওগো, তুমি ঢের করেছ,—আমার অতি আপনার যারা, তারাও যা পারে নি বা করে নি, আজ আমার এই বিপদে তুমি তার চেয়েও অনেক বেশী করেছ। আমার কথা ক'বার শক্তি নেই, কৃতজ্ঞতা জানাবার মত ভাষা আমি খুঁজে পাচ্চি না, তাই আমি তোমায় আমার অন্তরের কথা জানাতে পারলুম না।"

মুহূর্ত্তেকের জন্য শিশিরের মুখের দিকে চেয়ে, সাবিত্রীর দৃষ্টি নত হয়ে পড়লো,—তার দু' চোখ দিয়ে তখন বৃষ্টিধারার মত জল

হু হু করে ঝরছিল। সে চোখে আঁচল দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শিশিরও প্রেস্‌ক্রুপশন্‌খানা পকেটে ফেলে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল।

তার দিন কয়েক পরে একদিন দুপুর বেলা কাজ-কর্ম্ম সেরে, সাবিত্রীকে জোর করে দুটো খাইয়ে, আপনিও যা তা করে একমুঠো খেয়ে নিয়ে, খামা নিস্তারিণীর শয্যাপার্শ্বে গিয়ে বসলো।

দুপুর বেলা হতে প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সাবিত্রী তার মার সকল পরিচর্য্যা করতো। তার পর সারা রাত্রির ভার শিশির স্ব-ইচ্ছায় আপনার হাতে তুলে নিয়েছিল। রোগীর সেবা করতে তার আনন্দ হত। সুশীল বাবুর ছাত্রেরা নানা ভাবে গড়ে উঠছিল। তারা জানতো, আন্তরিকতা না থাকলে খাঁটি মানুষ হওয়া যায় না। প্রকৃত দেশ-সেবক হতে হলে আর্ত্তেরও সেবা করতে হবে—পরের দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হবে—জীবকে শিব-জ্ঞানে পূজা করতে হবে। সান্ধ্য-সমিতিতে তাদের এ সকল আলোচনাও হত।

সুশীলবাবু নিজেও রোগীর সেবা করে বেড়াতেন। এই সব কাজের সুবিধা হবে বলে তাদের সমিতির মধ্যে দু' একজন ডাক্তার আর জন-কয়েক মেডিকেল কলেজের ছাত্রও থাকত, তারা কিছু কিছু চিকিৎসা সম্বন্ধে অপর সভ্যদের শিক্ষা দিত। একটু একটু করে তারা যখন এই সব কাজে নামতে লাগলো, সুযোগ পেলে বা সন্ধান পেলে আর্ত্ত রোগীদের সেবায় নিজেদের নিযুক্ত করতে লাগলো, তখন আবার তাদেরই সমিতির ভিতর থেকে দু' একজন করে সভ্য ক্রমশঃ গা ঢাকা

দিলে। তারা শুধু শুনতে চায়, কাজে নামবার মত সাহস তাদের নেই। ইদানীং শিশিরের বন্ধু নলিনীও বড় একটা আসতো না। সে এই সব রোগী-টোগী ঘাঁটা পছন্দ করতো না।

সভ্যেরা অনেকেই প্রথম থেকে খদ্দরের পিরাণ, কেউ কেউ কাপড়ও ব্যবহার করতে স্বরু করেছিল। যারা কাজ করতো তারাও পরতো, আর যারা গা ঢাকা দিয়েছিল তারাও তা পরে পথে-ঘাটে বেড়াত; কেবল নলিনী তা পারে নি। সে একদিন তর্ক তুলেছিল, জিজ্ঞাসা করেছিল—'খদ্দরই যে ব্যাভার করতে হবে তার মানে কি?' তাতে সুশীলবাবু বলেছিলেন, 'আর কিছু না হোক, অন্ততঃ একটা symbol—একটা national dress হিসাবে ব্যবহার করলে মন্দ হয় না। যন্ত্ররাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারুক চাই না পারুক, দামে চড়া বলে গরীবেরা আগাগোড়া কিনতে না পারুক—এতদ্দ্বারা মস্ত বড় একটা উদ্দেশ্য সাধন হয়, যদি অন্ততঃ পক্ষে একটুকরো খদ্দর কাছে রাখতেই হবে এমন আইন করা যায়। পাঞ্জাবীরা দেখেছি পুরো সাহেবী পোযাক পরে, কিন্তু হ্যাট্‌টি মাথায় দেয় না, তার জায়গায় পাগড়ী বাঁধে,—জিজ্ঞাসা করেছিলুম তাতে একজন বলেছিল, we wear national head dress। আজকাল তারা খদ্দরের সেই সব পোষাক করায়—কেউ কেউ পাগড়ীর বদলে গান্ধী-টুপিও পরে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বামাকে বাহিরে ডেকে শিরোমণি মহাশয় কি কতকগুলো কথা বলে যাবার পর, আবার যখন সে নিস্তারিণীর কাছে গিয়ে বসলো—নিস্তারিণী তখন বামাকে জিজ্ঞাসা করলে—"কি দিদি, শিরোমণি মশায় কি বলে গেলেন?"

প্রথমটা বামা সে কথার কোনও জবাব দিল না।

নিস্তারিণী আবার বল্লে—"শুনতে পেলে না দিদি? সাবিত্রীর নাম করে করে উনি কি তোমায় বলছিলেন?"

মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে বামা বল্লে—"ও কিছু নয়। তোমার শোন্‌বার কথা নয়।"

নিস্তারিণী বল্লে—"সাবিত্রীর কথা হচ্ছিল যে? বল না, আমার কাছে আর লুকন কেন দিদি, আমার ত ফাঁসীর হুকুম হয়ে গেছে, আর কেন?" বলেই একটা চাপা নিশ্বাস ফেল্লে। ইদানীং দু' একটা কথা কইলেই তাব হাঁফ ধরতো—নিশ্বাস কেমন আটকে আটকে পড়তো।

বামা নিস্তারিণীকে বল্লে—"একটু চুপ করে শোও দিকি, পুরনো ঘি বুকে মালিশ করে দি। বড় কষ্ট হচ্চে, না বোন?"

সে কথার উত্তর না দিয়ে নিস্তারিণী বল্লে—"আজ তাদের আসবার কথা ছিল না—সাবিত্রীকে দেখতে?"

বামা বল্লে—"হাঁ।"

—"এসেছিল তা'রা?"

—"এসেছিল।"

—"সাবিত্রীকে দেখেছে? তুমি আমার কাছে কথা চাপছো কেন? দেখে কি বল্লে?"

—"মেয়ে পছন্দ হয়নি।"

—"পছন্দ হয়নি!—সাবিত্রীকে পছন্দ হয় নি? না দিদি, তুমি আমায় ঠাট্টা করছো।"

—"এই কি ঠাট্টার সময় বোন্? না, সত্যিই পছন্দ হয়নি। ওখানে বে' হ'বে না। তা'রা সাবিত্রীকে বৌ ক'রবে না।"

একটু চুপ করে থেকে নিস্তারিণী বল্লে—"অমন মেয়েকেও পছন্দ ক'রলে না!—কত তা'রা চায় দিদি? নেই ত আমার কিছু, তবু শুনি! আমাদের ঘরে ছেলে-মেয়ের বে' হওয়া বড় শক্ত। পাত্রী মেলে ত ভাল পাত্র মেলে না,—যা'কে তা'কে ধ'রে দিতে হয় তাও বিস্তর দিয়ে। আর পাত্র যদি একটু ভাল হ'ল, কি একটা পাশ ক'রলে, তার মত টাকা জোটে না। রাঢ়ী শ্রেণীতে শুনিছি পাত্র আছে, তা' তাদের সঙ্গে ত করণ-কারণ নেই।"

বামা জিজ্ঞাসা করলে—"কেন নেই?"

—"কর্ত্তারা সেকালে করেনি দিদি! কেন যে ছেলে-মেয়ে দেওয়া-নেওয়া হয় না, তা জানি না। তা চল্লে দু' পক্ষেই না কি ভাল হত তিনি বলতেন। সহজে পাত্র পাত্রীও মিলতো, আর দাঁও ভেবে এতটা কষাইগিরিও কেও করতে পারতো না। আজ টাকার জন্যেই ফিরে গেল দিদি, সাবিত্রীর মত মেয়েও পছন্দ করলে না, টাকাটাই এত বড় করে দেখলে!"

বামা বল্লে—"টাকার জন্যে সাবিত্রীর বে' আটকাবে না বোন্, আমি তোমায় এই কথা দিলুম। সাবিত্রীর মার টাকা না থাকলেও তার মাসীর যা কিছু আছে, আজ ধরে দিত। কিন্তু তারা ত টাকার কথা তুল্লে না। বল্লে খালি—'এ মেয়ে আমরা নিতে পারি না।"

শিশির ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বল্লে—"শিরোমণি আর গোপেশ্বরদা' না থাকলে আমি বেটাদের মেরে তাড়াতুম—এতবড় স্পর্দ্ধা! আমার

বাড়ীতে বসে এতবড় কথা কইতে সাহস করে! না এলেই ত পারতো। মেয়ে দেখতে চাওয়া কেন?"

বামা অনেক রকম ইসারা করেও শিশিরকে থামাতে পারলে না। মাথার দিক থেকে সে অনবরত হাত নেড়ে শিশিরকে চুপ করতে বল্‌ছিল। শেষে অপারগ হয়ে একটু চেঁচিয়ে বল্লে—"তুই যে গোপেশ্বরদা' বল্‌ছিলে? এর মধ্যে সে আবার এল কখন?"

শিশির শেষটা বামার ইসারা বুঝতে পেরেছিল, সামলে নিয়ে বল্লে—"এই কতক্ষণ এসেছে। সাবিত্রীকে যখন দেখাতে নে যাই, গিয়ে দেখি জুতো খুলে বসবার জোগাড় করছে।"

বামা জিজ্ঞাসা করলে—"সে যে বড় হঠাৎ কোলকেতায় এল?"

—"বল্লে টাকাটা দেবার সময় হয়েছে, বাবুর একখানা চিঠিও পেয়েছি। তাই ভাবলুম, একবার সব আপনাদের দেখে শুনে আসি, আর বাবুর ঠিকানাটাও দিয়ে আসি।"

—"তা বেশ করেছে— সে ত একবারও হেতা আসেনি।"

—"কাল সকালেই যাবে।"

নিস্তারিণী এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। বামার আর শিশিরের কথার ভাবে তার মনে একটা খটকা লেগেছিল। বে'র প্রস্তাব ভেঙে যাবার আসল কারণ কি তা' সে ভালরকম বুঝতে পারছিল না। এখন এরা চুপ করতেই সে বল্লে—"বাবা শিশির, তোমরা আমার কাছে কোন কথা লুকিও না। সব খুলে বল। আমি আর ক'দিন বাবা? কেন প্রাণে একটা খেদ নিয়ে মরবো? আমায় বল, কেন তারা সাবিত্রীকে পছন্দ করলে না? দেখতে ভাল নয় বলে?"

শিশির বল্লে—"না—সে কথা তারা বল্‌তেই পারে না।"

—"তবে কি দেনা-পাওনা নিয়ে? অনেক টাকা চায়?"

—"না। দেনা-পাওনার কথা তোলবার আগেই তারা ভেঙে দিয়েছে।"

—"তা হলে বে' ভেঙে দেবার কারণ কি?" বলে নিস্তারিণী তীব্র দৃষ্টিতে শিশিরের মুখের দিকে চাইলে। সেই পলকশূন্য দৃষ্টিতে তখন রোগীর স্বাভাবিক জ্যোতি-হীনতার চিহ্নও ছিল না, অথবা কোন রূপ ভয়-সঙ্কোচ বা জড়তাও ছিল না।

শিশির চেয়ে দেখলে তার সমুখে শুয়ে আছে একজন মহিমময়ী নারী, আর তার চোখের দৃষ্টিতে রয়েছে বিচারকের তীব্র অনুসন্ধিৎসা।

শিশিরের মাথা নুয়ে পড়লো।

নিস্তারিণী আবার জিজ্ঞাসা করলে—"বল বাবা, যা সত্য তাই বল, আমি শুনতে চাই, আমায় লুকিও না।"

শিশির বল্লে—"আমায় মাপ করবেন, আমি সে কথা মুখে আন্‌তে পারব না। তুমি ত সবই শুনেছ, তুমি বল।" বামার দিকে চেয়ে এই কথা বলেই সে ত্বরিৎপদে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

সোঁ ভরে আপনার পড়বার ঘরের কাছ-বরাবর গিয়েই শিশির একেবারে থম্‌কে পড়লো। সেখান থেকে বেরুচ্ছিল সাবিত্রী. তখনও তার ভাল কাপড় চোপড় যেমন তেমনই পড়া রয়েছে—যে বেশে তাকে পাত্রী দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ঠিক একখণ্ড উল্কাপিণ্ডের মতই সে এসে শিশিরের সমুখে দাঁড়িয়ে বল্লে—"আমি তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম শিশিরদা।"

শিশির সাবিত্রীর অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে চম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা করলে —"আমায় খুঁজছিলে—কেন সাবিত্রী?"

সাবিত্রী বল্লে—"কেন—কেন—কেন তুমি আমায় অপমান করবার জন্যে ওদের কাছে নিয়ে গিছলে, আমি কি দোষ করেছিলুম?"

শিশির সাবিত্রীর এ মূর্ত্তি একদিনও দেখেনি। সে থতমত খেয়ে গিয়ে বল্লে—"ও কি ও! তুমি অমন ক'রছো কেন? ঘরে চল, ঠাণ্ডা হও"—

সাবিত্রী সে কথা কাণে না তুলেই বলে যেতে লাগলো—"তেজপুরের চা-বাগানের কথা শোন্‌বার যদি তোমার একান্তই ইচ্ছা হ'য়েছিল, তা-হ'লে আমাকেই ত সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পার্‌তে; আমাকে এই রকম ক'তক গুলো ছোটলোক ইতরদের কাছে নে' গিয়ে—"

—"সাবিত্রী!"—

সাবিত্রী শিশিরের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, শিশিরের মুখখানা তখন লাল হ'য়ে উঠেছে, আর তা'র চোখ দু'টো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আস্‌ছে!

সাবিত্রীর মুখ বন্ধ হ'য়ে গেল। সে এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে, তাড়াতাড়ি আপনার আঁচলখানা নিজের গলায় দিয়ে হাঁটু গেড়ে শিশিরের পায়ের কাছে বসে পড়ে বল্লে—"আমায় মাপ কর শিশিরদা, আমি অন্যায় বলেছি।"

শিশির তখন আপনাকে সংযত করে ফেলেছে। সে একটু ঝুঁকে সাবিত্রীর হাতটা ধরে, তাকে তুলে বল্লে—"আমি কিছুই জানতুম না সাবিত্রী। ঘরে এসে বস, আমি সব বুঝিয়ে বল্‌ছি।" এই বলে সে অগ্রসর হল।

২৯

রাত্রে ভাত বেড়ে দিয়ে বামা গোপেশ্বরকে ডেকে পাঠালে। সে এসেই আগে বামাকে সাষ্টাঙ্গে একটী প্রণাম করে, তার পায়ের ধূলো একটু জিভে-মাথায় ঠেকিয়ে, তার পর আসনে বসলো।

গোপেশ্বরের পক্ষে এ ব্যাপারটা একেবারেই নূতন বলে বামা খানিক অবাক হ'য়ে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলে—"দেশের সব খবর ভাল ত গোপেশ্বর? তোমার শরীর এত রোগা কেন?"

তাতে সে একবার চোখটা বুজে, একটা ঢোঁক্ গিলে জবাব দিলে—"আমাদের আর ভাল থাকা। রোজ রোজ বাবুর এক একটা হুম্‌কি চিঠিতে আস্‌ছে, পেটের পিলে চম্‌কে দিচ্ছে। জমিদারের গোমস্তা-গিরি করা একরকম যমের বাড়ী চাকরী করা। তার ওপর পেটভরে খেতে পাইনে—রোগা কি সাধে বামুন মা?"

অনেক দিনের পর গোপেশ্বরের মুখে 'বামুন মা' শুনে বামা একটু বিচলিত হল। একবার এদিক ওদিক চেয়ে তখনই তা সাম্‌লে নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কেন, পেট ভরে' খেতে পাও না কেন?"

—"কে আর তেমন রেঁধে খেতে দেবে? আপনি ছিলেন সে বাড়ীর অন্নপূর্ণা; এখানে আপনি এসে পর্য্যন্ত কি আর কিছুর ভাগ্যি আছে? বাড়ীর কেউই আপনার কথা ভুল্‌তে পারিনি। এক বেটা উড়ে বামুন

—তার যেমন রাঁধবার ছিরি! এই সেদিনে খোকাবাবু পাঁচজনকে নিয়ে সেথায় গেল,—তা কি-ই বা খেতে দি, আর কে-ই বা যত্ন করে।"

—"শিশির এসে তোমার অনেক সুখ্যাতি করেছে গোপেশ্বর! বল্লে 'গোপেশ্বরদা' ছিল বলেই আমাদের সেথাকার কাজ নির্ব্বিঘ্নে হয়েছে। নইলে কি যে করতুম তার ঠিক নেই।"

গোপেশ্বর মুখটা একটু বেঁকিয়ে চোখ দুটো আধ-বোজা করে একটু-খানি হেসে বল্লে—"তাইতেই আগুন নেগেচে"—বলেই ভাত মাখতে লাগলো।

বামা তার কথার রকম-সকম দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"আগুন লেগেছে কি ?"

হঠাৎ যেন মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেছে এই রকম ভাব দেখিয়ে, গোপেশ্বর বল্লে—"সে আর আপনি শুনবেন কি,—আপনার তা শোন-বার কোন দরকার নেই।"

বামা অপেক্ষাকৃত চঞ্চল হয়ে বল্লে—"না গোপেশ্বর, শিশিরের বিষয়ে কোন কথা আমার কাছে গোপন করো না। সে কি সেখানে কিছু অন্যায় কাজ করেছিল? তুমি জান, আমার জিম্মেয় সে আছে?"

গোপেশ্বর তখন বল্লে—"অন্যায় কাজ খোকাবাবু কিছুই তেমন করে নি! যা মানুষের কাজ তাই করেছিল। যা সত্য তাই করেছিল।"

—"তবে ?—"

—"আপনি না শুনেই যখন ছাড়বেন না তখন কাজেই বল্‌তে হ'ল। খোকাবাবু কোথা?" বলে গোপেশ্বর একবার এদিক ওদিক চাইলো, —যেন সে সকলের কাছেই কথাটা গোপন করতে চায়।

—"সে এখনও বাড়ী আসেনি। রবিবার সন্ধ্যার পর তাদের সভা বসে, সে সেইখানে গেছে। এ বাড়ীতেও তারা মাঝে মাঝে বস্‌তো। আজকাল একজন শক্ত রোগী আমাদের ঘরে আছে বলে, হেথা গোল-মাল হতে দেয় না।"

গোপেশ্বর বল্লে—"হ্যাঁ—তখন বাঙ্গা ঠাকুরের কাছে শুনলুম বটে। তা ওঁরা কারা ?"

একমাত্র গোপেশ্বরই শিরোমণি মশায়কে 'বাঙ্গা ঠাকুর' বলতো। কতকগুলো বদ্ অভ্যাস তার ছিল। ভটচাযি্য বল্‌তে সে নাকটা বেঁকিয়ে কথা কইত, আর বলতো, 'ওসব চালকলা বাঁধার দল। পৈতে নিলে আমরাও ব্রাহ্মণ হতে পারি।'

বামা বল্লে—"ওঁদের অনেক দুঃখের কাহিনী বাবা, শুনলে চোখে জল আসে। এই বাড়ীর নীচেতেই আগে ওঁরা ভাড়া থাকতেন। এখন বড় বিপদ। তুমি যা বল্‌ছিলে, বল না? শিশির সেখানে কি করেছিল ?"

গোপেশ্বর সে কথায় কাণ না দিয়েই জিজ্ঞাসা করলে—"একটী চমৎ-কার ডাগর মেয়েও তখন দেখলুম। আজ বুঝি তাকে দেখতে এসেছিল ? নীচেকার ঘরে সে এক পেল্লয় কাণ্ড।—বলে 'সাহেবে যার হাত ধরেছিল, টেনে নে গেছলো, তার মেয়েকে আমরা কুলের বৌ করতে পারি না।' সে অনেক কথা। মেয়েটা কাঠ্ হয়ে বসে রইলো, আমরা ত অবাক্!"

বামা গোপেশ্বরের চোখ মিট্‌ মিট্‌ করে এই রকম কথা কহাতে ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে পড়ছিল, বল্লে—"সে যা আছে তা আছে। মানুষে

মানুষের কুৎসা করতেই ভালবাসে গোপেশ্বর। তুমি যা বলছিলে বল না? শিশির কি দোষ করেছিল?"

গোপেশ্বর তখন যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই বল্লে—"গাঁয়ে শত্রুর ত অভাব নেই, একটু ছুতো পেলে হয়। পুলিশে কে খবর দেছে যে, জমিদার বাবুর ছেলে স্বদেশী পাণ্ডা হয়েছে, গাঁয়ে গাঁয়ে লোক জড় করে কেবল বল্‌ছে 'তোরা সব স্বাধীন হ', দেশ উদ্ধার কর্।"

বামা চম্‌কে উঠে বল্লে—"তার মানে?"

গোপেশ্বর আপনা আপনি বল্‌তে লাগলো—"যে শালারা খবর দেছে, একবার টের পেলে হয়—টুঁটি চেপে মেরে ফেল্‌বো। সব বাকী খাজনা ফেলে নালিশ জুড়ে দেব,—আমি গোপেশ্বর দত্ত।"

বামা উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"তার পর হল কি বল না? তোমার ও বাহাদুরী পরে করো—"

গোপেশ্বর বল্লে—"বাহাদুরী নয় বামুন মা, পরে দেখিয়ে দেব। গোপেশ্বর সে ছেলে নয়। পুলিশ একদিন তদারকে এল, আমি বল্লুম বাবু এখন মহল দেখতে বেরিয়েছে, দেশে নেই। তারা তখন আমার কাছে ঠিকানা জেনে সেই কথা বাবুকে লেখে।"

বামার মুখ থেকে বেরুল—"সর্ব্বনাশ!"

গোপেশ্বর বলে যেতে লাগলো—"বাবু ছিলেন তখন শান্তিপুরের কাছারীতে। আমায় 'তার' করে ডেকে পাঠা'লেন। 'তার' পেয়েই আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম। ভাবলাম—না জানি কি হয়েছে,—অসুখ বিসুখই বা হল। তার পর বাবুর কথা শুনেই আমার একেবারে চক্ষুস্থির! তখন বুঝলাম এ পুলিশের কারসাজি। এ ঠিক যেন তাদের

ঘর-পোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখে লাফালাফি। কোথায় কি তার ঠিক নেই! বাবু আমায় ব্যাপারখানা কি জিজ্ঞাসা করতে আমায় বলতে হল,---যা সত্যি তাই বল্লাম।"

বামা বল্লে—"বলো কি গোপেশ্বর! ওরা তো শুনেছি কিছুই করেনি, ওদের কলেজের মাষ্টার পর্য্যন্ত সঙ্গে ছিল?"

—"তা আর আমি জানি না? আমিও ত সঙ্গে ছিলাম। বাবুকে বল্লাম—হুজুর, খোকাবাবু কিছুই করে নি, কিছুই জানে না, কেবল প্রজাদেব বলে গেছে, যেন তারা দেশী জিনিস কেনে আর পাটের চাষ না করে।

বাবু বল্লেন—"তাইতেই পুলিশ সাহেব ক্ষেপে উঠেছে—ম্যাজিষ্ট্রেট্ চিঠি লিখেছে। জমীদারী পর্য্যন্ত যায় যায় হয়েছে—তোমার খোকাবাবুর আর তার সেই কতকগুলো খদ্দর পরা দলের জন্যে।' বাবুর অগ্নিমূর্ত্তি দেখে আমি ত একেবারে ভয়েই আড়ষ্ট!" এই বলে গোপেশ্বর আহারে মনোনিবেশ করলো।

বামা খানিক চুপ করে থেকে বল্লে—"তার পর গোপেশ্বর, তার পর?"

—"তার পর আর কি বলবো বামুন মা,—সে কিছুতেই তাঁকে নিরস্ত করতে পারি না। কত হাতে পায়ে ধরলুম, বল্লুম—অতি নিরীহ আমাদের শিশিরবাবু, আর যারা সঙ্গে এসেছিল, তারা সবাই অতি ভাল মানুষ লোক। তাদের দ্বারা জমিদারীর কি ক্ষতি হবে আপনার, আর সরকারেরই বা তারা কি করতে পারে। একটি নিরীহ আর গোবেচারার দল, করবার তাদের ক্ষমতা কি হুজুর? না হয় বলেছে দেশী জিনিষ কেনো, আর পাট ফাট্ বুনো না, তা শুন্‌ছেই বা কারা, আর কিন্‌ছেই বা কে।"

গোপেশ্বরের একঘেয়ে কথার জ্বালায় বামা ঝালাফালা হয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"তাতে হল কি গোপেশ্বর, তাতে হল কি ?"

গোপেশ্বর বল্লে—"এই যে বামুন মা—ক্রমশঃ আসছি। বাবু কোন কথাই কাণে তুল্লেন না। একবার পাশের ঘরে চলে গেলেন,—শুনতে পেলুম, কে ফিস্ ফিস করে কি যেন বল্লে—বোধ করি নতুন বৌ ঠাকরুণ।"

বামা চোখ দুটো যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত করে উদ্‌গ্রীব হয়ে শেষটা শুনতে চাইল।

গোপেশ্বর বলে যেতে লাগলো—"পাশের ঘর থেকে ফিরে এসেই একখানা কাগজ টেনে কি সব ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে লিখতে লাগলেন। তখন কথা কয় কার বাবার সাধ্যি! লেখা হয়ে গেলে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—যেন জজসাহেব রায় দিলেন,—শোন গোপেশ্বর, ম্যাজিষ্ট্রেটকে আমি লিখলুম, আমি চিরদিনই সরকারের গোলাম। আমার ছেলে অন্যায় করেছে। সে কোলকেতায় থেকে বদ সঙ্গে পড়েছে। আমি সে জন্যে তাকে বিশেষ শাসন করবো—দরকার হলে বিষয় থেকে তাকে বঞ্চিত করতেও পশ্চাৎপদ হব না।' আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—"

বামা আর চুপ করে থাকতে না পেরে বল্লে—"এই কথা তিনি লিখলেন ?"

গোপেশ্বর বল্লে—"আর লিখলেন! —সে চিঠি এখন লাট সাহেবের দপ্তরে গে পৌঁচেছে। তার পর শুনুন, বাবু যে অতটা ভয় কেন পেলেন, তা বলতে পারি না। বাবুদের যত কিছু হুকুম-হাকাম, জারিজুরি গরীব প্রজার উপর! তার পর—"

বামা বল্লে—"তার পর আরও কিছু থাকতে পারে না কি গোপেশ্বর?"

গোপেশ্বর তাড়াতাড়ি দু' এক গ্রাস মুখে তুলে গলাধঃকরণ করেই বল্লে—"ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে চিঠি লেখবার পর আমার ওপর একটা হুকুম জারী হল—একেবারে লিখে হুকুমজারী"—

—"কি করতে হবে তোমায়?—খোকাকে ধরে পুলিশের গারদে পৌঁছে দিতে হবে?"

—"আমায় কেন লজ্জা দেন আপনি? এ নচ্ছারী চাকরী ছেড়ে দিয়ে মনে হয় কাশী বা বৃন্দাবনে গে বাস করি! কি বলবো পাঁচ সাতটা কাচ্ছা বাচ্ছা, নইলে—"

—"শেষ কথাটা বলে ফেল গোপেশ্বর, আমার বড় মাথা ধরেছে—" এই বলে বামা নিজের রগটা টিপে ধরলে।

গোপেশ্বর আসন থেকে উঠে পড়ে বল্লে—"বাবু হুকুম জারী করেছেন, ছোটবাবু বা তাঁর কোন খদ্দরপরা বাবু যেন চন্দনপুরে না ঢোকে, সেখানকার বাড়ীতে গেলে সেই হুকুম-নামা দেখিয়ে তখনই যেন ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়।"

—"আর না—আর না গোপেশ্বর, ঢের হয়েছে—যথেষ্ট হয়েছে।" তারপর একটু থেমে বামা বল্লে—"তুমি তোমার বাবুকে লিখে দিও, যে, তাঁর সন্তান নিরপরাধী বালক, জমিদারীর মমতয়ে তিনি যদি নিজের সন্তানকে বাড়ী ঢুকতে মানা করেন, তাহলে যে তাকে মানুষ করেছে, যে তাকে এত বড়টা করেছে, তার সেই 'বামুন মা' তাকে বুকে করে আগলে থাকবে!—আর লিখে দিও—ভুলনা—লিখো যে ভগবান জীবের আহার জোটান,—"

গোপেশ্বর বাধা দিয়ে বল্লে—"ও কথা তুলছেন কেন? ও কথা ত বাবু একবারও বলেন নি—"

বামা বল্লে—"আজ বলেন নি, দুদিন পরে তাও বলতে পারেন। আজ কাল যার মন্ত্রণায় চলছেন, সে মন্ত্রী যখন এক কথায় তারে বাড়ী ঢোকা বন্ধ করিয়েছে, তখন অন্নবস্ত্রও বন্ধ করতে পারে। তাই যদি হয়, লিখো,—তাতেও খোকনের আমার কোন কষ্ট হবে না। তার বামুন মা একেবারে নিঃস্ব হয়ে রাঁধুনি বৃত্তি করতে ঢোকেনি। তোমার বাবু জানেন—তার কিছু অলঙ্কার আছে। দরকার হলে তাই বেচে দুঃখে কষ্টে অন্ততঃ একটা বছরও চলবে। তার পর খোকন চাকরী করে খাবে। বুঝলে গোপেশ্বর, চন্নপুরে গিয়েই এই কথা লিখো, আর বলো—তাঁর বাড়ীর 'বামুন মা' এই সব কথা লিখতে বলেছে।"

'বামুন মা' কথাটার উপর বামা এমন জোর দিয়ে বল্লে যে, গোপেশ্বর স্তম্ভিত হয়ে বামার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। কিন্তু সে দৃষ্টির কাছে বেশীক্ষণ চাইতে না পেরে গোপেশ্বর মাথা নামিয়ে নিলে। তার দেহের মধ্যে যেন একটা তড়িৎ প্রবাহ খেলে গেল।

বামা আর মুহূর্ত্ত মাত্র সেখানে না দাঁড়িয়ে, তড়তড় করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

গোপেশ্বর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে, এদিক ওদিক চেয়ে আঁচাবার জল অনুসন্ধান করছে, এমন সময় পুরণো ঝি নিস্তার কোথা থেকে বেরিয়ে এসে বল্লে—"ওই হোথা চৌবাচ্ছায় জল আছে গোমস্তা মশাই।"

"—এ কি নিস্তার! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

নিস্তার বল্লে—"এই পাশেই শুয়ে ছিলাম,—নায়েব গোমস্তা লোকের। কি আর খামকা ঝি চাকরের পানে তাকায়? নাও আঁচাও, হাতে জল ঢেলে দি।"

গোপেশ্বর বাস্তবিকই সব দেখে শুনে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। সত্য-মিথ্যা সব জড়িয়ে যে অভিনয়টা আজ সে করে গেল, তা'তে আশা করেনি, যে, কেউ তা'কে একটুও দমাতে পারবে। একটা চ্যাংড়া ছোঁড়া —তা হোক্ না সে বাবুর ছেলে, আর একজন রাঁধুনী! খোদ বাবুর হাতের সই করা যে দলিল তার হাতে আছে, তা'তেই সে এদের একে-বারে কেঁচো বানিয়ে ছেড়ে দেবে, এইটাই তার ধারণা ছিল। আর একটা প্রচণ্ড কু-মতলব নিয়েই সে কোলকেতায় এসেছিল। কিন্তু সে বামার কথার দৌড় শুনে আপনাকে যেন কতকটা নিঃসহায় বিবেচনা করলে,—যদিও তা'র উদ্দেশ্য পণ্ড হয়নি। আঁচিয়ে উঠে হাত মুছতে মুছতে সে নিস্তারকে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি ত বলছ পাশেই ছিলে, তাহলে আমাদের সকল কথাই শুনেছ বল?"

নিস্তার হাস্তে হাস্তে বল্লে—"তা আর শুনিনি? কাণে তো আর ছিপি এঁটে থাকতে পারি না?"

—"তবে যখন শুনেইছ, তখন বলি, বামুন মার অতটা তেজ বাবুর ওপর ফলান তা বলে ভাল হয়নি। কি বল?"

—"আমি আর তার কি বলবো গোমস্তা মশাই,—আমরা হচ্ছি দাসী বাঁদী,—ও রাজারাজড়ার কথায় উলু খাগড়ার থাকা চলে কি?"

—"রাজাই বা কে—আর উলু খাগড়াই বা কে?"

—"এই রাজা হচ্ছে বাবু আর আপনি, উলু-খাগড়া হচ্ছি আমি আর

বামুন মা। তা এইবার চল, তোমার শোবার ব্যবস্থা করে দিই, নীচেকার যে ঘরটা আজকে বস্‌বার জন্যে খোলা হয়েছিল, সেই ঘরেই শোবে তুমি।"

গোপেশ্বর একটু ইতস্ততঃ করে বল্লে—"আজ রেতের গাড়ীতেই আমি চন্দনপুরে যাব নিস্তার।"

—"ও মা, সে কি কথা! তবে যে শুনেছিলুম—কাল সকালে যাবে?"

—"না, তা গেলে আমার চলবে না। কাছারীতে অনেক কাজ আছে।"

—"খোকাবাবুর সঙ্গে আর দেখা কর্‌বে না—তাঁর বাবার হুকুমটা জানিয়ে যাবে না?"

—"না নিস্তার, তা আমি পারবো না। সেই জন্যেই আরও পালাচ্ছি। তোমরা সবই ত শুনেছ, জেনেছ,—তাঁকে বলো যে আমার এতে কোন অপরাধ নেই। চল, ঘরটা খুলে দেবে চল, ব্যাগটা বা'র ক'রে নিই।" তার পর যেতে যেতে বল্লে—"ওই যে মেয়েটি রয়েছে—যার মার পক্ষাঘাত হয়েছে, ও মেয়েটির এখনও বে' হয়নি?"

নিস্তার বল্লে—"সে তো সব তুমি আজ শুনেই গেলে গোমস্তা মশাই, আর জিজ্ঞাসা করার ফল কি?"

—"না, তাই বল্‌ছি। খুব মস্ত কি না—তা দেখ্‌তে শুন্‌তেও বেশ। আহা কি কষ্ট! মা'টীর ত অমন অসুখ, তার ওপর একটা অপবাদও আছে—"

নিস্তার বল্লে—"কি বল্‌বে তাই বল না গোমস্তা মশাই, ঢোঁক গিলে গিলে কথা কইছ কেন?"

গোপেশ্বর কিন্তু আর কোনও কথা কইল না। নীচেকার ঘর থেকে ব্যাগটা নিয়ে আস্তে আস্তে সদর দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। নিস্তারও কোন দিকে না চেয়ে, দোরটা বন্ধ করে দিয়ে, আপন মনে হাস্তে হাস্তে বল্লে—"মুখপোড়া ড্যাকরা! আবার সাধুগিরি ফলাতে এসেছ! ওর চোখ মিট্ মিট্ করে কথা ক'ওয়া আমি ত বুঝতে পারি না!" এই বলে সে উপরে চলে গেল।

২২

সাবিত্রীকে দেখতে আসার দিন থেকে চার পাঁচ মাস কেটে গেছে।

এই ক'টা মাসের মধ্যে শিশিরদের সংসারে এত অশান্তি আর এত উৎপাত এসে পড়লো যে, বাড়ীর কোন লোকই, তৃপ্তি বলে যে জগতে কিছু আছে, তা একেবারেই ভুলে গেল। অমিয়বাবুর কঠিন নিষ্ঠুর আদেশটা ইচ্ছা সত্ত্বেও বামা শিশিরের কাছে গোপন রাখতে পারলে না। গোপেশ্বর কেবলমাত্র বামাকেই যে সে কথা জানিয়েছিল, তা নয়, তৎপূর্বে শিরোমণি মশায়ের কাছেও আদ্যোপান্ত জানিয়ে রেখেছিল—যাতে শিশির ভাল রকম শুনতে পায়। সে জানতো, বামা সহজে শিশিরের মনে ব্যথা দেবে না। শিরোমণি মশায়কে সে বলে গিয়েছিল—যেন তিনি বুঝিয়ে সুঝিয়ে শিশিরকে খদ্দর পরা আর বদ্ সঙ্গে মেশা—তা' অমিয়বাবুর কল্পিতই হোক্ আর সত্যই হোক্—ছাড়া'তে। তাহলে অমিয়বাবু চাই কি তাঁর রূঢ় আদেশটা প্রত্যাহার করতেও পারেন। আর গোপেশ্বরও যথাসাধ্য সে বিষয়ে চেষ্টা করবে, যাতে বাবুর মেজাজটা ঠাণ্ডা হয়। আসল কথা শিশিরকে কথাগুলো নানা অলঙ্কার দিয়ে শোনানটাই গোপেশ্বরের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। আর সেজন্য যেখানে যে অস্ত্র প্রয়োগ করা চাই, তা করতে সে ত্রুটি করে নি। তা ছাড়া, কথার

ভাবে সে এমন জানিয়ে গিয়েছিল, যেন শিশিরের নতুন মাই অমিয়বাবুকে উত্তেজিত করে মিছিমিছি এই কাণ্ডটা বাধিয়েছে। সে জানতো— নতুন মা'র হুকুমে বাবা তাকে বাড়ী ঢুকতে মানা করেছে, এ সংবাদে শিশিরের অন্তরে প্রচণ্ড অভিমান জেগে উঠবে।

হ'লও তাই। শিরোমণি মশায়ের মুখে সমস্ত শুনে সে স্তব্ধ হ'য়ে খানিক বসে থেকে, তার পর বামার কাছে আদ্যোপান্ত জিজ্ঞাসা করলে।

বামাও অস্বীকার করতে পারলে না। কিন্তু বল্লে—"তাঁকে একখানা চিঠি কেন লেখ না শিশির, যথার্থই ত তুমি কোন দোষ কর নি, মিথ্যা করে তাঁকে পাঁচজনে লাগিয়েছে বই ত নয়।"

শিশির শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিলে—"আমি তা কখনই পারবো না। পাঁচজনে মিথ্যা করে লাগালেই অমনি বিশ্বাস করতে হবে? কেন, তিনি গোপেশ্বরদা'কে না ডেকে আমাকে ডেকেই ত সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস ক'রতে পারতেন?" তার পর একটু চুপ করে থেকে বল্লে—"আমি জানি গো জানি, মা' মরা ছেলেদের এই রকমই দুর্গতি হয়।"

বামা শিশিরের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লে—"বালাই —ষাট্! দুর্গতি হতে যাবে কেন তোমার, আমি তোমার কাছে রয়েছি।"

শিশির বল্লে—"তাই তুমি থাক, জন্ম জন্ম আমার কাছে থাক,—আমি চন্দনপুরে যেতেও চাই না,—আর নিজে হতে কোনও কথা লিখতেও চাই না।"

তার পর থেকে সে সম্বন্ধে আর কোনও কথার উত্থাপন হ'ল না।

কিন্তু প্রকাশ্যে কোন আলোচনা না হলেও, ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড অভি-মানের সৃষ্টি হয়ে রইল। শিশিরের মনে ধারণা বদ্ধমূল হল যে, বাবার যদি তার প্রতি কিছু মমতা থাকতো, তাহলে কোলকেতায় বিদেয় করে দিয়ে পর্য্যন্ত এতকাল ধরে চুপ করে' থাকতে পারতেন না। দেখা দেওয়া ত দূরের কথা—একখানা চিঠি পর্য্যন্ত দিয়ে খোঁজ করেন না। দায়ে পড়ে' মাসহারাটাই গোমস্তার দ্বারা পাঠিয়ে দেন। সেটা না দিলে দশজনে নিন্দা করবে, তাই দেন। এই সকল চিন্তাই তাকে অষ্টপ্রহর ঘিরে রেখেছিল, তৃপ্তি কিছুমাত্র তার অন্তরে ছিল না।

বামারও সেইরকম ;—তবে তার চিন্তা বা ব্যথা অতি অতলস্পর্শ,—সে সন্ধান সহজে কেউ পেত না।

শিরোমণি মশায়ও শিশিরের প্রতি তার বাপের এই রকম ব্যবহার আর মমতাহীনতার পরিচয় পেয়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। ভাবতেন —এমনটা হয়ত হতো না, যদি না তিনি এ বয়সে আবার তরুণী ভার্য্যা গৃহে আনতেন। দাম্পত্য জীবনটার উপরেই তিনি কেমন বীতস্পৃহ ছিলেন—এই ঘটনায় আরও কঠিন প্রতিজ্ঞা করলেন, যে, জীবনে বিবাহই করবেন না, তার চেয়ে বরং লেখাপড়ার চর্চ্চায় আর দশের কাজে জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। জীবনের বেশী ভাগটাই তিনি বাইরে কাটিয়েছিলেন। কাশীতে দশ বারো বছর থেকে, দেশে ফিরে দেখলেন, তাঁর বড় ভাই রামনিধি তর্কচূড়ামণি পৈত্রিক শিষ্য-যজমান নিয়ে বেশ একরকম সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করছেন, বাড়ী-ঘরও আপনার ইচ্ছা মত ঘিরে-ঘুরে নিয়েছেন। কেবল বাঞ্ছারামের অংশের আড়াই কাঠা জমি আর এক-খানা জীর্ণ চণ্ডীমণ্ডপ পড়ে আছে। আর তার চারিদিকে বন-জঙ্গল হয়ে

সেটাকে জন্তু-জানোয়ারের আবাস করে রেখেছে। গৃহে ফিরতেই বড়-ভাই বলেছিলেন,—"এইবার ঘরটর সব কর,—সংসার-ধর্ম্ম কর, পাঠ তো শেষ হল।' বাঞ্ছারাম জানালেন, উপস্থিত একটা ছোট খাটো স্কুল করে বসবেন, তার পর যা হয় হবে। ইংরাজী ভাষাও তিনি কিছু শিক্ষা করে-ছিলেন। বন-জঙ্গল সাফ্ করিয়ে জীর্ণ ঘর মেরামত করে দু' এক মাস থাকতে থাকতেই শিশিরকে পড়াবার ভার নিয়ে তাঁকে কোলকেতায় আসতে হয়েছিল। মধ্যে একবার দেশে গিয়ে দেখে এলেন, আবার তাঁর ঘরের চতুর্দ্দিক জঙ্গলাকীর্ণ হয়েছে। তিনি আর সেদিকে হাত দিলেন না,—কোলকেতায় ফিরে এলেন। কিন্তু প্রাণে একটা দাগা নিয়ে ফিরে এলেন। কারণ, দেশে গিয়ে দেখলেন, বড় ভাই নিজের বাড়ীতে পাঠশালা কেঁদেছেন, যা পূর্ব্বাপর তাঁর নিজেরই কল্পনা ছিল। বাঞ্ছারাম অবশ্য মনের কষ্ট কাকেও জানান নি। যাই হোক তাঁর চিত্তও তৃপ্তিহীন হয়ে রইল। সে সব চেপে রেখে তিনি শিশিরদের সান্ধ্য-সমিতিরই একজন পাণ্ডা হয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। পণ্ডিত বলে তাঁর খ্যাতিও ছিল। অধ্যাপক মহলে ক্রমশঃ যাতায়াত হতে লাগলো।

বাড়ীর মধ্যে আরও একটা প্রবল অশান্তির সৃষ্টি হলো সাবিত্রীর বিবাহ নিয়ে। বারাসতের অম্বিকা মৈত্র মশায় সাবিত্রীর মার একটা অপবাদ শুনে নিজের পুত্রের সঙ্গে সাবিত্রীর বে'র সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন বটে, কিন্তু তিনি ভেঙে দিয়েই নিরস্ত রইলেন না। চারিদিকে ঢাক পিটে বেড়াতে লাগলেন। তাতে ফল হল এই যে, তাঁদের বারেন্দ্র সমাজে তাই নিয়ে একটা আন্দোলন সুরু হল। কেউ আর সাবিত্রীকে বিবাহ করতে

চাইলেন না, অথবা কোন অভিভাবকই নিজের সন্তানদের এই অনাথা নির্দ্দোষ বালিকাকে গ্রহণ করতে দিলেন না।

অপবাদ সত্য কি মিথ্যা, তার প্রমাণ সংগ্রহ করা, অথবা এই অরক্ষণীয়া কন্যাটির যাতে কুলরক্ষা হয় তদ্বিষয়ে কোন প্রতীকার করা, কোনটাই তাঁদের মতে সমীচীন বোধ হল না। মায়ের সামান্য একটা কল্পিত অপবাদের জন্য একটি নির্দ্দোষ বালিকা সমাজের গলগ্রহ স্বরূপ হয়ে রইল ;—আর তাঁরাও অম্লান বদনে সেই বিধানই দিলেন।

শিশিরের বন্ধুরা অনেক অনুসন্ধান করে যদিও বা কোন পাত্র জোটাত, দু'দিন পরে সে সম্বন্ধ ভেঙে যেত ;—অথচ কে যে কোথা হতে তাদের কাণে সেই সকল অপবাদের কথা তুলে এই রকম বিভ্রাট ঘটাচ্ছে, তা জানাও যেত না।

কোন কোন দুষ্ট ক্ষত যেমন ভিতরে ভিতরে মানুষের কোন একটা অঙ্গ একেবারে পচিয়ে তবে বাহিরে প্রকাশ পায়, সুচিকিৎসকদিগের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করে দিয়ে সেই হতভাগ্যকে চির জীবনের মতই পঙ্গু করে রাখে, সামাজিক বিধি নিষেধের ফলে সাবিত্রীর অবস্থা কতকটা সেই-রূপ দাঁড়ালো। অথচ এই দুষ্ট ক্ষত আরোগ্য করবার কোন উপায়ই খুঁজে পাওয়া যায় না। সংক্রামক ব্যাধির মত সকলকেই আক্রান্ত করে রেখেছে। উপায় যাদের হাতে, তারা নিজেরাই ব্যাধিগ্রস্ত পঙ্গু।

অন্ধ কখনও অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না : প্রত্যেক দিনের ঘটনা আর দুঃসংবাদে তিল তিল করে নিস্তারিণীকে ক্ষয় করতে লাগলো। মায়ের সেই রকম থেকে থেকে এক একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস সাবিত্রীর বুকে নিয়ত তপ্ত-শলাকা বিদ্ধ করতে লাগলো। সে যখন বড়ই কাতর

হয়ে পড়তো, আপনাকে ধিক্কার দিত, বামা তখন তাকে নানারূপ সং-শিক্ষা ও সান্ত্বনা দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করতো।

বামা বলেছিল—"সংসারের মধ্যে নারী জন্মটাই দুঃখের, আর মনে হয় মহাপাপের। পুরুষ মানুষ হয়ে জন্মে, যে সমাজকে অনায়াসে পদানত করে রাখতে পারা যায়, সেই সমাজের মধ্যেই নারী হয়ে জন্মে তাকে এত অত্যাচার—এত নিগ্রহ নইলে সইতে হবে কেন? অথচ নারী না থাকলে এক মূহূর্ত্ত পুরুষের চলবে না। গুটিপোকা কেবল রেশমের সৃষ্টিই করে যাবে, আবার নির্ব্বিবাদে সেই রেশম উপভোগ করবার জন্য নিষ্ঠুরের মত তাকেই তার আশ্রয়ের মধ্যে দগ্ধ করবে, হত্যা করবে, এইটাই ত চোখের উপর নিত্য দেখা যাচ্ছে মা!"

সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করেছিল—"তাহলে মাসীমা, নারীর কি স্বাতন্ত্র্য নেই? তার কোন কাজের সার্থকতা নেই?"

বামা একটু হেসে জবাব দিয়েছিল—"স্বাতন্ত্র্য না থাকাই ত বিড়ম্বনা; আর তার সকল কাজের সার্থকতা কেবল আত্মপ্রসাদ, তার বেশী আর কিছুই নয়,—সমাজের পুরুষদের কাছে তার কোন মূল্যই নাই।"

উপর্য্যুপরি আঘাতে আর মনস্তাপে নিস্তারিণীর আবার একদিন খুব প্রবল জ্বর হল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের অসুখ সেদিন এত বেড়ে উঠলো যে, মধ্য রাত্রে সকলেরই মনে হল, এখনি বুঝি বা হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া লোপ হয়। সবাই মিলে উৎকণ্ঠিত চিত্তে বাকি রাতটুকু জেগে পাহাড়া দিলে। সকাল হতেই শিরোমণি মশায় হাঁপাতে হাঁপাাত ছুটলেন ডাক্তারের কাছে।

রাত্রের অবস্থা শুনে ডাক্তার বল্লেন—"কি আর করব ঠাকুর মশাই, উপায় কিছুই আর নেই। তা চলুন দেখে আসি।"

ডাক্তার এসে নাড়ীটা ধরেই ছেড়ে দিয়ে, ইংরাজীতে বল্লেন—"Her days are numbered."

শিশির জিজ্ঞাসা করলে—"Can't you give any—"

ডাক্তার বল্লেন—"Hope বলছেন? there is none. একটুখানি গরম জল আনুন দিকি, একটা Injection দিয়ে রাখি।"

নিস্তারিণী হাত নেড়ে বারণ করলে। সাবিত্রী চোখে কাপড় দিয়ে বসে ছিল, বল্লে—"কাল রাত্রি থেকে মা এক দাগও ওষুধ খায় নি।"

বামা বল্লে—ডাক্তার বাবু, রাত্রে বুকে কেমন এক রকম যাতনা হচ্ছিল, একেবারে কাটা ছাগলের মত ছটফট করেছিল। কিন্তু সকাল হতে আপনি সে ভাবটা শুধরে গেছে দেখছি, আব উনিও বলছেন, বুকে আর কোন যাতনা নেই, ওষুধ আর খাব না।"

ডাক্তার, শিরোমণি আর শিশিরের দিকে চেয়ে বল্লেন—"She has lost her perception,—এইটাই ক্রমশঃ বেড়ে যাবে।"

শিরোমণি মশাই ঘাড় নেড়ে জানালেন, যে, তিনি বুঝতে পেরেছেন।

কলেজ যাবার সময় অধ্যাপক সুশীল বাবু আর দু'জন ছাত্র এসে ঘরে ঢুকলো। সুশীলবাবু শিশিরকে বল্লেন—"তোমায় ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া না পেয়ে ভিতরে ঢুকলাম,—নীচের চাকর বল্লে, আজ না কি বড় বেড়ে উঠেছে?"

কেউ তাঁর কথার কোন জবাব দিলে না—তিনি আপনি এসে একেবারে রোগীর কাছে বসে পড়লেন, অপর ছাত্রেরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। সুশীলবাবু নিস্তারিণীর মুখের দিকে চেয়ে নাড়ীটা ধরলেন, তার পর ছাত্র-

দের দিকে ফিরে বল্লেন—"তোমাদের আজ তো একটা পর্য্যন্ত class ? ফেরবার সময় এখান হয়ে যেও।"

নিস্তারিণী তখন স্থির নিশ্চল পাথরের মতই শুয়ে ছিল। চোখ দুটো অসম্ভব রকমে উজ্জ্বল, ঠিক যেন কাঁচের চোখ, —পলক পড়ছে, কিন্তু অনেক দেরীতে; দৃষ্টি লক্ষ্যহীন।

সুশীলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"Do you think her end very near ?

ডাক্তার সাবিত্রীর দিকে চাইলেন।

সাবিত্রী বল্লে—"আপনি কিছু লুকুবেন না ডাক্তারবাবু, আমি সব কথা আপনার আগাগোড়া বুঝতে পেরেছি।"

ডাক্তার সুশীলবাবুর মুখের দিকে চাইতে সুশীলবাবু বল্লেন—"Yes Doctor, English language is not some altogether foreign to that girl, she got some education from her parents."

ডাক্তার বল্লেন—"I see, and am very glad to hear it, দেখুন, এই যে রোগটা,—এই heart disease I mean, ঠিক করে কিছু বলতে পারা যায় না। এখনই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেও হতে পারে—আবার এক week দেরীও হতে পারে। But die she must, আর বেশী বিলম্বও তার নেই।" তার পর একটু ইতস্ততঃ করেই ডাক্তার আবার বল্লেন—"আমি তাহলে এখন উঠি, কি বলেন ?" ডাক্তার উঠে দাঁড়াতেই ব্যাকুলভাবে বামা বল্লে—"আজ আর একটুখানি থাকুন ডাক্তার বাবু, তার জন্যে যা—"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বাধা দিয়ে ডাক্তার বল্লেন—"ও কথা বলবেন না, যতক্ষণ বসতে বলেন আমি বসছি। টাকাটাই যে পরম পদার্থ, তা অনেক ডাক্তার না ভাবতে পারে।...তার পর সুশীলবাবু, আপনাদের কাজ কেমন চলছে?"

সুশীলবাবু বল্লেন—"একটু একটু করে অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে। আপনার যে সময় বড়ই কম, নইলে ভারি সুবিধে হত।" এই বলে তাঁরা দুজনে ঘরের এক দিকে সরে বসে কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে নিস্তারিণীকে এদিক ওদিক চাইতে দেখে বামা তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"তোমার কি কিছুই বলবার নেই বোন্? যদি কিছু সাবিত্রীর সম্বন্ধে বলবার থাকে, চেপে রেখো না। তার ভবিষ্যতে কি হবে তুমি চলে গেলে, সে কথা আমরা শুনতে চাইনে। তার সমস্ত ভার আমি নিলুম। আমার মেয়ের মত আমি তাকে আগলে রাখবো।"

অতি কষ্টে নিস্তারিণী নিজের কপালে হাত দুটো ঠেকিয়ে বল্লে—"সে বড় অনাথা।"

শিরোমণি মশায় বল্লেন—"অনাথার দৈব সখা মা, মানুষ মাত্রেই অসহায়—সকলেই অনাথ।"

নিস্তারিণী বামার মুখের উপরে স্থির দৃষ্টি রেখে বল্লেন—"লোকে মিছে করে, শোনা কথায় বিশ্বাস করে, সমাজে তাকে ঠেলা করে রাখতে চায়। তার কোনই দোষ নেই,—আমারও নেই, সাক্ষী পরমেশ্বর, সাক্ষী—"

নিস্তারিণীকে আর কিছু বলতে না দিয়ে বামা বল্লে—"সাক্ষী ডাকতে

হবে না বোন্, আমরা সকলেই সে কথা বিশ্বাস করি। ওর জন্তে তোমায় অনুশোচনা করতে হবে না।"

—"কিন্তু—"

—"এর মধ্যে আর কিন্তু নেই বোন্।"

—"সমাজে যার স্থান মিললো না; তার দাঁড়াবার স্থান কোথায়?"

শিরোমণি মশায় বল্লেন—"বিশ্ব সমাজ তাকে মাথায় তুলে নেবে মা, তুমি দুশ্চিন্তা ত্যাগ করো; মনকে শান্ত করো।"

একটু চুপ করে থেকে নিস্তারিণী বল্লে—"দুশ্চিন্তা যে আপনা হতে আসে বাবা, শান্ত যে হতে পাচ্ছিনে!" বলেই মুখটা বিকৃত করে বামার একখানা হাত আপনার বুকে টেনে নিয়ে বল্লে—"বড় যাতনা!"

বামা নিস্তারিণীর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লে—"বেশী কথা কয়ো না। অনেকক্ষণ ধরে কথা কইছ বলেই আবার যাতনা বেড়ে উঠলো।"

নিস্তারিণী খানিকক্ষণ চোখ বুজে পড়ে থেকে আবার একটু সামলে নিয়ে বল্লে—"একখানা পাঁচশো টাকার পোষ্টাফিসের কাগজ আছে, তিনি লড়ায়ের সময় কিনেছিলেন;—আর হাতের দু'গাছি রুলি আছে, সাড়ে তিন ভরির হবে, সব সেই তোরঙ্গের মধ্যে ক্যাস বাক্সটায় আছে। এই-টুকুই আমি সাবিত্রীর জন্ত রেখে গেলাম, আর কোন সম্বল তার রইল না।

বামা বল্লে—"সাবিত্রী, তোদের নীচেকার ঘর থেকে সেই ছোট ক্যাস বাক্সটা আনতো মা!"

সাবিত্রী একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কেন মাসী মা? আমি ত জানি কি তাতে আছে।"

বামা একটু জোর দিয়ে বল্লে—"তা হোক, তুমি জানলেই ত কেবল হবে না, আমরা সবাই না হয় দেখলুম।"

সাবিত্রী আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বামা তাকে বলে দিলে—"আসবার সময় অমনি একটু দুধও গরম করে আনিস বাছা।"

হঠাৎ কোন একটা কথা মনে পড়ে গেলে মানুষে যেমন ভাবে জিজ্ঞাসা করে, নিস্তারিণী সেই রকম ব্যস্ততার সহিত বামাকে জিজ্ঞাসা করলে—"হ্যাঁ দিদি, পাঁচশো টাকা কাশীতে কোন ঠাকুরবাড়ীতে জমা দিলে, রোজ দুটি প্রসাদ পাওয়া যায় না? এমন ত সব আছে শুনিছি।"

বামা বিস্মিত হয়ে বল্লে—"কেন বল দিকি? কে কাশীতে থাকবে?"

সকলেই নিস্তারিণীর প্রশ্নে চমকিত হয়ে তার দিকে চেয়ে ছিল।

নিস্তারিণী একটু অপ্রতিভের মত সবার দৃষ্টি এড়িয়ে আস্তে আস্তে বামাকে কাছে টেনে নিয়ে বল্লে—"সাবিত্রীর কথাই ভাবছিলুম দিদি, তুমি যদি সেই ব্যবস্থাটা করে দাও।"

বামা অধিকতর বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি থাকতে থাকতেই, না ম'লে?"

নিস্তারিণী বল্লে—"ম'লেই বলছিলুম। আমি আর ক'দিন?"

বামা অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বল্লে—"কেন তারই বা দরকার কি, আজই ব্যবস্থা করে দিইনা? কি জানি, তুমি গেলে যদি আমার কাছে তার অযত্ন হয়—"

নিস্তারিণী বল্লে—"তুমি রাগ করলে দিদি? তোমার কাছে অযত্ন হবে বলে আমি বলি নি। কেউ ত তাকে ঘরে নিলে না। একে

বয়েস কাল, তার উপর রূপও আছে। বারেন্দ্র সমাজে কেউ যে কখনো তাকে নেবে, তা তো মনে হয় না।"

বামা শিরোমণি মশায়ের দিকে চেয়ে বল্লে—"শুনছেন শিরোমণি মশায়,—সাবিত্রীর মা সাবিত্রীকে কাশী পাঠাতে চান। আপনারাও শুনে রাখুন—"

শিরোমণি মশায় আর সুশীল বাবু উভয়েই আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—"কাশী! কাশী কেন?"

বামা জবাব দিলে—"ওঁদের সমাজে কেউ তাকে গ্রহণ করতে চায় না বলে।"

ডাক্তারও এতক্ষণ সুশীল বাবুর কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনছিল। ঘরের একদিকে বসে নানা রকম আলোচনা প্রসঙ্গে সাবিত্রীর সম্বন্ধে অনেক কথাই সে জানতে পেরেছিল—দুঃখিত হয়েছিল। এখন বল্লে—"তাকে এই বয়সে কাশী পাঠিয়ে লাভ কি? সেখানে কেউ আত্মীয় আছেন?"

বামা বল্লে—"না।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলে—"তবে সেখানেই বা দেখবে কে?"

বামা একটু শ্লেষের ভঙ্গীতে বল্লে—"সে উনিই জানেন। বোধ হয় স্বর্গ থেকে ব্যবস্থা করবেন। দেশে এঁদের আপনার লোক আছে, কিন্তু খোঁজ খবর কেউ নেয় না। এই ছ'মাসের ওপর উনি শয্যাগত,—ওঁরই কথা মত আমি বা শিশির দু'তিন যায়গায় চিঠি দিয়েছি, জবাব এক-খানাও পাইনি। কিন্তু যেদিন সাবিত্রীর বে' ভেঙে গেল, সেই দিন থেকে কিছু না হবে দশখানা পত্র আমরা পেয়েছি। সব কথা ওঁকে

বলিও নি, সাবিত্রী কিছু কিছু জানে। সব ক'খানা চিঠিতেই নানা মন্তব্য, নানা আদেশ জারী করা আছে। সহানুভূতির লেশমাত্র কোনটাতেই নেই। সাবিত্রীর এক মামা আছেন, শুনতে পাই—তিনি কোন্ কয়লার খনিতে বড় চাকরী করেন। তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে লিখেছিলাম,—আর অনুরোধ করেছিলাম—আপনি বিদেশে থাকেন, সেখানে মাস কতক যদি ভাগ্নিকে রাখেন বড়ই ভাল হয়। অপবাদ সমস্তই কাল্পনিক। এখন দূরে দিন কতক থাকলে আপনিই সব চাপা পড়ে যাবে। তার মাকে নে যেতে হবে না, তাঁর এ অবস্থায় নাড়া-চাড়াই অসম্ভব, আমরাই তাঁর পরিচর্য্যা করব। আপনি শুধু মেয়েটীকে নিয়ে যান। এক মাস পরে সেই মামা আমায় সে চিঠির কি উত্তর দিছলেন জানেন ?"

কেউ কোনও কথা কইলেন না—উদ্‌গ্রীব হয়ে বামার মুখের দিকেই চেয়ে রইলেন।

বামা বল্লে—"তাঁর উত্তর এল—'বড়ই দুঃখিত আমরা, স্ত্রী পুরুষ ছাড়া, আমরা সাড়ে তিনটি প্রাণী খেতে, অর্থাৎ সম্প্রতি একটি পুত্র হয়েছে ; বিদেশে অনেক খরচা। আর সামাজিক বিচারকে লঙ্ঘন করে এ অবস্থায় ভাগ্নিকে কাছে রাখতে পারি না, আমারও ছেলে মেয়ের বে'-পৈতা দিতে হবে।' তার পর আবার অনুগ্রহ করে পরামর্শ দেছেন, সেটা এই যে, ওদের তেজপুরে গিয়ে থাকাই উচিত। নয় তো, কাশী কি বৃন্দাবনে। দেশে থাকলেই সমাজ মানতে হবে।"

বামার কথায় সকলেরই ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সকলেই মাথা হেঁট করে বসে রইলেন।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিস্তারিণী বল্লে—"দাদা চিঠির জবাব দিয়েছিল! আমায় ত বলনি দিদি?"

বামা বল্লে—"আজও বল্‌তুম না বোন্‌, বড় কষ্টেই বল্‌তে হ'ল।"

নিস্তারিণী কেঁদে ফেল্লে। কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—"তবে ত আমাদের ছ'জনেরই ম'রে যাওয়া ভাল।...ভগবান! এত লাঞ্ছনাও কপালে লিখেছিলে!" এই বলে সে স্থির নিস্পন্দ হয়ে চুপ করে রইল।

ঘরটার মধ্যে তখন গম্‌গম্‌ করছিল। সকলেই স্তব্ধ ভাবে খানিকক্ষণ বসে থেকে, অবশেষে একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করে শিশিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

২৩

ঘটনাচক্রে পড়ে এবং বাঞ্ছারাম শিরোমণির মত জনকয়েক অতি উদার মতাবলম্বী ব্যক্তির আন্তরিক সহানুভূতি পেয়ে, সাবিত্রীর সঙ্গে শিশিরের বিবাহ দেবার সবখানি দায়িত্ব একা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে, বামা হিসাবে মস্ত বড় একটা ভুল করলে কি না সে কথা সে মোটেই ভেবে দেখলে না। বরং সে নিজের প্রাণে কতকটা স্বচ্ছন্দতাই অনুভব করলে। তাই নিস্তার তাকে একলা পেয়ে একদিন জিজ্ঞাসা করলে—"এ কাজটা কি ভাল হল দিদিমণি?" নিস্তার আড়ালে একদিনের জন্যও বামাকে 'বামুন-মা' বলে ডাকতো না।

বামা তখন কি একটা কাজে তাড়াতাড়ি উপরে উঠছিল—থমকে দাঁড়িয়ে বল্লে—"কোন্ কাজটা নিস্তার?"

নিস্তার বল্লে—"এই ছোটবাবুর বে'র পাকা কথা দিয়ে?"

—"নইলে মেয়েটার যে গতি হয় না নিস্তার, আর তার মা'রও মরণে সুখ হয় না।"

—"তা সবই বুঝি। কিন্তু দশের মাঝে দাঁড়িয়ে একার ওপর সব ঝক্কিটা না নিলেই ভাল করতে।"

—"সব কথা খুলেই ত আমি চিঠি লিখেছি। দেখি, তিনি কি জবাব দেন।"

—"আর তিনি যদি কোনও জবাবই না দেন ?"

বামা একটুখানি ভেবে.নিয়ে বল্লে—"তা'হলে কি ছাই করবো তাই বল্ না ?"

নিস্তার বুঝলে যে, বামার মনের ভিতর এখনও পুরো মাত্রায় সংশয় রয়েছে, দ্বন্দ্ব রয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করলে—"বে' টা কি তা'হলে ফিরিয়ে নেবে ?"

বামা কথার উত্তর দিলে না।

নিস্তার আবার জিজ্ঞাসা করলে—"বল না দিদিমণি, যদি সেখান থেকে কোনও উত্তর না আসে, বা তিনি 'না' করেন, তাহলে কি বে' এখন বন্ধ রাখবে ?"

—"সে হতে পারে না নিস্তার ; আর তাই-ই যদি হয়, সে কৈফিয়ৎ পরে তখন দেওয়া যাবে। এখন আমি আর ভাবতে পারি না। আমার কথার নড়চড় হ'বে না।"

—"কিছু মনে করো না দিদিমণি, আমায় অনেকটা অধিকার তুমি বরাবর দিয়ে এসেছ, সেই সাহসেই এত কথা বলি। তোমার কোন কাজে আমার কিছু জিজ্ঞাসা করাটাও ভাল দেখায় না। তবে না কি— আমি জানি, আপনা হতে তুমি চিরকাল অনেক কষ্ট সয়ে এসেছ, সেই ভেবেই মনে হয়, সাধ করে' আর খানিকটা দুঃখের বোঝা মাথায় তুলে না নিলেই ভাল হত। যার ছেলে তার মত নিলেই ভাল হত।"

বামার মুখটা যেন কেমন একরকম হয়ে গেল। ঠোঁট দুটো ঈষৎ কেঁপে উঠলো। কি একটা কথা বল্‌তে গিয়ে যেন সে হঠাৎ সাম্‌লে নিয়ে বল্লে—"সবেরই একটা সীমা আছে নিস্তার, চিরদিন আঘাত সয়ে

সয়ে একদিনও কি ভুল করেও আঘাত করবার ইচ্ছা মানুষের জাগে না? অতি বড় দুর্ব্বল যে, তা'রও একদিন সকলের বিরুদ্ধে হাত ওঠে!"

এই বলে বামা আর মুহূর্ত্ত মাত্র সেখানে দাঁড়াল না, উপরে উঠে গেল।

নিস্তার খানিকটা বামার দিকে চেয়ে থেকে আপনা আপনি বল্লে—"স্থির গঙ্গায় তুফান উঠেছে, নৌকা না এবার বান্‌চাল হয়।" বলে সে অপর কাজে চলে গেল।

আঘাতটা যে অবশেষে কোথায় গিয়ে পৌঁছাল, তা বুঝতে পারা গেল যখন শিশিরের বে'র মাস দুই পরে হঠাৎ একখানা চিঠি বামার নামে এল, আর মুহূর্ত্ত মাত্র ভাববার অবকাশ না দিয়ে তাকে এক কাপড়ে চন্নপুরে গিয়ে হাজির হতে হল।

নলিনীদের বাড়ীতে সাবিত্রীকে রেখে, সেইখান থেকে শিশিরের বে' হয়েছিল। বে'র দিন পর্য্যন্ত বামা আর শিশির উৎকণ্ঠিত চিত্তে অমিয়-বাবুর কাছ থেকে একখানা চিঠির প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু মত বা অমত কোনটাই আসেনি। অধ্যাপক সুশীলবাবু, সান্ধ্য-সমিতির ছাত্রগণ আর দু' একটী পরিচিত প্রতিবেশী পরিবারদের সাহায্যে যথাশাস্ত্র মতে একরকম নিরাপদেই কাজটা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। বে'র দু'দিন পরে শিরোমণি মশাই সবার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে অমিয়বাবুর হাবভাব বোঝবার জন্যে একবার চন্নপুরে গেলেন। এদিকে কিছুকাল থেকে বাসা খরচের টাকা আসে নি বলে সকল দিকে একটু টানাটানি পড়েছিল। তবে বামা নিজে থেকে তা চালিয়ে নিতো, শিশিরকে কিছু জানতে দেয়নি। নিস্তার সবদিকে ভাল, বামার কথায় উঠে বসে—শিশিরকেও সে এক-

রত্তি বেলা থেকে দেখেছে, পুরোপুরি মনিবের মত না হোক্ তাকে খুবই স্নেহ ভক্তি করে; কিন্তু বামার কথাতে এই রকম ভাবে বে' করায় সে মনে মনে শিশিরের উপর একটু শ্রদ্ধা হারালে। সেটা যে সাবিত্রীকে বে' করার জন্যে, তা নয়, অথবা অসামাজিক ভাবে হ'ল বলে, তার জন্যেও নয়,—সে ব্রাহ্মণদের সমাজ নিয়ে মাথাও ঘামায়নি, আর কিছু বোঝে-ওনি; তার অশ্রদ্ধা হল শিশিরের উপর এই ভেবে, যে, যতই কেন কর্ত্তব্য হোক্ না, তা বলে বাপের অমতে বে' করাটা কিছুতেই ভাল নয়। আর পাঁচজনের কথায় নেচে এতটা স্বাধীন হওয়া এতটুকু ছেলের,—বিশেষ যে এখনও বাপের ভাতে আছে—পোড়ো ছেলে, তার পক্ষে এটা কোন মতেই উচিত হয়নি। তার ধারণা—শিশিরকে এর জন্যে পস্তাতে হ'বে।

বামাই যেন শিশিরের সব—তার আদেশ যেন তার কাছে একে-বারে বেদবাক্য। এইটাই বা কি রকম, নিস্তার তা ভেবে উঠতে পারতো না। মা'-মরা ছেলেকে মানুষ করা মা'ই যেন হল, তা বলে তার কথায় বাপকে অগ্রাহ্য করতে হবে, এমন ত কখন শুনিওনি! এই রকম নানা কথা নিস্তারের মনে উদয় হত। সময়ে সময়ে বামাকেও সে বল্‌তে ছাড়তো না।

এমন সময় বামার নামে চন্দনপুর থেকে একদিন একখানা চিঠি এল। তখন সবেমাত্র তাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে। চিঠিখানা পড়েই বামার গাল দুটো রাঙা হয়ে উঠলো—যেন কে একমুঠো আবির তার মুখে ছড়িয়ে দিলে! পরক্ষণেই দেখতে দেখতে সমস্ত মুখখানা একেবারে ছাই-এর মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে মাটীতে বসে পড়লো।

বামার অবস্থা দেখে নিস্তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কোত্থেকে চিঠি এল দিদিমণি—কে লিখেছে ?"

বামা সে কথার উত্তর না দিয়ে একেবারে বল্লে—"নিস্তার," আমার সঙ্গে তোকে এখুনি চন্নপুরে যেতে হবে, তুই চট্ করে আঁচিয়ে নে।"

নিস্তার খানিকটা অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বল্লে—"চন্নপুরে ? কেন, কি হয়েছে ?"

—"বেশী কথা ক'বার সময় নেই। ছ'টোয় গাড়ী শুনেছি; একটা বেজেছে। এতে না গেলে সেই একেবারে রাত্রি আটটায় গাড়ী, পৌঁছুতে রাত্রি ছুটো বেজে যাবে।"

নিস্তার বল্লে—"ছোটবাবু যে তিনটের পর কলেজ থেকে আস্বে।"

বামা বল্লে—"তার সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না। ছ'তিন দিনের মধ্যেই ফিরবো। আমায় যেতেই হবে। শিশিরকে দেখাবার জন্যে সাবিত্রীর কাছে এই চিঠি আমি রেখে যাব, সে পড়লেই বুঝতে পারবে কেন যাচ্ছি। তুই শীগ্গীর একখানা গাড়ী ডেকে আন্, আর ছ' একখানা কাপড় একটা পুঁটুলীতে বেঁধে নে।"

হুকুম দিয়েই বামা উপরে গেল। সেখানে সাবিত্রীকে সব বুঝিয়ে বলে তার হাতে চিঠিখানা আর কিছু টাকা দিয়ে বল্লে—"কিছু ভেব না মা, আমি ছ' তিন দিনের মধ্যেই আস্বো। শিশিরকে ভাবতে বারণ কোরো।"

সাবিত্রীর মুখ শুকিয়ে গেল, সে বল্লে—"মার যা অবস্থা, তাতে কি করে দিন কাটবে মাসীমা ?"

বামা আশ্বাস দিয়ে বল্লে—"এমন ত মাঝে মাঝে বাড়ে, আবার কমেও

যায়, তার জন্যে চিন্তা কি ?—শিশির তার বন্ধুদের ডেকে এনে বাড়ীতে এ দু'দিন না হয় থাকবে। আমার যে বড় দরকার মা, নইলে কি এমন করে যাই ?"

তার পর সাবিত্রীর মার কাছে গিয়ে, তাকে সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে, কাপড়-চোপড় ছেড়ে নিয়ে নিস্তারকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লো। অত তাড়াতাড়ি করে গিয়েও ষ্টেশনে পেঁছি দু'এক মিনিট থাকতে কোন গতিকে টিকিট কিনে তারা গাড়ীতে উঠে বস্‌লো—আর গাড়ী ছেড়ে দিলে।

গাড়ী যখন চন্দনপুরে পেঁছাল তখন রাত্রি হয়ে গেছে। ষ্টেশনে নেমে একখানাও পাল্কী কিম্বা গাড়ী কিছুই পাওয়া গেল না। তখন অগত্যা তারা দুজনে সন্ধ্যার আবছায়ায় ধীরে ধীরে গ্রামের রাস্তা ধরে অগ্রসর হতে লাগ্‌লো।

বামা এতকাল ধরে এ গ্রামে আছে, কিন্তু পথ-ঘাট কিছুই চেনে না। বাড়ী থেকে সে বারই হত না—যদিও কোথাও যেতে হত তাহলে অমিয়বাবুর পাল্কী কিম্বা গাড়ী করেই যেত। পুরোনো লোক বলে চিরকাল সহিস কোচম্যান সকলেই তার আজ্ঞা পালন করতো। সে বিষয়ে কর্ত্তার ঢালা হুকুম দেওয়া ছিল। তার সকল আধিপত্য নষ্ট হয়েছে অনঙ্গ বাড়ীতে আসবার পর হতে। তার পূর্ব্বে তাকে এক-দিনের জন্যও কেউ প্রকাশ্যে কোন রকমে অবজ্ঞা করেনি বা রাঁধুনী বলে তার সম্ভ্রমের হানি করেনি। সে গর্ব্বের সহিত সেখানে বাস করত, সে গর্ব্ব তার চুর্ণ হয়েছে। কার দোষে ? নানা চিন্তায় বামার মাথাটা টল্‌মল্‌ করছিল।

শিব-মন্দিরের কাছে এসে বামা বল্লে—"নিস্তার, আমি এইখানে বস্‌ছি, তুই শীগ্‌গীর শিরোমণি মশাইকে এখানে ডেকে আন্‌ দিকি।"

নিস্তার একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে বল্লে—"নাও কথা, তুমি পাগল হলে না কি? তর্ক-চূড়োমণিদের বাড়ী কি এদিকে না কি? এ তো চন্নপুর—আর একটু গেলেই ত বাবুদের বাড়ী গো!"

বামা সে খবর মোটেই জানতো না। চলবারও তার আর শক্তি ছিল না। হতাশ হয়ে বল্লে—"তবে কি হবে নিস্তার? তাঁর সঙ্গে দেখা যে করতেই হবে, নইলে সবই যে পণ্ড হবে!"

নিস্তার বল্লে—"তোমায় বাবু আজও আমি চিন্‌তে পারলুম না। কখন আগে কোন কথা ভাঙবে না ত, আধখানা পেটের ভেতর রেখে আধখানা মুখে বলবে। গোড়াতেই যদি বলতে, যে, শিরোমণি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করবে, তাহলে এতটা পথ আসি কি? সে ত নতুন বৌ—সেই আচার্য্যি বাড়ীর কাছে।"

বামা জিজ্ঞাসা করলে—"সেখানে কি যাওয়া যায় না?"

নিস্তার বল্লে—"যাবে না কেন? আরও অম্‌নে হাঁটতে হবে। তার চেয়ে চল না কেন বাড়ীতেই যাই?"

বামা বল্লে—"বাড়ীতে? না নিস্তার, না ডাকলে কিসের জোরে যাব সেখানে? তিনি ত আমায় আসতে বলেন নি।"

নিস্তার বল্লে—"তবে এলে কেন? কার কথায় এলে?"

বামা প্রথমটা চুপ করে রইল, তার পর বল্লে—"এলুম কেন?" আবার একটু চুপ করে থেকে বল্লে—"তা তোকে না বলেই বা থাকি কি করে। তবে শোন, শিরোমণি মশায় কোত্থেকে জানতে পেরেছেন

যে, বাবু উইল তৈরী করছেন,—তাতে আমার শিশিরকে—তাঁর ছেলেকে একেবারে বঞ্চিত করে সমস্ত বিষয় নতুন বৌকে দিয়েছেন। আর শিশিরকে একেবারে তেজ্যপুত্র করেছেন—"

বামার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই নিস্তার বলে উঠলো—"মাথাটা খেলে? ছেলেটার আখের একেবারে খেলে? এ তো হবেই জানি; যেদিন বে'র পাকা কথা দেছ, সেইদিনই জানি যে এই হবে। ছি ছি ছি ছি মানুষ-করা ছেলে নিয়ে কি কাণ্ডটাই তুমি না করলে! কথায় বলে মা'র চেয়ে যার দরদ বেশী তারে বলে ডা'ন।"

নিস্তার আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বামা নিস্তারের হাত দুটো চেপে ধরে মিনতির সুরে বল্লে—"থাম্ নিস্তার, আর আমায় অত করে বলিস্ নি, আমি সহ্য করতে পারছি না। তুই জানিস না,—তুই এখনও সব জানিস না। এখন কি হবে নিস্তার? তুই এখন আমায় কি করতে বলিস?"

নিস্তার রাগে গর্ গর্ করতে করতে বল্‌লে—"কি আর হবে, নিস্তার কি করতে পারে?" তার পর আপনা আপনি লজ্জিত হয়ে রাগটা একটু সামলে নিয়ে বল্লে—এখনও কি তুমি বাবুর সঙ্গে দেখা না করে থাকতে চাও?"

বামা খানিকটা হেঁট হয়ে থেকে তার পর আস্তে আস্তে মাথাটা তুলে নিস্তারের দিকে চেয়ে বল্লে—"দেখা করে কি করবো?"

নিস্তার বামাকে একটু উত্তেজিত করবার জন্যে বল্লে—"তোমার নিজের ত একটা দাবী আছে, সেই অধিকারে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে শিশিরের হয়ে মার্জ্জনা চাইবে। শিশির তাঁর ছেলে, মনটা কি নরম হবে

না? যতই কেন না রাগ হোক্, তবু ছেলের ওপর ততটা পাষাণ হতে পারে না মানুষে।”

বামা নিঃশব্দে অনেকক্ষণ বসে থেকে, তার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে—“পোড়া বিষয়ের জন্যেই সব। এই বিষয়ের মমতাই মানুষকে নিষ্ঠুর করে তোলে। করেছেও তাই। যদি সব জান্‌তিস—যদি সব শুন্‌তিস, তা হ’লে আমাকে তুই দোষ দিতিস না নিস্তার, বরং—”

নিস্তার বাধা দিয়ে বল্লে—“আর আমার জেনে শুনে কাজ নেই দিদিমণি, যা আজ পর্য্যন্ত জানি তাই যথেষ্ট—চোখের জল ধরে রাখলে এতদিন সমুদ্দ‌ুর হয়ে যেত।”

বামা বলতে লাগলো—“দাবীর কথা বলছিলি, দাবী আমার কোথায়? নিজের হাতে নিজের আঙুল কেটে ফেলে—” বামা আর বলতে পারলে না।

নিস্তার যতদূর সম্ভব চোখ দুটো বা’র করে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শেষের কথাটা সে ভাল বুঝতে পারলে না—আঙুল কেটে ফেলা—!

বামা চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে নিস্তারের হাত দুখানা ধরে তাকে এক রকম টেনে নিয়ে যেতে যেতেই বল্লে—“তবে তোরই কথা শুন্‌বো নিস্তার, তাঁর সঙ্গে আমি দেখাই করবো। এখন চ’ দিকি,—কোন গতিকে একবার দেখা করিয়ে দে দিকি।”

২৪

ক্রমশঃ রাত্রি বেড়ে যেতে লাগলো দেখে নিস্তার বামাকে অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিজের বোন্‌ঝির বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখলে। রাত্রিতে আর কোন কথা হল না। উভয়েই তখন ক্লান্ত, সামান্য কিছু জলযোগ করেই শুয়ে পড়লো।

সকালে নিস্তার বল্লে—"দিদিমণি, আমার কথা শোন, তুমি এইখানেই দু' চার দিন থাক—আমি যেমন করে পারি বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব। এসেছ যখন, তখন দেখা না করে কোলকেতায় গেলে সকল দিকেই মাটী হয়ে যাবে।"

নিস্তারের যুক্তিটাই সদ্‌যুক্তি বলে বামার মনে হল। গত কয়েক বছরের ঘটনাগুলো একটার পর একটা করে তার মনে হতে লাগলো। সে ভেবে দেখ্‌লে, এক শিশিরের জন্যে তাকে কতই না দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়েছে। কার জন্যে আজও আমার এই লুকোচুরি? ভবিষ্যতের আশা ব্যর্থই হবে যদি, তবে কিসের জন্যে দীনতা স্বীকার করেছিলুম? ধৈর্য্যের কি কোন মূল্য নেই? দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশের দিন কি এখনও আসেনি?

অনেক ভেবে চিন্তে শেষে দিন কতক নিস্তারের বোন্‌ঝির বাড়ীতেই বামা রইল। কথা থাকলো—গোপনেই অমিয় বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে

হবে। অনঙ্গ আর তার মা যখন সেখানে রয়েছে, তখন প্রকাশ্যে তার বাড়ীতে যাওয়া হবে না।

প্রত্যহ বামা উৎকণ্ঠিত চিত্তে সুযোগের অপেক্ষায় বসে রইল।

নিস্তার সহজে কোন সুবিধা করে উঠতে পারলে না। তাকেও লুকিয়ে লুকিয়ে সংবাদ নিতে হত নইলে লোক জানাজানি হয়ে পড়বে।

• এমনিভাবে আজ কাল করে করে দুটি সপ্তাহ কেটে গেল। তারই মধ্যে একদিন নিস্তার এসে খবর দিলে, যে, শিরোমণি মশায়ও গ্রামে নেই। অমিয়বাবুর হুকুমে অনেক লাঞ্ছনা করে তাঁর ভ'য়ের সাহায্যেই তাঁকে চন্ননপুর থেকে চিরদিনের মত বিদায় করে দেওয়া হয়েছে; ঘরের চাল -কেটে দারোয়ানরা তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। গ্রামের অনেকেই দাঁড়িয়ে তা চোখে দেখেছে; কিন্তু প্রতিবাদ করতে কারো সাহসে কুলায় নি। এই সংবাদে বামা স্তম্ভিত হয়ে গেল। ক্রমশঃই সে হতাশ হয়ে পড়লো—অথচ কোলকেতায় ফিরে যেতেও পারছিল না, কে যেন তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। প্রতিদিন বিফল মনোরথ হয়ে আরও জেদ বেড়ে গেল। একবার সাক্ষাৎ করতেই হবে,—যদিও সে বুঝলে এই দেখাই হবে তার শেষ দেখা!

অমিয়বাবুর উপর তার একটা বিজাতীয় ঘৃণা এসেছিল।

এমন সময় নিস্তার হঠাৎ একদিন খবর পেলে, আজকাল না কি সন্ধ্যার পর কাছারীর সব লোকজন চলে গেলে অমিয়বাবু অনেকক্ষণ ধরে সন্ধ্যাহ্নিক করেন—আর কাছারীর পাশেই একটা ছোট ঘরে তাঁর পূজার সব উপকরণ ঠিক্ করা থাকে।

সেই খবর পেয়েই একদিন সন্ধ্যার পর বামাকে চুপি চুপি নিয়ে গিয়ে

তাকে ফটকের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে, নিস্তার আগে নিজের চোখে সব দেখে এসে বল্লে—"যাও দিদিমণি এই বেলা, বাবুর পূজো হল বলে, কেউ সেখানে নেই। দারোয়ান মিন্সে তার ঘরে বসে রামায়ণ পড়ছে, সেখান থেকে কিছু দেখা যায় না। আমি কাছারীর দোর গোড়ায় অপেক্ষা করবো।"

বামা আর তিলমাত্র বিলম্ব না করে সেখানে গিয়ে দরজা ঠেলে দেখলে—অমিয়বাবু সবেমাত্র উঠে হরিনের ছালখানা গুটিয়ে তুলে রাখছেন। দরজায় শব্দ হতেই পিছন ফিরে অমিয়বাবু দেখলেন—ঘরের ভিতর বামা দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে বিস্ময় প্রকাশ না করেই তিনি বল্লেন —"তুমি কি মনে করে? আস্‌বার কোন কথা ত ছিল না?"

বামা স্থির ভাবে জবাব দিলে—"না! আমি এখনই চলে যাব।"

—"তবে?"

—"তোমার ছেলের বিষয়ে কিছু জানতে এসেছি।"

—"জানবার কিছুই তেমন ত নেই। ছেলে ত তোমার, আমার কাছে আর কি জান্‌বার থাকতে পারে?"

—"উনিশ বছর পূর্ব্বে সেটা যদি মীমাংসা করে রাখতে, তাহলে আজ আর আমার কিছুই জান্‌তে আসতে হত না।"

বামার কণ্ঠস্বরে উষ্মা ছিল। অমিয়বাবু সেটা যেন লক্ষ্যই করেননি এমনি ভাবে বল্লেন—"দেখ শৈলজা, বাদানুবাদ করবার আমার ইচ্ছাও নেই, প্রবৃত্তিও নেই। আজ একটা খোলাখুলি কথাই তবে হয়ে যাক্। আমি চিরদিনই ন্যায়ের পক্ষপাতী।"

বামার দেহটা ঈষৎ কেঁপে উঠলো। তাই দেখে অমিয়বাবু বল্লেন—

"ন্যায়ের পক্ষপাতী কথাটা তোমার কাণে বাজলো,—না শৈলজা? তা হোক, লোকে কিন্তু সে জন্যে দোষ দেবে না। ন্যায়ান্যায় বিচার করে লোকে বাইরের আচরণ দেখে। ঘরের খবর কেউ কারো কখন জানতে আসে না। যারা বাইরে নিক্তির ওজনে কর্ত্তব্য করে যায়, সমাজের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদেরও অনেকের ঘরে অনেক রকম আচরণ থাকে, যা প্রাণপণ শক্তিতে তারা চেপে রাখতে চায়, দুর্ব্বলতা বাইরে প্রকাশ পেতে দেয় না। বিশ্ব সংসারে খুঁজলে আমার মত অনেক পাবে। আমি সে জন্যে কিছুমাত্র লজ্জিত নই।"

বামা নির্ব্বাক হয়ে অমিয়বাবুর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল,—অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"আমি সে কথা ভাল রকমই জানি।"

অমিয়বাবু বল্লেন—"জান বলেই বলছি। আমার কর্ত্তব্য আমি করে যাচ্ছিলুম,—ভয়ে বা লজ্জায় তা করিনি। তুমি হয় ত ভাবছো, আমার চোখে চামড়া নেই, তাই এতগুলো কথা বলে গেলুম। তা তুমি স্বচ্ছন্দে ভাবতে পার, আমার তাতে কোনই ক্ষতি নেই।"

বামা ক্রমশঃ চঞ্চল হয়ে উঠছিল, বল্লে—"তোমার নিজের পরিচয় শুনতে ত আজ আমি আসিনি, সে পরিচয় তুমি অনেক দিনই ত দিয়ে রেখেছ, এখন শেষ কি বলবে বল?"

অমিয়বাবু বল্লেন—"আগের দু'চারটে কথা না বলে দিলে শেষের কথাগুলো মানুষে ঠিক বুঝতে পারে না শৈলজা।"

বামা বল্লে—"না, তা আমায় মনে করিয়ে দিতে হবে না। আগেকার যা কিছু কথা আছে, সে সব একান্তই আমার নিজস্ব,—তার অংশীদার

হবার প্রবৃত্তি যখন তোমার হয়েছিল তখন তোমার মুখে অনেক কথাই আমি শুনেছিলুম—বিশ্বাসও করেছিলুম।”

অমিয়বাবু বল্লেন—“সে বিশ্বাসটা তুমি নিজের হাতেই নষ্ট করেছ শৈলজা।”

বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে বামা উত্তর দিলে—“আমি!—বিশ্বাস নষ্ট করেছি আমি?”—

—হ্যাঁ তুমি।”

—“কিসে? বিশ্বাস নষ্ট হয়েছে কিসে?”

অমিয়বাবু বল্লেন—“তুমি জানতে শিশিরকে নবীনকালীর সন্তান বলা ভিন্ন আর কোন উপায়ই ছিল না? আর তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেই সে কাজ করা হয়েছিল?”

—“তাই ত আগাগোড়া হয়ে আসছে। সে কথার বিন্দুবিসর্গও আর কেউ জানে না। তবু আমি বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি? আজ উনিশ বছর বুকের ভেতর পাঁজার আগুন চেপে রেখে, জীবনের সকল সাধ আহ্লাদ—যৌবনের অফুরন্ত স্বামী-প্রেম, কেবল একটি মুখের কথায় সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়ে তোমার সন্তানকে আমি মানুষ করে তুলেছি, সে কিসের জন্যে? সে কি শুধু এতকাল পরে একটা কলমের খোঁচায় তাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করবে বলে? ষড়যন্ত্র করে তাকে ত্যেজ্যপুত্র করবে বলে? তুমি অন্যায় করতে বসেছ কি না, সে কথা কাকে জিজ্ঞাসা করবে তুমি? তোমার নিজের অন্তর যদি মরে গিয়ে থাকে—অপত্য স্নেহের ক্ষীরসমুদ্র যদি শুষ্ক মরুভূমি হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে কে তোমার প্রশ্নের সমাধান করবে?”

অমিয়বাবু বল্লেন—"মনই আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে শৈলজা, আমার কার্য্যের জন্যে আমিই দায়ী। তোমায় সে জন্যে কোন চিন্তা করতে হবে না। বক্তৃতা আমি অনেক শুনেছি। ধর্ম্মের কাছে দোষীর বিচার হয়—মানুষের কাছে নয়।"

বামা বল্লে—"তাই ভেবে মনকে প্রবোধ দিয়েছ? এই যে ঘরের দেয়ালে কাঁচের ফ্রেমে আঁটা এতগুলো দেব-দেবীর ছবি রেখেছ, এইমাত্র যে দেখলুম তুমি প্রত্যেক ছবিটার নীচে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলে, এরা কি এখনি মূর্ত্তি ধরে এসে তোমার অত্যাচারের বিচার করবে, না তোমার সমুখে আজ দাঁড়িয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে? পাপ যখন পরিপূর্ণ হয়ে মানুষকে ঘিরে রাখে, তখন দেবতাদেরও সেখানে আসবার ক্ষমতা থাকে না।"

অমিয়বাবু বামার কথায় বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বল্লেন—"ওসব দেব-দেবীর নাম তুমি উচ্চারণ করো না শৈলজা, আমি জানি এ সবে তোমার বিশ্বাস নেই। তুমি হিন্দুর ঘরে জন্মেছ বটে, কিন্তু মানুষ হয়েছ ব্রাহ্ম-সমাজে।"

বামা উত্তেজিত হয়েছিল, কিন্তু হেসে জবাব দিলে—"যেখানেই জন্মাই আর যে সমাজেই মানুষ হয়ে থাকি, আমার অন্তরের ভিতরটা জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যায়নি—এখনও সেখানটা আমার নবীন সরস হয়ে আছে—সে দেবতার পীঠস্থানে এখনও দানবের অধিষ্ঠান হয়নি।"

—"তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না শৈলজা। শিশিরকে হয় ত শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করতুম না। কেন না সে রাজদ্রোহী হয়েছে শুনেও তখন কেবলমাত্র বাড়ী আসতেই তাকে মানা করেছিলুম। কিন্তু আজ

তুমিই তাকে ত্যাগ করালে। তুমি তোমার মতন করেই তাকে মানুষ করেছ, তাকে বুঝিয়ে দিয়েছ, যে, কুলাঙ্গার হওয়াই মানুষের ধর্ম্ম, আর—"

—"আর ?—"

—"আর পতিতাকে বিবাহ করাই এখনকার কর্ত্তব্য।"

—"মিথ্যা কথা! সে পতিতাকে বিবাহ করেনি।"

—"পতিতার কন্যাকে বিবাহ করেছে।"

—"না তাও নয়। দুর্ব্বল সমাজের অর্ব্বাচীন লোকেরা অনেক সময় বিনা বিচারে অনেককে পতিত করে রাখে। তাদের রক্ষা করা ধর্ম্ম তাদের আশ্রয় দেওয়া মনুষ্যত্ব।"

—"আমি ভুল শুনিনি শৈলজা। তার মার চরিত্রে দোষ ত ছিলই, তা ছাড়া তারা অন্য সমাজের। শিশির স্ব-ইচ্ছায় বা তোমার ইচ্ছায় আর কতকগুলো অবিবেচক মূর্খের মতলবে ধর্ম্ম ত্যাগ করেছে সমাজ ত্যাগ করেছে। সে আমার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হতে পারে না।"

বামা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে অমিয়বাবুর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বল্লে—"খুব চমৎকার বুঝিয়ে দিলে ত? অকাট্য যুক্তি! কোলকেতায় তাকে পাঠিয়ে দিয়ে পর্য্যন্ত একটা সুযোগ অনুসন্ধান করছিলে,—এইবার কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চাও?—এতটা ধর্ম্মজ্ঞান, সমাজনীতি তোমার ছিল কোথায়,—যখন কল্পবাজারে বসে ব্রহ্ম-সঙ্গীতে বিভোর হয়ে দু'চক্ষে ধারা বয়ে যেত, যখন সর্ব্বস্বের বিনিময়ে একজন অবলার সর্ব্বনাশ করেছিলে?"

বামার সমস্ত দেহটা কাঁপতে লাগলো। সে আরও কি বলতে যাচ্ছিল,

তাকে বাধা দিয়ে রূঢ়স্বরে অমিয়বাবু বল্লেন—"সে সব কথা তুলে এখন আমায় সংকল্পচ্যুত করতে পারবে না শৈলজা; কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।"

বামা দৃপ্ত স্বরে উত্তর দিলে—"কেউ বিশ্বাস করুক ছাই না করুক আমার তাতে আসে যায় না। তোমার জমিদারী দেখে আমি তোমায় বিবাহ করিনি, যার লোভে এত লাঞ্ছনা সয়েও তোমার দ্বারস্থ হতে এসেছি। সে লোভ যদি আমার থাকতো তাহলে তোমার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমি সে কাজ হাসিল করতে পারতুম। তুমি একটু একটু করে তোমার সমস্ত তালুক যে নবীনকালীর নামে কিনছিলে, সে কথা জানতে পেরেও আমি কোন কথা কইনি। তোমার মনে অনন্ত পাপ ছিল, কিন্তু আমার অন্তরে তার ছায়া মাত্র ছিল না। তুমি আমায় যেমন বুঝিয়েছিলে আমি সরল বিশ্বাসে তাই বুঝেছিলুম। শিশির বিষয়ের উত্তরাধিকারী হতে পারবে—সেই আনন্দে আমি বিভোর হয়েছি-লুম,—তা সে যে দিক দিয়েই হোক না কেন—রক্ষিতার সন্তানই হোক, আর হিন্দু-স্ত্রীর গর্ভজাত বলেই প্রচার থাক্। নিষ্ঠুর তুমি,—এত বিশ্বাস আমার তোমার উপরে ছিল যে, আমার একমাত্র সম্বল বিবাহের সার্টিফিকেট, তাও তুমি নিয়ে রেখেছিলে—একদিনও চোখে তা দেখিনি।"

বামার গলার স্বর ক্রমশঃ বদ্ধ হয়ে এল, সে আর কথা কইতে পারলে না—দেয়াল ধরে হাঁপাতে লাগলো। মুখ শুষ্ক বিবর্ণ, বোধ হয় একটা পলকের আঘাতে সে তখনই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তো।

অমিয়বাবু তার সেই অবস্থা দেখেও শ্লেষের ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা

করলেন—"সেথানা যদি আজ ফিরে পাও শৈলজা, তাহলে তুমি কি কর ?"

বামা ক্রুদ্ধা সিংহীর মত ঘাড় বাঁকিয়ে দৃপ্ত স্বরে বল্লে—"তোমার আসল মূর্ত্তি তাহলে লোকালয়ে প্রচার করে দিয়ে যেমন করেই হোক্ শিশিরকে বিষয়ের উত্তরাধিকারী করি, তোমার হিন্দুত্বের গোঁড়ামী ঘুচিয়ে ব্রাহ্ম সমাজের কাছে তোমার অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করি।"

ক্রুদ্ধস্বরে অমিয়বাবু বল্লেন—"তবে জেনে রাখ শৈলজা, আমার নিজের হাতে তা অনেকদিন পূর্ব্বে পুড়িয়ে ফেলেছি। আর যদি কখন তুমি কক্স-বাজারে গিয়ে তার কপি বার করতে পার, তাতে দেখবে, শৈলজার বে' হয়েছিল নৃত্যগোপাল চাটুয্যের সঙ্গে, আর দু'বছর আগে চেরাপুঞ্জির পাহাড়ে তার মৃত্যু হয়েছে।"

বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বামা বল্লে—"পাষণ্ড !"

—"যাও শৈলজা, অনেক কথা তোমার শুনেছি, আর কিছু শোনবার ইচ্ছা নেই। তোমার সঙ্গে আমার কখন কোন সম্বন্ধ ছিল না—দিনকতক রাঁধুনী ছিলে মাত্র। তার পর অপর কিছু সন্দেহ কেউ যদি কখন করে থাকে, বড়লোকের পক্ষে সেটা বিশেষ লজ্জার কথা নয়। শিশির কুলাঙ্গার, তাকে নিয়ে যেথা খুসি থাকগে,—আমার পথে আর কখন এস না। উইলের নকল আমি আগেই শিশিরকে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার বিষয়ের এক কপর্দ্দকেও তার অধিকার নেই। নবীনকালীর সন্তান লোকে জানলেও—ধর্ম্মের জন্যে সমাজ রক্ষার জন্যে আমি তাকে ত্যেজ্য-পুত্র করেছি।" এই বলে সেখান থেকে চলে যাবার জন্যে দু' এক পা অগ্রসর হতেই, আবার ফিরে দাঁড়িয়ে অমিয়বাবু বল্লেন—"আরও একটা

কথা জেনে রাখ শৈলজা, তোমার ছেলের কুলটা শাশুড়ী মরে গেছে, আর সে তার স্ত্রীকে নিয়ে কোলকেতা থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে।"

বামা নির্ব্বাক নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল—কেবল তার চোখ থেকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি অমিয়বাবুর উপর গিয়ে পড়লো।

অমিয়বাবু সে দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে দরজার হাতলে হাত দিলেন। মনে হল কে যেন বার দিক থেকে শিকল বন্ধ করে রেখেছে। একটু জোরে টানতেই দরজা ঝন্ ঝন্ করে খুলে গেল, আর তিনি চেয়ে দেখলেন—বাইরে দাঁড়িয়ে অনঙ্গ—আর তার পিছনে নিস্তার! ভূত দেখলে মানুষ যেমন শিউরে ওঠে, ঠিক তেমনি ভাবে অমিয়বাবু বল্লেন—"তুমি!"

—"হ্যাঁ আমি, লুকোবার আর কিছুই নেই, আমি সব শুনেছি" এই বলেই অনঙ্গ ঘরের ভিতর এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বল্লে—"এই নাও তোমার উইল, যা তুমি আদর করে আমার কাছে রাখতে দিছলে। আমি বিষয় চাই না। যেখান থেকে পার তুমি আমাদের ছেলেকে খুঁজে এনে দাও। যতদিন না তুমি তাকে তোমার পুত্রের ন্যায্য অধিকার দেবে, —তোমার আমার মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই।"

অনঙ্গর কথায় অমিয়বাবুর দেহের প্রত্যেক শিরার ভিতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ খেলে গেল। তিনি অসহায়ের মত চতুর্দ্দিকে চাইতে লাগলেন। অনঙ্গ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বরাবর বামার নিকটে গিয়ে তার পায়ের ধুলো নিয়ে গদ গদ কণ্ঠে বল্লে—"কত কষ্টই আজীবন সয়েছ দিদি, আগে আমায় পরিচয় দাও নি কেন?" বলেই সে তার হাত দুখানি ধরে ফেল্লে।

বামার তখন কথা ক'বার শক্তি ছিলনা, মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করছিল, সমস্ত ঘরখানা যেন চোখের সম্মুখে তার ঘুরছিল। সে লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে অনঙ্গর মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে মাটীতে পড়ে যাবার মত হতেই, নিস্তার আর অনঙ্গ তাকে ধরে ফেল্লে।

ছুটো হাত মুখে চাপা দিয়ে অমিয়বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

২৫

যখন বার-বাড়ী থেকে বামার মূর্চ্ছিত দেহ ধরাধরি করে উপরকার ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়ানো হল, তখন বাড়ীশুদ্ধ লোক দেখবার জন্যে একেবারে দরজায় ঝুঁকে পড়লো।—

সকলেই নির্ব্বাক্ হয়ে পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কেউই জানতে পারলে না। আর তখন জিজ্ঞাসা করতেও কারো সাহস হ'ল না।

অনঙ্গ সারারাত্রি ধরে' বামার শুশ্রূষা করলে। সকালে ডাক্তার এসে অনেক চেষ্টা ক'রেও মূর্চ্ছা ভাঙাতে পারলে না।

পনের দিন পরে বামার জ্ঞান হ'ল, কিন্তু কথা কইতে পারলে না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে কেবল চতুর্দ্দিকে চাইতে লাগলো।

জেলা থেকে বড় বড় ডাক্তার এসে চিকিৎসায় নিযুক্ত হ'ল; বাইরে বসে অমিয়বাবু সব বন্দোবস্ত করতে লাগলেন, কিন্তু বামার ঘরের ত্রি-সীমানায় তিনি কিছুতেই ঘেঁসতে পারলেন না। সেটা যে শুধু রোগীর কাছে যেতে তাঁর লজ্জা হচ্ছিল, তা' নয়,—অনঙ্গর মুখের পানেও তিনি চাইতে পারছিলেন না। অনঙ্গর নিকট হতে যে সব কথা চেপে রাখতে তিনি আগাগোড়া চেষ্টা করছিলেন, তার জন্য কত রকম কৌশল ক'রে বামাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, আজ সকল চেষ্টা পণ্ড হওয়াতে তিনি আর মাথা তুলতে পারছিলেন না।

অনঙ্গকে অমিয়বাবু ভয় করতেন। তাঁকে দেখলেই অনঙ্গ মুখ ফিরিয়ে নিত, কথা কইত না। অনেক সাধ্য সাধনার পর যদিও সে দু' একটা কথা কইত, তা অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে, যেন কথা না কইতে হ'লেই বাঁচে। তা'র একমাত্র কথা—"শিশিরকে এনে দাও।"

অমিয়বাবু বল্লেন—"আমি চতুর্দ্দিকে শিশিরের সন্ধানে লোক পাঠিয়েছি নতুন বৌ, কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

অনঙ্গ বল্লে—"এখনও দিদির স্পষ্ট জ্ঞান হয়নি, সব ভাল বুঝতে পাচ্ছে না, তাই,—কিন্তু সেরে উঠে যখন জিজ্ঞাসা করবে, তখন আমি কি জবাব দেব?—তুমি কাগজে ছাপিয়ে দাও, যেমন করে' পার তাকে বাড়ী নিয়ে এস। যতদিন না তুমি তা'কে আন্‌তে পারবে, আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক থাক্‌বে না। বিশেষ দরকারী কথা ছাড়া কোন কথাও আমি ক'ব না।"

সিদ্ধেশ্বরী মেয়ের ধনুক-ভাঙা পণ শুনে গায়ের জ্বালায় একদিন বলে' বস্‌লো—"তোর এসব কি লা অনি? পেটের ব্যাটা নয়, সতীন-পো,—তাও আবার তার মা নেই, তার জন্যে তোর এতই বা কেন? ঘরের কড়ি দিয়ে যাকে বিদেয় করবার কথা।"

অনঙ্গ মাকে এমন ধমক সেদিন দিলে, যে, মা একেবারে সাত হাত পেছিয়ে গিয়ে বল্লে—"তোর ভীমরতি হয়েছে অনি, নইলে সতীনের ব্যাটার উপর এত দরদ!"

অনঙ্গ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মার মুখের উপর বল্লে—"আবার কথা কইছ? তোমার লজ্জা করে না? সতীন-পো হ'লেই তার সর্ব্বনাশ ক'রতে হবে, এই যদি তোমার ধারণা থাকে, তাহ'লে সেই ধারণা নিয়ে তোমার

নিজের বাড়ী গিয়ে থাকগে, এখানকার সংসারে আর আগুন জ্বেল না। তা' তুমি মা-ই হও আর যেই হও, আমি কিছুতেই তা বরদাস্ত ক'রতে পারবো না।"

মেয়ের চোখ-রাঙানীতে সিদ্ধেশ্বরীর প্রচণ্ড অভিমান হ'ল, সে সেই দিনই গাড়ী যুতিয়ে নিজের বাড়ী চলে গেল। মেয়েও তাকে থাকবার জন্যে জেদ্ করলে না।

তিন চার মাসের পর তবে বামা একটু একটু করে উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগলো। শরীর তখন বড় দুর্ব্বল। অনঙ্গ তাকে উপর হতে একেবারে নামতে দিত না। সেই পুরোনো ঝি নিস্তার সর্ব্বক্ষণ বামার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকতো। অনঙ্গর ব্যবহারে বামা এত মুগ্ধ হয়েছিল, যে, একদিন সে বল্লে—"জীবনে জ্ঞানতঃ যদি কোন পাপ করে থাকি নতুন বৌ, তবে সে তোকে সন্দেহ করে—আর তার শাস্তি ঈশ্বর আমার হাতে হাতে দিয়েছেন। নইলে শিশির কেন আজ নিরুদ্দেশ হ'বে। বড় অভিমানী ছেলে সে। দুদিন পরে কোলকেতায় ফিরবো বলে এসে, দু'সপ্তাহের বেশী আমি দেরী করলুম দেখে, নিশ্চয়ই আমার উপর অভিমান ক'রে চলে গেছে।"

অনঙ্গ বল্লে—"শুধু কি তাই দিদি, বাপ যদি বিনাদোষে ত্যেজ্যপুত্তুর করে, জ্ঞানবান ছেলে কি কখন সাধ করে সে বাড়ীতে ঢুকতে চায়?"

বামা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—"কিন্তু কি হবে এখন—কোথায় তাকে পাওয়া যাবে? দেখতে দেখতে ছ'মাস কেটে গেল, কোন সন্ধানই ত হল না! প্রাণেই কি সে বেঁচে আছে! মানুষ-করা মা আমি

জেনেও, তবু চব্বিশ ঘণ্টা সে আমায় না দেখে কোথাও টিকতে পারতো না।"

অনঙ্গ বল্লে—"প্রাণের ভয় কিছুই নেই ; তা তোমায় বলে দিলুম দিদি, দেখে নিও। সে তো একলা নয়।...হ্যাঁ দিদি বৌটি কেমন ?"

বামা বল্লে—"যদি কখন সেদিন আসে, চোখেই দেখবি। সে মেয়ের সঙ্গে বে' দিয়ে আমি কিছু অন্যায় করিনি নতুন বৌ। সে ক্ষেত্রে পড়লে তবে বুঝতে পারতিস্। শিরোমণি মশাইকে ওরকম করে অপমান করায় যে পাপ হয়েছে, জীবন-ভোর অনুতাপ করলেও বোধ হয় তার খণ্ডন হবে না।" বামা চোখের জল মুছলে।

অনেকক্ষণ পরে অনঙ্গ বল্লে—"এইবার যথার্থ অনুতাপ আরম্ভ হয়েছে দিদি! এখন যদি ওঁকে একবার দেখ, তাহলে বুঝতে পারবে—মানুষের মুখের ভাবেই সব বোঝা যায়। তোমার উপর চিরদিন যে নিষ্ঠুরতা করে এসেছেন, তার তো তুলনা নেই। শুনতে পাই প্রথম স্ত্রীর উপরও না কি অনেক দুর্ব্যাভার করেছেন ?"

বামা বল্লে—"যতদিন বয়স অল্প ছিল, দেহে রূপ, যৌবন, লাবণ্য ছিল, ততদিন তাকে এক ঘণ্টার জন্যেও কাছছাড়া করেন নি। তখন সামান্য চাকরী, খুবই অল্প আয়। নবীনকালী বলেছিল, সে জন্যে কিন্তু কোন কষ্ট কোন দিন ছিল না। শত সহস্র অভাবের মধ্যে থেকেও সে স্বামীর মনোরঞ্জন করতো। কিন্তু যেমন সে রুগীয়ে পড়লো, অমনি তাকে ত্যাগ করে দূরে চলে গেলেন। একখানা চিঠি লিখেও খোঁজ করেননি।"

এই অবধি বলে বামা চুপ করলে।

অনঙ্গ বল্লে—"আর কেন চেপে যাচ্ছ দিদি, আমি কি আর বুঝি না? তখন আবার তোমায় পেয়ে আর কোন কথা মনে রইল না। ছি ছি পুরুষগুলো কি গো! ...আচ্ছা দিদি, একটা কথা আমায় বলতেই হবে। পাঁচ ছ' বছরের পর দেশে যখন তুমি এলে, তখন নবীনকালীর অবস্থা কি রকম?"

বামা বল্লে—"একখানা শুকনো কঙ্কাল আর সমস্ত দেহ বাতে পঙ্গু! শুধু মুখখানা আর চোখ দুটো দেখলে বোঝা যেত, ভগবান রূপও দিয়েছিলেন!"

অনঙ্গ আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে—"তখনই ত তুমি টের পেলে যে, সে তোমার সতীন—আর লুকিয়ে তোমায় বে' করেছেন?...তোমার খুব রাগ হল?"

বামার চোখে জল এল—আঁচলে চোখ মছল, বল্লে—"রাগ কি থাকতে পারে নতুন বৌ? শুনলুম বটে সে আমার সতীন, আমার চেয়ে তার দাবীও আগেকার; কিন্তু দেখলুম কি জানিস্? যেন একটা সদ্য-ফোটা ভোরের গোলাপ ফুল, যেটি কোন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের হাতে পড়লে দেব-সেবায় লাগতো, সেই ফুলটী যেন কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন দুর্দ্দান্ত লোক খেলার ছলে তুলে নিয়ে ছিঁড়ে-খুঁড়ে অবশেষে নিষ্ঠুরের মতই তাকে মাড়িয়ে চলে গেছে। নবীনকালীর মুখেই তার দুঃখের কাহিনী শুনে আমার নিজের ভুল ধরা পড়লো, ভাবলুম—কি অন্যায় কাজই করেছি! আমি তখনই তাকে বুকে টেনে নিলুম।"

অনঙ্গর চোখে তখন জল এসে গেল; বল্লে—"আর বলতে হবে না দিদি, আমি আর শুনতে চাই না।"

বামা তাকে আদর করে জড়িয়ে ধরে বল্লে—"তুই নিজেই যে শুনতে চাইলি ভাই। ভয় নেই, তুই ভাবিসনি ; ঝড়ঝাপ্‌টা বাদলের দিন কেটে গেছে, এখন শরতের বেলা, শীতও মুকিয়ে আছে।"

অনঙ্গ বল্লে—"যাও—তোমার কথার মানেই আমি বুঝলুম না।"

নিস্তার ঘরে এসে দাঁড়াতে তাদের কথায় বাধা পড়লো।

বামা বল্লে—"কি নিস্তার? যেন কি বল্‌বি বল্‌বি মনে হচ্ছে। শিশিরের কোন খবর পাওয়া গেছে, কোন চিঠি এসেছে?"

নিস্তার চোখ দুটো বার করে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—"হ্যাঁ, চিঠি এসেছে—তাহলে আর ভাবনা ছিল কি? সব নষ্টের গোড়া পোড়ার-মুখো গোমস্তা মিন্সে,—সেই ত আগাগোড়া মিথ্যা কথা লাগিয়ে বাবুর মন ভারি করে দিয়েছিল।"

বামা জিজ্ঞাসা কল্লে—"তার মানে?"

নিস্তার ঝঙ্কার দিয়ে বল্লে—"শান্তিপুরে গিয়ে মড়া উনকুটি চৌষট্টি রকম বলে এসেছিল,—কেন, ইনি জানে না?" বলে অনঙ্গকে দেখিয়ে দিয়ে আবার বলতে লাগলো—"তার পর আবার কোলকেতায় তোমাকেই ত বাবুর নাম করে সাত সতের বলেছিল। নইলে এতটা ঘট্‌তো না কি? বলেছিল—পুলিশে ছোট বাবুর কথা জানতে পেরেছে —ম্যাজিষ্টার সায়েব চিঠি লিখেছে।"

বামা বল্লে—"সে যা হয়েছে তা হয়েছে—পুরোনো কথার আর দরকার নেই। গোপেশ্বর এখন কোথা?"

নিস্তার বল্লে—"ওমা, সে তো কবে ছুটি নে সরে পড়েছে। তিন মাস হতে চল্লো। আর সে এসেছে—তার প্রাণের ভয় নেই? কত

কীর্ত্তি করে গেছে দিদিমণি, তা তোমায় বলবো কি। এইমাত্র বাবু তার কি একটা টের পেয়ে বাইরে হুলুস্থুল লাগিয়েছে। কোথাকার একটা ছোট রকমের মহল না কি বাবুর অজান্তে লাটের খাজনা জমা না দিয়ে নিলেম করিয়ে বেনামা করে কিনেছে।"

অনঙ্গ বল্লে—"সে কখন—কোন্ সময় কিছু শুনলি ?"

নিস্তার জবাব দিলে—"ওই যখন বাবু এদেশ ও-দেশ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আর মুখপোড়াও আপনার কাজ এখানে হাসিল করছিল।"

অনঙ্গ বল্লে—"তুই থাম্ বাবু—অত চেঁচাতে হবে না। ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলে তাদেরও ফাঁকিতে পড়তে হয়। যাক্—এখন পাপটা বিদেয় হয়েছে ত ? তার দেশ কোথা ? ধরা পড়বে না ?"

নিস্তার বল্লে—"সেই চেষ্টাই না কি হচ্ছে। কাছারীর একজন বল্লে, কোথায় কোন্ চুলোয় তার না কি এক বৈমাত্র ভাই আছে, সেইখানে গোমস্তা গে লুকিয়ে আছে। পুলিসে এই খবর দেওয়া হবে—আমি শুনলুম। বাবুও না কি শীগগীর কোলকেতায় ওই জন্তে যাবে। অনেক টাকার তছরুপ করে সে পালিয়েছে।" বলেই নিস্তার চলে গেল।

অনঙ্গ বামার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"ওসব কাজের কি কোন জামীন থাকে না ? এই যে এত টাকার জমিদারীর সব ভার নিয়ে ওরা থাকে, তার কোনও রকম ব্যবস্থা থাকে না দিদি ?"

বামা হেসে বল্লে—"কি জানি ভাই, জমিদারীর কাজ ত কখন করি নি, কোনও ভারও কখন নিই নি। হয় তো কিছু থাকে, নইলে চুরি আদায় হয় কি করে।"

বামার কথা শেষ হতে না হতে অমিয়বাবু ঘরের দরজা থেকে উঁকি

মেরে দেখলেন। তাঁকে আসতে দেখে বামা উঠে আস্তে আস্তে অপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বামার সঙ্গে অমিয়বাবুর এখনও কোন কথা হয় নি।

উভয়েই পরস্পরের নিকট হতে দূরে দূরে থাকেন।

অনঙ্গকে বসে থাকতে দেখে অমিয়বাবু বল্লেন—"তুমিও যে বড় গেলে না?"

সে একটু সরে গিয়ে বল্লে—"সে কৈফিয়ৎ চা'বার ত তোমার কোন দরকার নেই, যে কাজে এসেছ তাই কর।"

অমিয়বাবু বল্লেন—"অপরাধের কি কোন কালেই মার্জ্জনা নেই? ভুল ত মানুষ মাত্রেই করে থাকে।"

অনঙ্গ বল্লে—"ভুল করে মানুষে না জেনে। তোমার ত ভুল নয়, অপরাধ।"

—"তারও ত মার্জ্জনা আছে?" এই বলে আর একটু অগ্রসর হয়ে তিনি অনঙ্গর নিকটস্থ হবার চেষ্টা করলেন।

অনঙ্গ আরও পিছিয়ে গিয়ে বল্লে—"অপরাধ যার কাছে আজীবন করে এসেছ, মার্জ্জনা করবার অধিকারী সে। আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো না—তাহলে বাড়ী থেকে চলে যাব। এক বাড়ীতে থাকতে গেলে কথা না কয়ে চলে না, তাই, কিন্তু কাছে এস না। আগে তুমি তোমার স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য কর।"—

অনঙ্গর কথায় বাধা দিয়ে অমিয়বাবু বল্লেন—"উইল ত আমি বদলে ফেলেছি। শিশির অর্দ্ধেক বিষয়ের উত্তরাধিকারী, সে ফিরে এলেই দখল পাবে। বাকী অর্দ্ধেক তোমার।"

অনঙ্গ বল্লে—"তবু আমার? না—সে হবে না, বাকী অর্দ্ধেক দিদির—যাকে রাজরাণী না করে বাড়ীর রাঁধুনী করে রেখে দিয়েছিলে।"

অমিয়বাবু বল্লেন—"তুমিও ত আমার স্ত্রী—তোমার প্রতিও আমার কর্ত্তব্য আছে।"

অনঙ্গ বল্লে—"দেখ, একটা একটা কর্ত্তব্য শেষ কর। আমার চিন্তা তোমায় করতে হবে না। শিশিরকে আমার কাছে এনে দিলে আমি যা সুখী হব, তোমার অর্দ্ধেক বিষয় পেলে তার সিকির সিকিও আনন্দ আমার হবে না।" এই বলে অনঙ্গ হন্‌হন্‌ করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অমিয়বাবু খানিকটা স্থির দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আপনার হাত দুটো বুকে চেপে ধরে আপনার মনে বল্লেন—"ঈশ্বর! কি করলে এ মোহ কাটে। আর কেন, এখন তো বার্দ্ধক্যের দ্বারে এসে পৌছেছি।" তার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কি জন্যে যে তিনি ঘরে এসেছিলেন সে কথা তাঁর মনেও রইল না।

২৬

অতিরিক্ত চতুর হয়েও গোপেশ্বর মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। হঠাৎ পাশা উল্টে যাওয়াতে সে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো।

নতুন বৌ সংসারে আসা পর্য্যন্ত তার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে উঠেছিল। সে আট দশ বছর ধরে একটু একটু করে নানা কৌশল আর মিথ্যা কথার জাল বুনে অমিয়বাবুর অন্তর থেকে শিশিরকে তফাৎ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল। ইদানীং সে যা' কিছু বলতো বা যা' কিছু করতো, অমিয়বাবুর তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ হত না। একমাত্র শিশিরই যখন এতবড় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, তখন যেন তেন প্রকারে তাকে পিতৃস্নেহ হতে বঞ্চিত করতে পারলেই গোপেশ্বরের পক্ষে সকল দিকে সুবিধা হবে জেনেই, সে ভিতরে ভিতরে সেই চেষ্টা করছিল।

একে ত সে মাতৃহীন—তায় উপর আবার যখন তার বাপ বুড়ো বয়সে নবীনা স্ত্রী ঘরে এনেছেন, তার রূপে মুগ্ধ হয়ে সকল কাজেই অবহেলা করছেন, তখন চিন্তার বিষয় কিছুই নেই। আর সৎমার কখন সে ছেলের উপর আন্তরিক টান হতে পারে না। টান হওয়া ত দূরের কথা, নতুন বৌ বরং বাবুর কাণে মন্ত্রণা দিয়ে সতীনের ছেলেকে পরই করে দেবে। কাজেও গোপেশ্বর কতকটা সেই রকম দেখতে পেলে। দেখলে বছর কতকের মধ্যেই অমিয়বাবু একটা বাসা ভাড়া করে কিছু মাসোহারা দিয়ে রাঁধুনীর সঙ্গে ছেলেকে কোলকেতায় বিদায় করে

দিলেন। তার পর নতুন বৌ আর তার মাকে মাথার মণি করে দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

মাসোহারা পাঠাবার ভারও পড়লো সেই গোপেশ্বরের উপর। বাবু একদিনের জন্যেও একখানা চিঠি লিখে ছেলের খোঁজ খবর নিলেন না। আর গোপেশ্বর কি পাঠালে না পাঠালে, তারও কোন হিসাব চাইলেন না। উপরন্তু ছেলে যাতে তাঁর ঠিকানা কিছুতেই জানতে না পারে, গোপেশ্বরকে সে বিষয়ে হুঁসিয়ার থাকতে বলে দিলেন। বাবু কি জন্যে কি করছেন তা সবিশেষ না জানলেও আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে গোপে-শ্বর এই গুলোকেই তার মহা অস্ত্র স্বরূপ করে নিয়েছিল। চতুর্দ্দিকের আবহাওয়া বুঝে সে চলতে পারতো বলেই, সে মস্ত বড় একটা চাল চেলে শিশির বা তার বন্ধুদের চন্দনপুরে ঢোকা একেবারে বন্ধ করেছিল। তারা যেদিন আসে, তাদের চালচলন পোষাক-পরিচ্ছদ কথাবার্ত্তা শুনে সে মনে মনে সঙ্কল্প এঁটে নিয়ে একেবারে তাদের সঙ্গে মিশে গেল। আবার তাদেরই কথামত শিবমন্দিরের চত্বরে প্রজাদের ডাকিয়ে গ্রামের মধ্যে মহা হৈচৈ লাগিয়ে দিলে।

কিন্তু সুশীলবাবু, শিশির বা তার বন্ধুরা কেউ জানতেও পারলে না, যে, সেই জনতার মধ্যে পুলিসের লোক ছদ্মবেশে থেকে তাদের সব কথা শুনে গেল, আর সেই দিন হতে শিশিরের উপর সরকারের কড়া নজর পড়লো।

এসব গোপেশ্বরেরই কীর্ত্তি; সে নিজেই একজন গুপ্তচর। আর সংবাদ যোগাবার জন্যে সে গোপনে কিছু কিছু মাসোহারা পায়। জমীদারদের ঘরের সন্ধান নেবার জন্য এমন অনেক ব্যবস্থা আছে বলেই প্রবাদ।

শান্তিপুরে অমিয় বাবুর কাছে সব কথা গোপেশ্বর বলেছিল, কিন্তু সে কথাটি জানায় নি, পাছে সে ধরা পড়ে যায়। সরকার চায়, জমীদারেরা যে যার প্রজাদের শান্তশিষ্ট ভালমানুষটি করে রাখে। যেন তারা কোন গতিকে বাইরের কোনও দলের সঙ্গে মিশতে না পায়। এইটুকু কর্ত্তব্য করে গেলেই হল। তার পর যে যার প্রজাদের রক্ত শোষন কর, তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

এখন গোপেশ্বর অমিয় বাবুর কাণে এমন বিষমন্ত্র ঢেলে দিলে, যে, অমিয়বাবু সশঙ্কিত হয়ে পড়লেন ; আর হুকুম দিয়ে দিলেন, যাতে ছেলে আর না চন্ননপুরের বাড়ীতে ঢোকে। বাপরে ! আমার ছেলে খদ্দর পড়বে ! কংগ্রেসে মিশবে !

এতকাল পরে সব দিকে যখন একটু সুরাহা হয়ে এল ; বাবু বিষয় থেকে ছেলেকে বেওয়ারিশ পর্য্যন্ত করলেন, ছেলেও নিরুদ্দেশ হল, তখন কি না সব উল্টে গেল ? বামা ঠাকরুণ হল কি না বাবুর বে' করা স্ত্রী—আর নতুন বউ সতীনপোর জন্যে হ'ল কেঁদে আকুল !

গোপেশ্বর গোপনে গোপনে অনেক কীর্ত্তি এতদিন করে এসেছে, অনেক টাকা সে ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করে ফেলেছে ; জমিদারীর ক্ষতিও বিস্তর করে এসেছে। কত রামের জমী যদুর ঘাড়ে চাপানো আছে, কত কালেক্টরীর খাজনা বেমালুম গাপ্ করে সে সব নিলামে তুলে বেনামী করে রেখেছে ; এই সব ক্রমে ক্রমে এখন ত ধরা পড়বে ! গোপেশ্বরকে তাহলে ত জেল খাটতে হবে ! বাবু এতদিন চোখ বুজে নতুন বৌকে নিয়ে মেতে ছিলেন, কোন দিকে নজর দেননি, গোপেশ্বর যা করেছে তাই হয়েছে। এইবার তাহলে ত সর্ব্বনাশ ! দিনরাত এই সকল দুশ্চিন্তায়

গোপেশ্বরের মাথা খারাপ হয়ে গেল। বামার অসুখ সারতে না সারতেই পুঁটলি পাঁটলা বেঁধে যা তা একটা বলে দিন কতকের ছুটীর নাম করে চন্দনপুর থেকে সে সরে পড়েলো। মাস কতক নিজের দেশে গিয়ে থাকবার পরই অমিয়বাবু তাকে চিঠি লিখে ডেকে পাঠালেন। চিঠিতে ভাষা এত মোলায়েম, যে, পড়ে গোপেশ্বরের মনে খটকা বাধ্‌লো। অমিয় বাবুকে সে হাড়ে হাড়ে চিনতো—তাঁর মেজাজ গোপেশ্বর ছাড়া আর কেউ বুঝতো না,—বহুদিন সে তাঁর পার্শ্বচর হয়ে কাটিয়েছে।

অমিয়বাবু যখন অমায়িক সাজতেন—কারো সঙ্গে খুব মিষ্ট ব্যবহার করতেন, তখন তিনি যে তার সর্ব্বনাশ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন তা স্থির নিশ্চিত। এর ভূরি ভূরি প্রমাণ গোপেশ্বরের জানা ছিল। তাই তার স্ত্রী যখন জিজ্ঞাসা করলে যে, বাবু অত করে ডেকেছে, তবু ঘরে বসে রইলে কেন?

তখন গোপেশ্বর স্ত্রীকে বল্লে—"একঘেয়ে খেটে খেটে মাথা খারাপ হবার যোগাড় হয়েছে, দিন কতক জিরুব বলেই এসেছি।"

সে চিঠির জবাব দিলে, 'বড় ফ্যাঁসাদে পড়েছি। না দেখার দরুণ বাড়ী ঘর সব পড়ে যাবার যো হয়েছে, এসব বন্দোবস্ত না করে কিছুতেই যেতে পাচ্ছি না। আরও মাস কতক হুজুরকে মাপ করতে হবে।'

তার পর অনেকদিন আর অমিয়বাবুর কোন চিঠিপত্র এলো না। গোপেশ্বর সতর্ক হয়ে দিন কাটাতে লাগলো।

আরও বছর খানেক এম্‌নি কেটে যাবার পর, একদিন গোপেশ্বরের কাছে একখানা গোপনীয় চিঠি এল—চন্দনপুরের কাছারী থেকে তারই একজন অনুগত লোক লিখেছে—

চিঠির মর্ম্ম—"রস্তমপুরের যে ছ' আনা সম্পত্তি '১৪ সালের কালেক্টরীর থাজনার দায়ে নীলাম সাব্যস্ত হয়েছিল, আর একজন আনন্দময়ী নামে স্ত্রীলোক খরিদ করেছিল, বাবু সে কথা এতদিন বাদে জানতে পেরে উকীলের পরামর্শ চেয়ে পাঠিয়েছেন, আর খুব শীঘ্র সেজন্যে কোলকেতা যাবেন।"

এইটুকু পড়েই গোপেশ্বরের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হল। সে বুঝতে পারলে, কেন বাবু এতদিন চিঠিপত্র দেন নাই। সে তখন তাড়াতাড়ি বাড়ী-ঘরের একটা বন্দোবস্ত করে, স্ত্রীকে 'চন্ননপুরে যাচ্ছি' বলে দেশ ছেড়ে পালাল।

তার বৈমাত্র ভাই হরিবিলাস দত্ত স্যাঁকরেলে থাকে,—সেখানকার চট্-কলের বড়বাবু। গোপেশ্বর এই ভাইয়ের কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। এ তল্লাটে থাকলে আর কেউ সন্ধান পাবে না, অমিয়বাবু ত নয়ই। সে বরাবর শুনেছিল হরিবিলাস দু হাতে টাকা উপার্জ্জন করে, আর মস্ত বড় খরচে। এখন এসে দেখলে যা শুনেছিল তা সত্য বটে। কিন্তু উপস্থিত চট-কলে মহা হাঙ্গামা চলেছে, সমস্ত মজুর ধর্ম্মঘট করে কাজ ছেড়ে দেওয়াতে কর্ত্তৃপক্ষকে বাধ্য হয়ে চট-কল বন্ধ রাখতে হয়েছে। হরিবিলাসের রোজগারের পথ একদম বন্ধ, কেবল মাইনেটি মাত্র ভরসা; ভেবে ভেবে সে একেবারে রোগা ইঁদুরটির মত হয়ে দিন কাটাচ্ছে। তার উপর প্রাণ নিয়ে টানাটানি। প্রায় হাজার বারোশো তাঁতি এক যোট হয়ে চারিদিকে সন্ধান করে করে বেড়াচ্ছে হরিবিলাসকে ধরবার জন্যে। কলের সাহেবরা অবশ্য তাকে নানাদিক থেকে রক্ষা করছে। পুলিশ সান্ত্রীর সাহায্যে সে অফিসে যায় আসে। কোন কোন দিন ভয়ে তাকে সেখানেই থেকে যেতে হয়।

গোপেশ্বর হরিবিলাসের মুখে সমস্ত শুনে জিজ্ঞাসা করলে—"কেন এমনটা হল বল দিকি ?—তোমার উপরেই বা সব চটলো কেন ?"

হরিবিলাস বল্লে—"সে অনেক কথা দাদা, একশালা বামুন তাঁতি ঢুকে কলের মধ্যে এই সব ল্যাঠা বাধিয়েছে।"

—"বামুন তাঁতি কি রকম ?"

—"আরে, লালমোহন তার নাম, বয়স একুশ কি বাইশ। কোত্থেকে যে এখানে এসেছে তা কেউ জানে না। সত্যি বামুন কি না তাও বলতে পারি না।—গলায় পৈতে আছে বলেই বলছি।"

—"তার পর ?"

—"শালা তাঁতিদের সঙ্গে ভাব করে প্রথম তাঁতঘরে ঢোকে কাজ করতে। সে দুবছর আগেকার কথা। অথচ বেশ লেখাপড়া জানে। তাঁতি পাড়াতেই তার বাসা। কিন্তু বছরাবধি বেজায় বাড়াবাড়ি করছে, বরদাস্ত করা যায় না।"

গোপেশ্বরের ভারি আগ্রহ হল ; জিজ্ঞাসা কল্লে—"লেখাপড়া জানে তবে তাঁত চালায় কেন ?"

হরিবিলাস মুখ বিকৃত করে বল্লে—"আমাদের সর্ব্বনাশ করবার জন্যে। তাকে আমরা ঢের বারণ করেছিলুম। বলেছিলুম, ভদ্দর লোকের বামুনের ঘরের ছেলে হয়ে তোমার এ প্রবৃত্তি হল কেন ? অপিসের বাবুর কাজে ঢোক না। তা সে সে-কথা কাণেও তোলেনি। ওই যত তাঁতি আর কলের মজুরদের সঙ্গে দিন রাত থাকে—জাত অজাত মানে না। মোছলমান আর ছোট লোকের সঙ্গে মিশে কালিঝুলি মেখে হাঁটুর উপরে কাপড় তুলে হয় ত বা ছুতোরের কাজেই খানিক লেগে গেল

নয় ত বাইশম্যানি মিস্ত্রীদের কাছে বসে বসে তাদেরই কাজ করছে। এই রকম তার যত বিদ্‌ঘুটে বৃত্তি।"

গোপেশ্বর জিজ্ঞাসা করলে—"তা সে যে কাজই করুক না কেন, তোমাদের তাতে ক্ষতি কি ?"

—"আগে শোনই না। মিস্ত্রীগিরিই করুক, আর মেথরগিরিই করুক, তাতে আমাদের কোন দুঃখই ছিল না। আগে আগে একটা ভাবনাই ছিল যে, লেখাপড়া জানে, সব ঘরের সায়েবদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা কয়, আর সায়েবরাও তার খুব পিঠ চাপড়ায়। তাই ভয় ছিল, পাছে আমাদের নামে লাগিয়ে ভাঙিয়ে ক্ষতি করে শেষে বড় একটা চাকরী বাগায়। কিন্তু সে যে তারও চেয়ে সর্ব্বনেশে লোক, তা জানতুম না। সব তাঁতি তার বাধ্য। যায় তাদের ছেলে-মেয়ে পর্য্যন্ত। সন্ধ্যার পর সে আবার পাঠশালা করে। ওই সব ছোটলোকের ছেলে মেয়ে-গুলোকে পড়ায়।"

গোপেশ্বর ক্রমশঃ আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছিল, জিজ্ঞাসা করলে—বল কি হে ? এ আবার কি খেয়াল ! এক্‌লা সে ওই সব করে ?"

—"না—আরও দুজন আছে। প্রথমে সে একাই পাঠশালায় পড়াতো, তার পর মাস কতক হল তার বৌও পড়াতে সুরু করেছে। আবার একটা গোঁপ-কামানো চাল-কলা বাঁধা পুরুতও তার দেশ থেকে এসে জুটেছে। এখন ওই তিনজনে মিলে তাঁতি পাড়ায় তিনটে পাঠশালা খুলেছে।"

—"তুমি যে আমায় অবাক করলে হে।"

—"অনেকেই অবাক হয়েছে।...এইবার কিন্তু বাছাধন টের পাবেন।

সায়েবরা একেবারে রেগে আগুন হয়েছে—আর তার রক্ষে নেই।"

—"কেন ?"

হরিবিলাস বল্লে—"তবে শোন। কলের সব মিস্ত্রী মজুরদার মেয়ে পুরুষ চিরকাল ধরে হপ্তার দিন বাবুদের কিছু কিছু দিয়ে থাকে—এ চির-কেলে নিয়ম। চাকরীতে ঢোকবার সময় প্রায় সকলকেই দু এক হপ্তার বা কোন কোন সময়ে একমাসেরও মাইনে বাবুদের দিতে হয়। কেউ কামাই করলে আমরা তার রোজটা লিখে রাখি, কিন্তু যে কামাই করে, সে অর্দ্ধেক নেয়, আর অর্দ্ধেক নিই আমরা। এখন ওই শালা লাল-মোহন সব লোককে শিখিয়ে দিয়েছে, যে, কেউ এক পয়সা বাবুদের দেবে না। ওপরওলার কাছে দরখাস্ত করেছে—"হয় সকলের রোজ বাড়িয়ে দেওয়া হোক্, নয় ঘুস নেওয়া বন্ধ করা হোক—আমরা গরীব মানুষ, পেট ভরে খেতে পাই না—আমরা বাবুদের পান খাবার জন্যে অত দিতে পার্ব্বো না।"

গোপেশ্বর চোখ দুটো বার করে বল্লে—"তা হলে শালা ত ভারি বদমাস ! অতগুলো লোককে সে একা ক্ষেপিয়ে এই কাণ্ড বাধিয়েছে ! বল কি হে হরিবিলাস ? দরখাস্ত পেয়ে সায়েবরা কি করছে ?"

—"প্রথমে কিছু করেনি—ছিঁড়ে ফেলে দিছলো। তারপর দু' চার হপ্তা দেখে এক শনিবার টাকা কড়ি নিয়ে ফটকের ধারে দাঁড়িয়ে কার-খানার সব মজুর মিলে বলে গেল, যে, সোমবার আমরা কাজে আসবো না। যদি না আমাদের দরখাস্তের প্রতিকার হয়, আমরা কলে ঢুকবো না। সে সময় যদি দেখতে ! যেন চার হাজার লোক

একেবারে রণমুখী। আর তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেই শালা লালমোহন।"

—"তাকে ধরতে পারে না সায়েবরা ?"

—বড় সায়েব তাকে ডেকে বল্লে—বাবু, তুমি এদের বুঝিয়ে বল, আমি শীগগীর একটা বন্দোবস্ত করবো—হেড অফিসে লিখে পাঠাবো—এরা চট-কলের কাজ যেন বন্ধ না করে।"

—"তাতে কি হল ?"

—"সে শালা তখন কোন কথা কইলে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল হাসতে লাগলো। আর তাঁত ঘরের বড় সর্দ্দার আলিমর্দ্দি মিঞা এগিয়ে এসে সেলাম করে বড় সায়েবকে বল্লে—"হুজুর, আমরা বাবুদের আর দারোয়ানদের ঘুস দিয়ে দিয়ে নাজেহাল হয়েছি। তিন চারবার দরখাস্ত করেও কোন ফল হল না দেখে আমরা এই মতলব করেছি।"

গোপেশ্বর বল্লে—"বাপরে! একটা একুশ বাইশ বছরের ছোঁড়ার কথায় এত বড় কাণ্ড হতে পারে! আচ্ছা তার চেহারাখানা কি রকম—খুব জোয়ান ?"

হরিবিলাস বল্লে—"মোটেই নয়। তবে রোগা সে তাও নয়। এক-হারা চেহারা—লম্বা, সোজা, কোঁকড়ান চুল মাথায়—"

—"কোঁকড়ান চুল!—খুব ফর্সা ?"

—"হ্যাঁ—খুব ফর্সা। তবে মাস দুই আগে মার অনুগ্রহ হয়েছিল বলে একটু ময়লা দেখায়। শালা যদি সেই সময় মরতো দাদা, সব আপদ চুকে যেত,—এ সব হাঙ্গামা মোটেই হত না। কি বলবো দাদা, এই এক মাসে তার জন্যে একা আমারই তিন চারশো টাকা ক্ষতি

হয়েছে। তার আগেও ওই শালার মতলবে তাঁতিরা পূর্ব্বে আমাদের যা দিত, তার সিকি দিত, তাও জোরজারি করে আদায় করতুম।"

গোপেশ্বর নিজে নিজেই বলে উঠলো—"ঠিক হয়েছে।"

হরিবিলাস আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"ঠিক হয়েছে কি বলছো দাদা?"

গোপেশ্বর বল্লে—"কিছু না। ভায়া, তাকে একবার আমায় দেখাতে পার? আর কে তার সঙ্গে আছে বল্লে?—একজন পুরুত বামুন?"

হরিবিলাস বল্লে—হ্যাঁ!—হ্যাঁ, তাকে কি বলে ডাকে আবার, একটা বিতিকিচ্ছি গোছের নাম।"

গোপেশ্বর বল্লে—"আচ্ছা ভেবে দেখ দিকি—নামটা মনে পড়ে না? বাঞ্ছাঠাকুর কি?"

লাফিয়ে উঠে হরিবিলাস বল্লে—"ঠিক্ ঠিক্, তাই বটে! বাঞ্ছারামই বলে বটে।"

গোপেশ্বর তখন গম্ভীরভাবে বল্লে—"তবে চল দিকি একবার থানায় যাই, তুমিও আমার সঙ্গে চল।"

বিস্মিত ভাবে হরিবিলাস গোপেশ্বরের মুখের দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ গোপেশ্বরের গাম্ভীর্য্য দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল; মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না।

গোপেশ্বর বল্লে—"চেয়ে রইলে যে? আছে ভায়া, ওষুধ আছে; এসেছি যখন, তখন তোমাদের একটা উপকার করে যাই। আমার সঙ্গে থানায় চল দিকি, পথে যেতে যেতে সব খুলে বল্‌বো। পুলিশ সায়েব কোথায় থাকে?"

—"ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে এখন বোধ হয় বড় সায়েবের বাংলায় আছে।"

—"তবে চল, সেইখানেই চল,...এখন বেলা কত বল দিকি?"

—"বারোটা হবে বোধ হয়।"

—"তবে শীগ্‌গীর আমায় বড় সায়েবের বাংলায় নিয়ে চল।" বলেই গোপেশ্বর হরিবিলাসের হাতটা ধরে টেনে নিয়ে হন্‌ হন্‌ করে ছুটে চল্লো। মনে মনে বল্লে—"রসো, আমার মুখের গ্রাস কেড়ে খেতে তা বলে কারেও দেব না—তা তুমি যে-ই হও,—স্বয়ং ভগবান এলেও নয়।"

২৭

পরের দিন।

সকাল বেলা লালমোহনের বাসার সমুখে খুব বড় রকম একটা জনতা হয়েছিল। তাদের সকলেই মজুরদার লোক। এত কলরব তারা করছিল যে, কারো কোন কথার এক বর্ণও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। তাদেরই একটু দূরে লালমোহন, বাঞ্ছারাম, কল্যাণী আর আলিমর্দ্দি সর্দ্দার দাঁড়িয়ে খুব গভীর মনোযোগ সহকারে পরামর্শ করছিল— প্রত্যেকের মুখেই উৎকণ্ঠার চিহ্ন বিদ্যমান।

মধ্যে মধ্যে কেবল আলিমর্দ্দি একটুখানি এগিয়ে গিয়ে জনতার দিকে চেয়ে হাত জোড় করে বলছিল—"তোরা খানিক চুপ দে না ভাই, অত চেঁচালে কি হবে?"

জনতার ভিতর থেকে একজন বল্লে—"ইস্পিরিং ঘরের বড় মিস্ত্রী নফর সাঁপুইকে এইমাত্র ধরে নিয়ে গেল, পুলিশের লোক কাল থেকে সব বাড়ী বাড়ী ফিরছে।" আর একজন অমনি বল্লে—"ভাবিস্‌নেরে ভাই, আমরাও যাব। খেটে যখন খেতে পাইনা, তখন ঘরেই বা কি আর সেখানেই বা কি—পেট ভরা ভাত-ডাল সেখানে দেবে ত?"

বাঞ্ছারাম লালমোহনকে বল্লে—"সুশীলবাবু ত আজ এখনো এসে পৌঁছল না? এত লোক জড় হয়েছে, এই সময় তিনি এলে বড়ই ভাল হত।"

লালমোহন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চিন্তাভারাক্রান্ত মুখখানা দেখলেই মনে হয়, সে যেন গভীর স্বপ্নাবিষ্ট, জাগ্রত অথচ তার লক্ষ্য দূরে বহু দূরে—জনতার শেষ সীমা ছাড়িয়ে যেন অতীত বর্ত্তমান সমস্ত ঘটনা একেবারে বিস্মৃত হয়ে কোন এক অতলস্পর্শ অন্ধকার ভবিষ্যতের মধ্যে অতি ক্ষীণ একটু আলোক-রেখার ঈষৎ স্পন্দন দেখে তারই অনুসরণ করবার চেষ্টা করছে। এত জন-কোলাহল, এত বীভৎস কলরব, কিছুই তার কানে প্রবেশ করছিল না। বাঞ্ছারামের কথা সে শুনতে পেলে না।

কল্যাণী একটু এগিয়ে এসে তার স্বামীর গা' টা স্পর্শ করে বল্লে—"কি অত ভাবছো? ইনি যা বল্লেন শুনতে পাওনি?"

কল্যাণীর স্পর্শে লালমোহনের যেন স্বপ্ন কেটে গেল, বাঞ্ছারামের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কি বল্লেন আপনি?"

বাঞ্ছারাম একটু উৎকণ্ঠিত ভাবে বল্লেন—সুশীলবাবু আজ বুঝি আসতে পারলেন না।"

লালমোহন একবার জনতার দিকে চোখটা বুলিয়ে নিয়ে বল্লে—"কই, এখনো ত আসেন নি। সকালেই তাঁর আসবার কথা ছিল।"

আলিমর্দ্দি কাছে এসে বল্লে—"এদের কি তবে এখন যেতে বল্‌বো?"

সে কথার উত্তর না দিয়েই লালমোহন জিজ্ঞাসা করলে—"কাল সন্ধ্যার সময় ম্যানেজার সাহেব তোমায় ডাকিয়েছিল, না সর্দ্দার?"

আলিমর্দ্দি বল্লে—"হ্যাঁ, আমি যাইনি। আজও দু'চার জন সর্দ্দারকে ডেকে পাঠিয়ে ম্যানেজার সাহেব কি বলছে শুনলুম। আমি তা বলে ঘাড় সহজে পাতছি না, তা বলে রাখলুম।"

লালমোহন বল্লে—সে কথা আমি জানি সর্দ্দার। কিন্তু, সবাই কি তোমার মত প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবে ?"

আলিমর্দ্দি বল্লে—"এখন ত রেখেছে। তবে ঘরে কাঁরো ভাত নেই।"

—"সেই কথাই ত ভাবছি সর্দ্দার। আমার কেবল মনে হচ্ছে, এ আমি কি করলুম!" আবার লালমোহন অন্যমনস্ক হয়ে গেল আবার জনতার দিকে আর একবার চেয়ে নিয়ে বল্লে—"এই যে এতগুলো লোক, এদের ভাল করবার আশায় না বুঝে না জেনে আমি কি আরও বেশী মন্দই করলুম ? এক মাস কারখানা বন্ধ করে রেখেছে, ওরা ধনী,—ইচ্ছা করলে আরও বেশী দিন বন্ধ রাখতে পারে, কিন্তু এদের উপায় কি হবে ?"

আলিমর্দ্দি বল্লে—"খোদা যা করবে তাই হবে। মনিবদের ওপর ত আমাদের রাগ নেই। আমরা বিচার চাচ্ছি। আমাদের পেট ভরে না বলেই আমরা জানাচ্ছি। আমরা যা খেটে খুটে পাই, তা পাঁচজনকে এইখানে বেঁটে দিয়ে ঘরে সামান্যই নিয়ে যাই, আমরা তাই তার প্রতিকার করতে বলছি। যাদের জন্যে আমরা খাটছি, গতরটা একেবারে পিষে দিয়ে যাদের ঘরে আমরা টাকার বস্তা আমদানী করছি, তারা আমাদের ভালমন্দ দেখবে না ? ঘুস দিয়ে আর জুলুম সয়ে যাদের হাতে আমরা জবাই হচ্ছি, তাদের হাত থেকে ছিড়েন পেলেও ত আমাদের অনেক থাকে !"

বাঞ্ছারাম বল্লে—"সে কথা ধনীরা বোঝে কই ? কারখানার ভিতর এই অত্যাচার, হাটে-বাজারেও এই অত্যাচার। গ্রামের মধ্যে গিয়ে

দেখ অত্যাচারে গরীব প্রজারা কাঁদছে, জমিদার কি বিহিত করতে পারে না ? গোলমাল করলেই বলবে ধনীর বিরুদ্ধে লেগেছে।"

বাঞ্ছারামের কথা শেষ হতে না হতেই জনতার ভিতর থেকে একজন বলে উঠলো—"আমাদের জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ। আমরা এর প্রতিকার চাই।"

অপর একজন এগিয়ে এসে বল্লে—"প্রতিকার কে করবে রে ভাই, জগন্নাথ এখন ঘুমুচ্ছে—"

আলিমর্দ্দি বল্লেন—"ঘুম ভেঙে গেছে ভাই জগন্নাথের—খোদার—ঘুম আজ ভেঙেছে বলেই লালুখুড়োর মত লোক জন্মাচ্ছে।—যারা আমাদের ঘেন্না না করে আমাদের সঙ্গেই মিশে গেছে। তারপর বাঞ্ছারামকে দেখিয়ে বল্লে—"এই দ্যাখ হিঁন্দুর ঘরের বামুন ঠাকুর আগে যারা আমাদের কেউ পথ দিয়ে চলে গেলে, গাঙের জল ছিটিয়ে তবে পথ মাড়াত, এখনো ত কেউ কেউ তা করে, সেই বামুন ঠাকুর দুর্গা পূজোর ভাসানের দিন আমাদের সঙ্গে কোলাকুলি করলে। জগন্নাথের ঘুম না ভাঙ্গলে কি তা হয় রে ভাই ? আল্লার কিরে, তোরা শুধু ঠিক থাক্, কথা মেনে চল্—"

জনসঙ্ঘ উত্তর দিলে—"আমরা ঠিক আছি।"

ভিড় ঠেলে হাঁপাতে হাঁপাতে একজন লোক ছুটে এসে খবর দিলে—"পুলিশ সায়েব ম্যাজিষ্টার সায়েব লালুখুড়োকে ধরতে আসছে—"

আলিমর্দ্দি বল্লে—"ধরতে আসছে ?—লালখুড়োকে ?"

আর একজন সেই রকম ভিড় ঠেলে বল্লে—"হ্যাঁ সর্দ্দার, আমিও সে কথা শুনেছি।—এখনো কিন্তু সময় আছে, এইবেলা সরাতে পারা যায়।

তার কথা শেষ হতেই কল্যাণী তার স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে দেখতে পেলে তার স্বামীর ঠোঁটের উপর দিয়ে একটু ক্ষীণ হাসির আভাষ ফুটে উঠে তখনই মিলিয়ে গেল। কল্যাণী মাথা নত করে তখন আলিমর্দ্দির কথা শুনতে লাগলো। আলিমর্দ্দিও চকিতের ন্যায় লালমোহনের সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা দেখেছিল;—দেখেই, যে লোকটা লালমোহনকে সরবার মতলব দিচ্ছিল—তার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে বল্লে—"যা বল্লি তা বল্লি—নূরফৎ, আর কখন ওকথা মুখে আনিসনি।"

কে একজন সেই সময় বল্লে—পরশু কোলকেতা থেকে যে বাবু এসেছিল, তাকে জাহাজ ঘাটে নামতে দেখে এলুম। সঙ্গে আরও তিন চারজন মেয়ে পুরুষ আছে।"

বাঞ্ছারাম লালমোহনকে ইসারা করে বল্লেন—"সুশীলবাবু তাহলে আসছে, আরও কে সব সঙ্গে রয়েছে।"

লোকজনের কলরবের মধ্যে সে কথা তখনই কোথায় চাপা পড়ে গিয়ে চারিদিক থেকে একটা গুঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। কেউ কেউ বলে উঠলো—"ওরে সরে দাঁড়া, পথ দে, নইলে ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ে পিষে যাবি।" জনতার মাঝখান দিয়ে আগে আগে জন কয়েক কনেষ্টবল, আর তাদের পিছনে ঘোড়ার উপর ম্যাজিষ্ট্রেট আর পুলিশ সাহেব আসছেন। তাঁরা যখন অনেকটা দূরে, সেই সময় কে একজন ভিড়ের ভিতর থেকে চেঁচিয়ে বল্লে--"ওই নামাবলী গায়ে লোকটার আর ফরসা ছুঁড়ীটার মাঝ খানে সে।"

লালমোহন হঠাৎ চমকে উঠে বল্লে—"চেনা গলার আওয়াজ বোধ হচ্ছে না—কে বলুন দিকি?" বাঞ্ছারামও সেই শব্দে চঞ্চল হয়ে উঠে,

দু' এক পা এগিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন। মুহূর্ত্তেকের জন্যে সমস্ত জনকোলাহল একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সাহেব উভয়েই তাদের ঘোড়া জনতার বাইরে রেখে, পায়ে হেঁটে বরাবর সোজা চলে এসে যেখানে কল্যাণী, বাঞ্ছারাম আর আলিমদ্দি লালমোহনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানে থামলো, তারপর সেই বিরাট নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব লালমোহনকে বল্লে—"I arrest you Babu, here is your warrant."

লালমোহন ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে ফিরে বল্লে—"আমার অপরাধ কি সাহেব?"

ম্যাজিস্ট্রেট লালমোহনের নির্ভীক প্রশ্নে আশ্চর্য্য হয়ে উত্তর দিলে—"টুমি যে নামে এই স্থানে পরিচিট আছে, সে নাম টোমাড় আছে না। এই টোমার পয়লা অপড়াধ I take you as an impostor."

লালমোহন খানিক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আবার বল্লে—"আচ্ছা সায়েব, আমার দ্বিতীয় অপরাধ?"

সমস্ত লোক নির্ব্বাক বিস্ময়ে উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনছিল। আলিমদ্দি সর্দ্দার ম্যাজিস্ট্রেটের কথার কোন রহস্যভেদ করতে না পেরে অবাক হয়ে লালমোহনের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে—তার মুখখানা যেন রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মাসকতক আগে যখন লালমোহনের শক্ত ব্যারাম হয়েছিল, তখনও বোধ হয় তার মুখের চেহারা এত পাণ্ডুর—এমন বিবর্ণ হয়নি।

ম্যাজিস্ট্রেট লালমোহনকে বল্লে—"ডিটিয় অপড়াঢ মজুরডিগকে—ক্ষ্যাপাইয়া ডিয়া টুমি কোম্পানির ক্ষটি কড়িটেছ"—

লালমোহন ধীর ভাবে বল্লে—"এই যে এতগুলো লোক হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছে, তারা মনিবের কাছে নিজের অভাব অভিযোগ দুঃখ কিছুই জানাতে পারবে না? এরা গরীব, মূর্খ, কথা ক'বার কিছুমাত্র শক্তি এদের নেই, বোবার মত চুপ করে থেকে এরা ঘরে-বাইরে সকলের কাছেই মার খায়। তাই আমি এদের হয়ে, এদের যা ন্যায়সঙ্গত দাবী তাই কোম্পানীর কাছে জানিয়েছি বলে আজ আমার অপরাধ? বেশ, এই যদি আপনাদের অভিজ্ঞতা—আমাকে arrest করুন।" তার পর কল্যাণীর দিকে চেয়ে বল্লে—শিরোমণি মশায় রইলেন তুমি রইলে, আমার অসমাপ্ত কাজের ভার দিয়ে যাচ্ছি, তোমরা তা সম্পূর্ণ কোরো।"

কল্যাণী প্রথমটা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কোন কথা তার মুখ থেকে বেরয় নি, যেন সমস্ত বাক্‌শক্তিকে তার হরণ করে নিয়েছে! কিন্তু স্বামীর হাতে হাতকড়া লাগাবার পর থেকেই সে চোখে আঁচল দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছিল, এখন লালমোহন থামতেই, সে স্বামীর হাতদুটো আঁকড়ে ধরে বল্লে—"ওগো, কর্ত্তব্য পালন করা কি এমনি ভয়ঙ্কর—এমনি কঠিন? তবে কেন কর্ত্তব্য কাজ করবার আগে মানুষের মন পাষাণ হয়ে নিরেট হয়ে যায় না? তুমি চোখের সামনে থেকে চলে গেলে আমি কি পারবো—সে শক্তি কি আমার আসবে?"

লালমোহন প্রাণপণ শক্তিতে আপনার চিত্ত-চাঞ্চল্য চেপে রেখে, শান্ত হাসি মুখে বল্লে—পারবে না?—তুমি যে কল্যাণী।"

...লালমোহনের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে পুলিশের লোকেরা খানিকটা অগ্রসর হয়েছিল, এমন সময় অপর দিক থেকে লোকের ভিড় সরাতে

সরাতে আগে আগে সুশীল বাবু আর তাঁর পিছনে অমিয়বাবু, বামা, নিস্তার আর অনঙ্গ উর্দ্ধশ্বাসে সেখানে এসে উপস্থিত হল। এঁদের দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না। সুশীলবাবু মহা ব্যস্তভাবে বাঙ্গারামের পিঠে একটা ছোট রকম ধাক্কা দিয়ে বল্লেন—"এঁদের সঙ্গে করে আনতেই এত দেরী, —একি! গেরেপ্তার করেছে!"

তাঁর কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে চীৎকার করে অনঙ্গ বলে উঠলো—"ও কি! শিশির!—শিশির!—বাপের ওপর অভিমান করে কি সর্বনাশ করলে তুমি?" বলেই অনঙ্গ পুলিশ বা সাহেবদের কাকেও গ্রাহ্য না করে একেবারে গিয়ে শিশিরের কোমরটা ধরে ফেল্লে। সাহেবরা ত্রস্ত হয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল, পুলিশরা সেপাই হাত ছেড়ে দিলে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত জনকোলাহল নিস্তব্ধ হয়ে গিয়ে এই নূতন ঘটনা দেখবার জন্যে সকলে যে যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি ভাবে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

অনেক দিনের পরে পরিচিত গলায় নিজের নাম শুনেই চমকে উঠে ফিরে দাঁড়িয়ে শিশির স্তব্ধ হয়ে গিয়ে কেবল বল্লে—'নতুন মা!—তোমরা!" আর তার মুখ থেকে কথা বেরুল না, বিস্ফারিত নেত্রে শুধু চেয়ে রইল। সুশীলবাবু তখন কাছে এসে বল্লেন—"কাল রাত্রি দশটার সময়, কোথা থেকে জানিনা আমার বাড়ীর সন্ধান পেয়ে এঁরা সকলে দোর ঠেলাঠেলি করে ডাকাডাকি করেন। মেয়েরা দোর খুলে দিয়ে এঁদের বসান। আমি বাড়ী ছিলাম না সান্ধ্যসমিতির মিটিংএ গেছলুম। এসে দেখি—এই ব্যাপার! তারপর সব শুনলুম, পরিচয় হল; সারারাত্রি কান্নাকাটিতে আমিও প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলুম না—তোমার অস্তিত্ব প্রকাশ করতে হল।' তার পর বামাকে দেখিয়ে বল্লেন—"ইনি বাধ্য হয়ে সে

সময় কোলকেতায় ফিরতে পারেননি, ব্যারামে মৃত্যুমুখে পড়েছিলেন। তোমার নিরুদ্দেশ হওয়া পর্য্যন্ত পাগলের মত তোমার সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন।"

শিশির নিঃশব্দে শুধু চেয়ে রইল, কোন কথা কইল না। তার গাম্ভীর্য্যে অস্থির হয়ে অনঙ্গ বল্লে—"অভিমানে কথা কবে না বাবা? আমি ত কোন দোষ করিনি, তোমার গর্ভধারিণী মাও ত কোন অপরাধ করেনি—"বলেই অনঙ্গ বামাকে শিশিরের সমুখে ঠেলে দিলে।

শিশির বিস্মিত হয়ে বল্লে—"আমার গর্ভধারিণী মা?"

বামা আর থাকতে পারলে না, ছুটে গিয়ে শিশিরের গলাটা জড়িয়ে ধরে কাতর কণ্ঠে ডাকলে—"শিশির! আমার শিশির!"

উর্দ্ধশ্বাসে হাঁপাতে হাঁপাতে দু' তিনজন লোক সেই সময় ছুটে এসে বল্লে—"লালুখুড়ো, আলিমদ্দি মিঞা, তোমাদের জয়জয়কার হো'ল, আজ বারোটা থেকে কলের ফটক খুলবে—সব রোজ বাড়িয়ে দিয়েছে, টাকায় টাকা, আর ছুটির আধরোজ। বাঁশী বাজলো বলে।"

শিশির তাদের দিকে চেয়ে বল্লে—"একটা মিনিট ভাই, কেবল একটা মিনিট চুপ কর, আমায় একটা কথা শুনতে দাও।" তারপর বামার দিকে ফিরে বল্লে—"মা! এতদিন গোপন রেখেছিলে কেন? মা'র মত সকল স্নেহ দিয়েও ধরা দাওনি কেন?"

অমিয়বাবু নত মস্তকে বল্লেন—"বহুকাল পূর্ব্বে ব্রাহ্মমতে তোমার মা শৈলজাকে বে' করে মনের ভুলে একটা চুক্তি করেছিলুম—অপরাধ সবই আমার।"

শিশির ম্যাজিস্ট্রেটকে বল্লে—"আমায় এইবার নিয়ে চল সায়েব—"

—আর কখন তোমার অবহেলা করবো না বাবা !"

—আপনার অবহেলাই আমায় আজ কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়ে দিয়েছে বাবা। মা ! তোমার পুত্রবধূ রইল। সাহেব, নিয়ে চল, শীগগীর নিয়ে চল।

অনঙ্গ চেঁচিয়ে বল্লে---"ওগো, আমার শিশিরকে নিয়ে চল্লো—তোমার সমুখ দিয়ে—' বলেই সাবিত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্লে—"এস মা, তুমি ঘরের লক্ষ্মী, আমার বুকে এস।"

বামা পলকহীন চোখে শিশিরের গন্তব্য পথের দিকে চেয়ে, পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অমিয়বাবুর মুখ থেকে বেরুল —"সর্ব্বস্বের বিনিময়ে আমার শিশিরকে এনে দাও সুশীলবাবু।"

—চট্‌-কলের সমস্ত বাঁশী একসঙ্গে বেজে উঠলো।

—শেষ—